আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনে শ্রীশ্রী ঠাকুর

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক
শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দ সরস্বতী
দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
হালিসহর
(২৪ পরগণা)

মুদ্রাকর
শ্রীঅমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, হায়াৎ খান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : শ্রীবিমলচন্দ্র রায়
৩২, জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৩৬
গ্রন্থ-বন্ধন : জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৭, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ঝুলনপূর্ণিমা, ১৩৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—মহালয়া, ১৩৬৩

প্রাপ্তিস্থান :—
দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
হালিসহর, ২৪ পরগণা
ও
মহেশ লাইব্রেরী
।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-১২



শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব

উপহার

....

....

....

....

....

প্রথম সংস্করণে

গ্রন্থকারের নিবেদন

হিন্দু-সমাজ-সৌধের মূল ভিত্তি—আদর্শ গৃহস্থ। আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন সম্পর্কে মদীয় আরাধ্যদেবতা শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখে যে-সমস্ত অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি এবং তাঁহারই শ্রীহস্তলিখিত যে-সকল মনোরম উপদেশবাণী-সম্বলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা সম্পাদিত হইয়াছে। গৃহস্থ-জীবন গঠনের বিচিত্র সমস্যার কথা সকলেই আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু সত্যদৃষ্টি লইয়া সমাধানের পথ কেহই এমন সহজ-সরল ভাবে দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনের দিব্য-সঙ্কেত ও কার্য্যকরী পন্থা অবগত হইতে হইলে, প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ঋষিযুগে আদর্শ-গৃহস্থই সমাজের নেতা ছিলেন। গৃহস্থ-ভাবে অবস্থান করিয়াও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। সমাজে আবার আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থ এবং ব্রহ্মবাদিনী নারীর প্রতিষ্ঠা হউক—ইহাই সদ্‌গুরুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে পরিপূরণ হইবে, তাহার পথ স্বয়ং তিনিই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ন্যাশনাল আর্ট প্রিণ্টার্স লিমিটেড্এর ডিরেক্টর ও ভিক্টোরী কোম্পানীর ম্যানেজার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কাব্যশাস্ত্রী মহোদয় এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা এবং যাহাতে শীঘ্র এই পুস্তকখানা প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীগুরুচরণে তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করার কয়েক বৎসর পর হইতেই "আদর্শ গৃহস্থ-জীবন" গঠন সম্বন্ধে কোন পুস্তিকা প্রকাশিত হয়—ইহা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। যথাসময়ে 'আর্য্যদর্পণে' "আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর" শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য আমি আর্য্যদর্পণ-সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। অনেকের অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যে উক্ত প্রবন্ধই অধ্যায়ত্রয়সহযোগে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। এই প্রবন্ধের অধিকাংশই ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ও শ্রীহস্তলিখিত উপদেশবাণীতে পরিপূর্ণ। আশা করি সুধীজনগণ এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন ও ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার সুগম সহজ-সরল পথের সন্ধান পাইবেন।

আজকাল আমাদের দেশে দেশপ্রেমিকের অভাব নাই। অনেকেই আজ দেশসেবায় রত হইয়াছেন এবং দেশহিতকর কোন না কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তথাকথিত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। ইহা দ্বারা দেশের কিছু-না-কিছু উপকার সাধিত হইতেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু স্থায়ী ফল কিছু অর্জ্জিত হইতেছে কি না সন্দেহ। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, দেশ-সেবকগণের মত নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দীর্ঘকাল এক পন্থায় চলিয়া যখন দেখিলেন এ পথে বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না, অমনি "বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলেন পথটা।" আবার অন্য পন্থায় দেখিলেন, এইরূপ কিছুকাল কাটাইয়া আবার মত পরিবর্ত্তন ও ভিন্ন পথানুসরণ! যেন দিশেহারা হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি। ইহা হইতে কাজ কিছু হউক আর না হউক—ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা পথভ্রান্ত হইলেও

দেশপ্রেমিক, দেশের দশের সেবা করার আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের আছে, কিন্তু কোন একটি কারণে তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না।

এইরূপে কত সহস্র যুবক—আমাদের সমাজের অমূল্য রত্নসদৃশ যুবক—পথভ্রান্ত হইয়া বিভিন্ন পন্থায় কত উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখাইয়াও অবশেষে হতাশপ্রাণ ও ভগ্নহৃদয় লইয়া আপন আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করিতেছেন—কেহ বা সর্ব্বকল্যাণের নিদান পরমেশ্বরে আস্থাহীন হইয়া বিশ্বাস হারাইতেছেন। উৎফুল্ল যৌবনে এই দীন আমিও দেশ-সেবার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়া কত না আকাশ-কুসুমবৎ অলীক স্বপ্ন দেখিয়া মাতামাতি করিয়াছি। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই—না জানি কত জন্মের সুকৃতি ও পুণ্যফলে—পথ পাইলাম। এখন মনে হয়, যদি না পথ পাইতাম, আমারও জীবনটা হতাশায় পর্য্যবসিত হইত। তখন সবেমাত্র গার্হস্থ্য-জীবনের পথে পদার্পণ করিয়াছি—দেশ-সেবার আকুল আকাঙ্ক্ষা ও উন্মাদনা সতেজে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল—এমন সময় এ অধমের জীবন-পথপ্রদর্শক পরম করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর আলোকবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমারও এদিক ওদিক ছুটাছুটি থামিয়া গেল, আমি নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইলাম। আজও সেই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছি, বেশ বুঝিতে পারিতেছি অগ্রসরই হইতেছি—আর পশ্চাদাবর্ত্তন করিতে হইবে না, এই পথই একমাত্র পথ।

তাঁহার শিক্ষায়, তাঁহার উপদেশে বুঝিলাম, দেশের দশের সেবা করিতে হইলেও সর্ব্বাগ্রে সেবকের আত্মগঠন একান্ত প্রয়োজন। সেবা করার শক্তি যাহার অর্জ্জিত হয় নাই, তাহার পক্ষে সেবক হওয়া অভিমান মাত্র—তাহার দ্বারা সেবা না হইয়া হীন স্বার্থসিদ্ধিই হইয়া থাকে। তাহাতে কাহারও কোন কাজ হয় না—তাহার নিজেরও না।

সমাজের যে যেখানে স্থাপিত, তাহাকে সেই স্থানের উপযুক্ত হইতে হইবে অর্থাৎ আদর্শ হইতে হইবে। তবেই তাহার দ্বারা সেই স্তরের কার্য্য ঠিক ঠিক সম্পাদিত হইবে ও সকলের এবং সর্ব্বাগ্রে তাহার নিজের উন্নতি সাধিত হইবে—সে উন্নত স্তরে উন্নীত হইবে। এই ভাবে যিনি গৃহী তাঁহাকে আদর্শ গৃহস্থ হইতে হইবে, যিনি ত্যাগী তাঁহাকে আদর্শ সন্ন্যাসী হইতে হইবে। ইহাই আমাদের সাধনা। যিনি এই সাধন-পথ অবলম্বন করিবেন, তাঁহার দ্বারাই প্রকৃত সেবা হইবে, দেশ ও দেশবাসী যথার্থ উপকৃত হইবে—তাহার সেবার ফল স্থায়ী হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন ও বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সময়ে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করা বৃথা—কারণ তাহা অসম্ভব। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল ও দুর্দ্ধর্ষ হউক, যদি সাধকের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে, স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহার সহায় হন—তাঁহার কৃপায় সকল বাধা অপসারিত হয়—দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরিও পঙ্গুকর্ত্তৃক অনায়াসে লঙ্ঘিত হয়। অবশ্য যাহার ঐকান্তিকতা যত অধিক, তাহার ফললাভও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐকান্তিকতার তারতম্যানুসারে আদর্শত্বের পূর্ণতালাভেরও ইতরবিশেষ হইবে। কিন্তু কাহারও চেষ্টা বিফল হইবে না।

গৃহস্থাশ্রমই অন্য সকল আশ্রমের স্তম্ভস্বরূপ। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী—সকলেই আশ্রয় ও পোষকতা পাইতেছেন গৃহস্থ হইতে। গৃহস্থের উপরেই সমাজের উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ভর করিতেছে। গৃহস্থ যদি নীচ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া সঙ্কীর্ণতায় জড়িত হইয়া থাকে, সমাজের অবনতি ও মৃত্যু অবধারিত। আজ আমাদের হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার ইহাই মূলীভূত কারণ। যতদিন না আবার গৃহস্থ পূর্ব্বের

ন্যায় আত্মনির্ভরশীল হইয়া ত্যাগ, সংযম ও বদান্যতায় মহিমময় হইতেছেন, ততদিন আমাদের দেশের কল্যাণ ও উন্নতি সুদূরপরাহত।

মানুষ যদি কেবল নিজেকে লইয়া, বড় জোর আপন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, প্রতিবেশীর দিকে না তাকায়, তাহা হইলে তাহাতে আর পশুতে প্রভেদ থাকে না। ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা পশুত্বেরই লক্ষণ—মনুষ্যত্বের নহে। আমাদের আবার মানুষ হইতে হইবে, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে। শুধু মনুষ্যত্ব নহে, দেবত্ব এমন কি ব্রহ্মত্বও অর্জ্জিত হইতে পারে যদি একনিষ্ঠভাবে আদর্শের অনুসরণ করা যায়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, "আমার সুখের ভাগ অপরকে দিয়া আমার কি লাভ? অপরের দুঃখনিবৃত্তির জন্য স্বীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিলে আমার কি হইবে?" নিজের সুখের ভাগ অপরকে দিলে বা পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিলে যে অপার্থিব স্বর্গীয় আনন্দ লাভ হয়, তাহা যে আস্বাদন না করিয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

নানা প্রকার ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হইতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহাপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ হয় পরের জন্য কিছু ত্যাগ করিতে পারিলে। ত্যাগেই সুখ, ভোগে নহে। স্বার্থের গণ্ডী সঙ্কোচনে আনন্দ নাই, প্রসারেই আনন্দ। যিনি সারা বিশ্বকে আপন বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারেন, তাহার আনন্দের তুলনা নাই। আদর্শ গৃহস্থ তিনিই, যিনি নিজকে সর্ব্বত্র বিলাইয়া দিতে পারেন, তিনি বিশ্বনাথের বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা, তাহার আনন্দের সীমা নাই। অতএব হে গৃহি! যদি আনন্দই তোমার কাম্য হয়, গৃহীর মত গৃহী হও—আদর্শ হও।

ঝুলনপূর্ণিমা
১৩৫৩
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
শ্রীনারায়ণদাস নন্দী

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীগুরুকৃপায় "আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর" গ্রন্থখানার অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় দশ বৎসর পূর্বে। যথোচিত প্রচারের অভাবে বইখানার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইতে বহু বিলম্ব হইলেও, গৃহীদের পক্ষে ইহা যে একখানা অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান্ গ্রন্থ—ক্রমশঃ ইহা উপলব্ধি হইতেছে দেখিয়া আমি পরমানন্দিত।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন এক দুরূহ ব্রতবিশেষ। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শজনিত প্রবৃত্তিমুখী বা ভোগমুখী শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষের আদর্শ গৃহস্থ-সমাজের বুনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। এই সামাজিক পতনের প্রবল স্রোতে বাঁধ দিতে সক্ষম—অসীম শক্তিশালী সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণই। তাঁহাদের অটুট সঙ্কল্পের অমোঘ প্রভাবেই আবার সামাজিক চেতনা কল্যাণ বা মঙ্গলের দিকে ঘুরিয়া আসিবে। আমার "আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর" গ্রন্থের বুনিয়াদ রচনা করিয়াছেন সামান্য রাজ নহে, মহারাজ পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী-দেব। মুখ্যতঃ তাঁহার উপদেশ অবলম্বনেই এই অমূল্য গ্রন্থের সৃষ্টি। বর্ত্তমান সংস্করণটি আকারে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ছিল, সমাজে পুনঃ আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থ এবং ব্রহ্মবাদিনী নারীর উদ্ভব হউক। সেই আদর্শ সমাজ-সংগঠনের জন্য চাই—ত্যাগ-সংযমমূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি "ঋষি-বিদ্যালয়ের" প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কেবল সংসারত্যাগীর জন্যই নহে, সংসারীর পক্ষেও যে ব্রহ্মচর্য্যের (অর্থাৎ চারিত্রিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার) প্রয়োজন

আছে -ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধন'—এই উদ্দেশ্যেই লিখিত। সংযমবিহীন জীবন কোন আশ্রমেই আদর্শ কিংবা প্রশংসার যোগ্য নহে। অবশ্য সন্ন্যাস-আশ্রমের ব্রহ্মচয্যপালন-বিধি এবং গার্হস্থ্য আশ্রমের ব্রহ্মচর্য্যপালন-বিধি একরূপ নহে। ধর্ম্মের অবিরোধী কাম-বৃত্তির অনুশীলন অর্থাৎ সংযত ভোগ গার্হস্থ্যাশ্রমে শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে কোন অবস্থাতেই কামবৃত্তির অনুশীলনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নৈষ্ঠিকভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালন দুরূহ ব্যাপার। এই কঠিন এবং দুরূহ ব্রতপালনে মুষ্টিমেয় দিব্য ত্যাগসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিই অগ্রসর হইয়া থাকে। ত্যাগের সংস্কার বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলেই লভ্য। তথাপি এই কলিযুগেও মহাপুরুষগণ সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্যাগের সংস্কার যাহাদের রহিয়াছে, তাহাদিগকেই এই দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর কেবল সংসারবিরাগী ত্যাগী-সন্ন্যাসীর কথাই ভাবেন নাই, যুগপৎ তিনি আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ-গঠনের কথাও চিন্তা করিয়াছেন। সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেও সকলকে তিনি সন্ন্যাস প্রদান করেন নাই। অধিকারী বুঝিয়া সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদানের ভার শাস্ত্র এইজন্যই বেদান্তবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান শুধু গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদেরই লভ্য নহে, আদর্শ সংযত-গৃহীও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইহাই সুপ্রচারিত অভিমত। আদর্শ গৃহী এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে তিনি কোন পার্থক্যের সীমারেখা টানেন নাই। সংযত-ভোগের পরে পরিণামে নিবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই আসে। চিরকাল মানুষের ভোগস্পৃহা একভাবে থাকে না, তবে নিষ্কাম জগদ্ধিতকর কর্মের অনুষ্ঠান মানুষ আমরণও করিতে পারে।

বর্ত্তমান সমাজে যে ভোগোন্মত্ততা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে পরিবারে কেহ অবিবাহিত না থাকিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। ত্যাগ, সংযম, ব্রতপালন এবং চরিত্রগঠনই হইল সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান। চারিত্রিক ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে গঠিত না হইলে আদর্শ গৃহী হওয়া কিংবা আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া কোনটাই সম্ভবপর নহে। পারিবারিক জীবনে বিবাহ এখন এক দুরূহ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহবন্ধন নিরাপদ ব্যবস্থা বুঝিলেও অর্থনৈতিক কারণে এবং যৌথপরিবারপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় বিবাহের গুরুতর দায়িত্ব বহনের কথা চিন্তা করিয়া অনেকেই কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এই সমস্যা যখন বাস্তবেই দেখা দিয়াছে, তখন কুমার-কুমারী-জীবনেও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সংযম-নীতিপালনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বিবাহের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যও আবশ্যিক সংযম-রক্ষার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলন হওয়া উচিত। সমস্যার সম্মুখে পড়িয়া অপ্রস্তুতের মত হতভম্ব হওয়া কিংবা আত্মবিসর্জ্জন দেওয়ার পূর্ব্বেই আত্মগঠন একান্ত প্রয়োজন। গৃহস্থ-জীবনের গুরুতর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অর্জ্জনের অপর নামই ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা। ত্যাগ-সংযমকে বাদ দিয়া বিবাহবন্ধন স্বীকার কিংবা চিরকৌমার্য্যের পথ অবলম্বন কোনটাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। সন্ন্যাসী হওয়া কিংবা আদর্শ-গৃহী হওয়া কাপুরুষের কার্য্য নহে—ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরও অভিমত।

এই গ্রন্থ-সম্পাদনে যে-সব গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি, সেই সকল গ্রন্থপ্রণেতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমতকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অন্যান্য মনীষীদের প্রামাণ্য-উক্তিদ্বারা স্থলবিশেষে সুদৃঢ় ও পুষ্ট করিয়াছি। এই গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে মদীয় সতীর্থ স্বামী সিদ্ধানন্দজী প্রুফসংশোধনকার্য্যে এবং

তাঁহার রচিত কয়েকটি উপযোগী কবিতা দিয়া আমাকে যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রথম সংস্করণে বিষয়-সূচী না থাকায় পাঠকবর্গের যে অসুবিধা হইয়াছিল, বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে অধ্যায়-বিভাগক্রমে বিষয়-সূচী প্রণয়ন করিয়া তিনি সেই অসুবিধাও বিদূরিত করিয়াছেন। মোটকথা, গ্রন্থটিকে যথাশক্তি ত্রুটীবিচ্যুতিবিহীন করিয়া প্রকাশবিষয়ে কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। আমি মাত্র রচয়িতা, যথার্থ প্রকাশক তিনিই। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া পুনর্লিখনের সময় শ্রীমান্ শ্যামচৈতন্য ব্রহ্মচারী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহায্য স্মৃতিপথে চিরসমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। প্রাথমিক প্রুফ সংশোধন-কার্য্যেও তাঁহার সহায়তা উল্লেখযোগ্য।

পূজার মাসে বিবিধ রচনাকার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ভট্টপল্লী সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং হালিসহর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের একান্ত হিতৈষী শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ, মহোদয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দেওযায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতি নিবেদন করিতেছি। তাঁহার লিখিত ভূমিকা পাঠ করিয়া, যোগ্য ব্যক্তির উপরই যে ভার অর্পিত হইয়াছিল, আমার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিবেন।

পরিশেষে যাঁহার প্রেরণায় এবং আশীর্ব্বাদে এই গ্রন্থ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইল, তাঁহার রাতুল চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া তাঁহার শ্রীচরণেই পুনঃ গ্রন্থপ্রচার কামনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম
হালিসহর, ২৪ পরগণা
১০ই আশ্বিন, ১৩৬৩

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
স্বামী সত্যানন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

হালিসহর নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের সন্ন্যাসী বহুমানাস্পদ স্বামী সত্যানন্দ মহারাজকর্তৃক লিখিত 'আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর' শীর্ষক গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার জন্য বোধহয় একজন গৃহস্থও আবশ্যক, এই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। সন্ন্যাসীর হাতে গড়া এই 'গৃহস্থ-জীবন' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, ইহাতে গৃহস্থজীবনের অবশ্য আলোচনীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বরং গৃহস্থ অপেক্ষা গৃহধর্মের বাহিরে থাকিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থদৃষ্টিতে যেরূপ গৃহস্থকে দেখিয়াছেন—সেরূপ দৃষ্টি দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে অনেক সময়ই কঠিন হইয়া উঠে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—**"Outsiders are more interested than the gamestars.'**—খেলোয়াড় অপেক্ষা দর্শকগণ খেলায় অধিক কৌতুক অনুভব করেন।

আজ সংসারচক্র যেভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে গৃহস্থগণের অধিকাংশই স্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন —কিন্তু দুইদশজন আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ ভীত ও চিন্তিত হইয়া পূর্ব হইতেই গৃহস্থগণের প্রতি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, সেই বাণীর প্রতি অবহিত হইবার জন্য স্বামী সত্যানন্দজী উদারহস্তে তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসমহারাজের উপদেশামৃত বর্তমান

গৃহস্থগণকে পরিবেশন করিতেছেন। যাঁহারা গার্হস্থ্যধর্ম্মে ডুবিয়া আছেন—তাঁহাদের অপেক্ষা যে গৃহত্যাগী গ্রন্থকার বাহির হইতে গার্হস্থ্যের সমস্ত দিক্‌টা দেখিবার সামর্থ্য বহন করেন, তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যায়।

আমার এই ভূমিকার প্রথম কথা এই যে, সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য—গার্হস্থ্য ধর্মে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে গার্হস্থ্য—পাপজনক। কোন কোন ইংরাজমনীষী বলিযাছেন—**"We have made sailors and soldiers but we could not make good husband and wife."**

পাশ্চাত্ত্যজগতের অশান্তিময় গৃহজীবন সর্ব্বজনবিদিত। গত ১৯৪৮ সালের আগষ্টমাসের 'ফ্রী' নামক এক আমেরিকান ম্যাগাজিনে লিখিত হইয়াছে যে—আমেরিকায় প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ এবং বহুলক্ষ সন্তান পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত হইয়া রাষ্ট্রের স্কন্ধে পালনের জন্য আসিয়া পড়িতেছে।

শুধু আমেরিকায় নহে, পাশ্চাত্ত্যদেশের বহু রাষ্ট্রেই বহু অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং সেই সকল সন্তান যে নিন্দিত গৃহস্থ-পরিবার হইতে উদ্ভূত, ইহা নিঃসংশয়।

সনাতন ধর্মে মনুষ্যসৃষ্টিবিবরণ দেখিলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, প্রথমে ব্রহ্মা তাঁহার মানসপুত্র সনক, সনাতন, সুজাতীয় ও সনৎকুমার এই চারিটি পুত্রকে সংসারধর্ম কবিবার জন্য আদেশ করিলে তাঁহারা পিতৃচবণে প্রণাম কবিয়া কবজোড়ে নিবেদন করিলেন যে,—সংসারেব বীভৎসতা হৃদয়ঙ্গম কবিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা সংসারে প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। আমাদিগকে তপস্যার্থ বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

ব্রহ্মা পুত্রদের এরূপ কাতরতা দেখিয়া তাঁহাদিগের অরণ্যপ্রস্থান অনুমোদন করিলেন। ব্রহ্মা তখন গৃহস্থ-সন্তানের মানস-সঙ্কল্প করিয়া পুনরায় সৃষ্টি-প্রবর্ত্তন" করিলেন এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষি মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্পবলে ইঁহারা হইলেন গৃহস্থ। ভারতের প্রাথমিক গৃহস্থ হইলেন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ। গার্হস্থ্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন ঋষিজীবন। এজন্য প্রাচীনতম তত্ত্ব সনাতন ধর্মের অভিপ্রেত ঐকাশ্রম্য-বাদ। একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই আশ্রয়ণীয়, তাহার পূর্ব্বাঙ্গরূপে ব্রহ্মচর্য্য এবং উদীচ্য অঙ্গ বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস। গৌতম ধর্মসূত্রে আছে—"ঐকাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যাঃ"। 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি'—এই শ্রুতি হইতেও গৃহস্থাশ্রম যে সমস্ত জীবনব্যাপী হইতে পারিত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, বৈবাহিক অগ্নি হইতেই অগ্নিহোত্রের আরম্ভ এবং সেই অগ্নিতেই অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। "ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিতেও চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসের উল্লেখ নাই। বৌধায়ন-ধর্মসূত্র হইতে জানা যায় যে,—প্রথমে আশ্রমভেদ ছিল না, পরে আশ্রমভেদ স্থাপিত হয়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ চতুরাশ্রমকেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা একাশ্রমবাদের নাম করেন নাই; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থমধ্যে তাহার বহু কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে,—

ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে॥

ন্যায়পথে থাকিয়া যিনি ধনার্জনশীল, অতিথিসৎকারপরায়ণ, নিত্য-নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারী, সত্যবাদী এবং তত্ত্বজ্ঞানী, এরূপ গৃহস্থও মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। মিতাক্ষরাটীকাকার এস্থলে লিখিয়াছেন

—'গৃহস্থোঽপি হি যস্মান্মুক্তিমবাপ্নোতি, তস্মান্ন কেবলমৈহিকপরিব্রাজ্য-পরিগ্রহ এব মুক্তিসাধনম্।'

উক্তরূপ গৃহস্থ যেহেতু মুক্তিব অধিকারী হ'ন—সেই হেতু কেবল মাত্র ইহজীবনে সন্ন্যাসগ্রহণই মুক্তিব কাবণ নহে।

যাহা হউক, এমন একদিন ছিল,—যখন গৃহস্থাশ্রমও সন্ন্যাসের বৈকল্পিক মুক্তিপথ বলিযা বর্ণিত হইত। এইজন্যই শাস্ত্রমর্মজ্ঞ স্বামী নিগমানন্দ মহাবাজ গৃহস্থগণেব অনুসবণীয় প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্কবাচার্য্যেব আবির্ভাবে বৌদ্ধসন্ন্যাসবাদ সংশোধিত হইয়াছিল এবং প্রকৃত অধিকাবীব নিকট সন্ন্যাসধর্মের আদর ও গৌবব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বস্তুতঃ সনাতন ধর্মানুসাবে সকলেব সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার নাই। অন্তর হইতে ত্যাগ ও বৈবাগ্য না হইলে সন্ন্যাস বিডম্বনা মাত্র। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মেব সিদ্ধান্তমত সনাতন ধর্ম গার্হস্থ্যকে আত্মার অবনতিজনক বলিয়া মনে কবেন না। মুক্তিকামী হইলে গৃহস্থাশ্রম হইতেও তাহা লাভ কবা যায়—যাজ্ঞবল্ক্য সে আশ্বাসবাণী দিযাছেন। কিরূপ গৃহস্থ মুক্তিলাভ কবিতে সমর্থ হ'ন—তাহা সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যবচনে উল্লিখিত হইয়াছে, আমি বলিব—তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা 'আদর্শ গৃহস্থ-জীবন' গ্রন্থে স্বামী সত্যানন্দ মহাবাজ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সন্ন্যাসও গৌরবের বস্তু,—যে বংশে একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করে—সেই বংশেব চৌদ্দপুরুষ উর্দ্ধগতি লাভ করেন ইহা সত্য, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ কবিযা যদি কেহ গৃহস্থধর্মে আসক্ত হয়, তাহাকে 'আরূঢপতিত' বলা হয়, এজন্য সন্ন্যাস গৌরবজনক হইলেও তাহার মর্য্যাদারক্ষণে ক্লেশ আছে, বিপদও আছে। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রমতে

সন্ন্যাস সর্ব্বসাধারণের ধর্ম নহে। বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের সহিত এখানে সনাতন-ধর্মের পার্থক্য।

জীবের গতি সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমুখে, এই প্রবৃত্তির পথকে নিবৃত্তির মহাসমুদ্রে বিলীন করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। ইহা মুখে বলিলে বা নিবৃত্তির কথা শ্রবণ করিলে অথবা নিবৃত্তিসূচক বেশ পরিধান করিলেও তাহা সম্ভবপর হয় না। যাঁহার উপর শ্রীভগবানের অপার করুণা বর্ষিত হয়, তাঁহার পক্ষেই নিবৃত্তিধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে। আর সাধারণ সাধকের পক্ষে আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন করিলে প্রবৃত্তির পথে থাকিলেও নিবৃত্তির স্নিগ্ধরশ্মিদর্শন দুর্লভ হয় না।

এই রক্তমাংসের মানবশরীরকে 'ভাগবতী তনু'রূপে পরিণত করা যে তনুধারণে শ্রীভগবানের দর্শন সম্ভাবিত হয়—সেইভাবে জীবনকে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের আর্য্যগণের আদর্শ। একটা লক্ষ্য স্থির রাখার প্রয়োজন না থাকিলে মানবতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র ধনার্জন ও সন্তানোৎপাদন পুরুষের কাম্য নহে, পুরুষের বিলাসসামগ্রী হইয়া থাকাও নারীজীবনের সাফল্য নহে। উভয়ে সমচিত্তে সমকর্মে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া নিজেদের এবং নিজ সন্তানগণের পরম শ্রেয়োলাভে উদ্যুক্ত হইতে হইবে।

আত্মসংযম যেমন আত্মোন্নতির কারণ, তেমনই নিজ সন্তানেরও স্বরূপকে সুন্দর করে। পিতামাতার নির্বাচিত সৎকুলোৎপন্না বধূর সহিত বিবাহের ফলে এবং সংযতভাবে পতি-পত্নীর মিলনে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার দ্বারা নিজেদের ও বংশের গৌরব রক্ষিত হইবে। রূপের প্রতি চক্ষুর নেশায় স্বয়ংনির্বাচিত নারীর সহিত

শুধু মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রবলতর হইয়া উঠে। সেই চঞ্চলতার সহিত যে গর্ভাধান—তাহার ফলস্বরূপে যে সন্তান আসিবে, তাহার চিত্ত হইবে চঞ্চল। চঞ্চলচিত্ত সন্তান শান্তির কারণ হইতে পারে না। এজন্য বিবাহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তানপালন পর্য্যন্ত গভীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

'আদর্শ গৃহস্থ-জীবন' গ্রন্থে সেই দায়িত্বটি বিশেষ করিয়া বিশ্লেষিত হইয়াছে। আর্য্য-ভারতের আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাঁহারা নিজ ব্যবহার-দ্বারা প্রতিপালন কবিয়া গিয়াছেন—সেই সীতা, সাবিত্রী, পতিব্রতা প্রভৃতির কথা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সীতাদেবীর উক্তিরূপে দুইটি শ্লোক আরও যোগ করিলে ভাল হইত, সেই শ্লোক দুইটি এই,—

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

তন্ত্রী (তার)-বিহীন যেমন বীণা থাক না, চক্রহীন যেমন রথ থাকিতে পারে না, শতপুত্রবতী হইলেও পতিবিরহিতা নারী কখনও সুখলাভ করিতে পারে না।

পিতা যাহা দান করেন তাহা পরিমিত, ভ্রাতা বা পুত্র যাহা দান করে তাহাও পরিমিত। অপরিমিত দান করেন একমাত্র পতি, সেই পতিকে কে না পূজা করিবে?

এ কথা প্রকৃত সতীর মুখ হইতেই শোভা পায়। এ কথা শুনিয়া কৌশল্যার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, দুঃখ ও হর্ষভরে নয়ন হইতে অশ্রু

ঝরিতে লাগিল। আর সীতাকে তিনি বনগমনে নিষেধ করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বকালে বৌদ্ধকুমারীদের ব্রহ্মচর্য্য যেমন কোথাও কোথাও দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিল, পরবর্তিকালে পুরুষসন্ন্যাসী ও নারীসন্ন্যাসিনীদের একত্রে মঠে বাস প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবনতি ঘটিয়াছিল, ইহাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এজন্য সনাতন ধর্ম্মের বিধানে যাহাতে সমাজের প্রত্যেক কুমারীর বিবাহসংস্কার সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ছিল,—এজন্যই অল্পবয়সে বিবাহ-বিধি এবং পুরুষের একাধিক বিবাহের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

সমাজে কন্যার বিবাহ না হওয়া অপেক্ষা বড় সামাজিক সমস্যা আর কিছু নাই। অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা যে সমাজে যত বৃদ্ধি পাইবে, সে সমাজে ততই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। পাশ্চাত্ত্য দেশের **Suffragette**রা তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। সে দেশে বিবাহ-সমস্যার সমাধান হয় নাই বলিয়াই নর-নারীতে ভীষণ দ্বন্দ্ব লাগিয়া আছে। আজ ভারতবর্ষেও সেই পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে বিবাহ-বিধির বয়ো-নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক দুর্ম্মূল্যতার প্রবর্ত্তন করিয়া প্রতি বৎসর শতশত সহস্র সহস্র কুমারী-সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় অবস্থা।

সমাজে পুত্রের বিবাহে পণ-গ্রহণ একটা মহাপাপরূপে দেখা দিয়াছে। কন্যা ও পুত্রের বিবাহ—বাঁকের কলসীর মত, কাহাকেও ছোট কাহাকেও বড় করা যায় না। সমাজের প্রয়োজনে পুত্র ও কন্যার স্থান সমানই; সুতরাং বিজ্ঞ সামাজিকগণ পণ-গ্রহণবিষয়ে অবহিত হইলে কতকটা বিবাহসমস্যার সমাধান হইতে পারে।

স্বামী সত্যানন্দজী এ দেশের কুমারীদের ব্রহ্মচর্য্য-পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় ইহাই যে,—গার্হস্থ্য জীবনযাপনের প্রস্তুতিরূপে পবিত্রতা এবং সংযম-সাধনার প্রয়োজন ত আছেই, উপরন্তু যে কোন কারণেই হউক গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশলাভ যাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহার সুসংযত পবিত্র জীবনযাপনই একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনার নিদান। কিন্তু নারীদের বিবাহ-সংস্কার অপেক্ষা নিরাপদ্ জীবন-গতি আর কিছু হইতে পারে না; সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও কন্যাদের বিবাহসম্পাদন দেশ ও সমাজের কল্যাণপ্রদ সুস্থ অবস্থার অভিব্যক্তি।

ভারতবর্ষের আর্য্যচিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল—এক অখণ্ড রূপ। অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, সীতারামের মিলিত রূপ—সংসারে দম্পতীর আদর্শ।

'শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।'

স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ, তাই তাহার নাম অর্দ্ধাঙ্গিনী। যেমন শরীরে আমাদের বাম ও দক্ষিণ ভাগ—দুই অংশ, তেমনই পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে নারী ও পুরুষের উভয়ের মিলনেই তাহা সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেমন বীণা ও কণ্ঠস্বর উভয় মিলিত হইলেই পূর্ণ মধুরতা, তেমনই স্ত্রী ও স্বামী এক অখণ্ড পূর্ণতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এ মিলন, সংস্কাররূপে (চুক্তিরূপে নহে)—বেদমন্ত্রের দ্বারা অগ্নি-সাক্ষী করিয়া সম্পাদিত হয়, এজন্য আর্য্যসিদ্ধান্তমতে ধর্ম্ম্যবিবাহের মোক্ষ (divorce) নাই বা বিধবাবিবাহ নাই। স্বামী মৃত হইলেও দেবতারূপে তিনি বিধবার ধ্যেয় হইয়া থাকেন। শরীরের দক্ষিণ অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে তাহার স্থানে যেমন অন্য আর একটি অর্দ্ধ-

শরীর যুক্ত করা যায় না, সেইরূপ বিধবার সেই এক পতিই আরাধ্যরূপে ধ্যেয় হইয়া থাকেন, অপর পুরুষের দ্বারা তাহার স্থান পূর্ণ হইতে পারে না।

এই যে নর-নারীর অভিন্ন অখণ্ড রূপ, অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের মতই ইহা চিরন্তন মাধুর্ষ্য ও সৌন্দর্য্যের বিকাশক। এ ভাবে নর-নারীকে পৃথিবীর আর কোন জাতি দেখিয়াছে কি-না জানি না। এই মধুরতার রসাস্বাদে কৃতার্থ হইয়া ভারতীয় আর্য্যা ও আর্য্যগণ কোনদিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাই বিশ্বজন বিস্ময়ের সহিত ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে। এত আনন্দের সংসার, এত দাম্পত্যপ্রীতি, এত গৃহসুখ পৃথিবীর আর কোন জাতি পায় নাই। পৃথিবীর অপর জাতিরা হিংসায়, ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়াছিল, তাহারা এতদিন লাঙ্গুলহীন শৃগালের দশায় পড়িয়াছিল, আজ স্বাধীন ভারতে কয়েকজন পরাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তায় ভারতবাসীদেরও লাঙ্গুল কর্ত্তন করিয়া নর-নারীর মধুর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবার বিধি নির্ম্মিত হইল! এ বিধিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিবার জন্যই 'আদর্শ গৃহস্থ-জীবন' লিখিত হইয়াছে। হে বাঙ্গলার সুসন্তানগণ! সারস্বত মঠের সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দজী যে উদাত্তকণ্ঠে আপনাদের আহ্বান করিয়া গৃহস্থের আদর্শ কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নর-নারীর নিত্য পাঠ্যরূপে, বিবাহের উপহার-গ্রন্থরূপে এবং সদ্‌গৃহস্থের ধর্ম্মগ্রন্থরূপে স্থান পাওয়া উচিত।

এই গ্রন্থে কেবলমাত্র আদর্শবাদ ও উপদেশবাক্য লিপিবদ্ধ হয় নাই, গৃহস্থ-জীবনকে কেমন করিয়া সুস্থ ও সবল করা যায়, সেই সমস্ত যৌগিক প্রক্রিয়া ও কর্ম্মকৌশল সরল সুন্দর ভাষায় বিবৃত

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিষয় — পৃষ্ঠা

পঞ্চদশ অধ্যায়

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে

শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রথম অধ্যায়

অভেদদর্শন, ঐক্যস্থাপন এবং সমন্বয়প্রতিষ্ঠাই সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্য। বাহ্যতঃ ভেদবৈচিত্র্যের মূলে যে ঐক্যসূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা একমাত্র সমন্বয়বাদী সত্যদ্রষ্টা সদ্‌গুরুর চক্ষেই ধরা পড়ে। সদ্‌গুরুর শ্রীমুখে এইজন্যই ভেদবৈষম্যের বাণী উচ্চারিত হয় না, তাঁহাদের নিকট আমরা ঐক্যের বাণীই শুনিতে পাই। এক এক মত-পথে সিদ্ধ মহাত্মার শ্রীমুখে তদীয় মত-পথেরই অজস্র প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার মত-পথ ব্যতীত অন্য মত-পথেও যে সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, অনেকেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া এই সত্যটিকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। সদ্‌গুরুর অকুণ্ঠদৃষ্টির সম্মুখে সকল মত-পথের সত্যই প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই জন্যই গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই সার্ব্বভৌম উদার বাণীর প্রতিধ্বনি সদ্‌গুরুর শ্রীমুখে আমরা শুনিতে পাই।

প্রাচীন যুগে চতুরাশ্রমের ভিত্তি অচল অটল ছিল। সমাজ তখন চতুরাশ্রমের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়াই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইত। সামঞ্জস্যপূর্ণ এই চতুরাশ্রমব্যবস্থা যখন হইতে ক্ষুন্ন হইল, তখন হইতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। তাই দেখি গৃহী-সন্ন্যাসীর ভিতর আর সেই সহজ মিলনের ভাব নাই। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিয়াই বর্দ্ধিত হইতেছে। চতুরাশ্রমের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের যে অবিনাভাব সম্বন্ধ—ইহা বিস্মৃত হইয়া যাওয়াতেই যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক আশ্রমই পরস্পর পরস্পরের নিকট ঋণী, অথচ এই সহজ কথাটিই অনেক সময় আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই। আমাদের এই ভুল-ভ্রান্তি মোচনের জন্যই মাঝে মাঝে সদ্‌গুরু-মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার তিনটি পথই মুখ্য এবং প্রধান। যথা—জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ এবং কর্ম্মপথ। জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী এবং কর্ম্মবাদীর মধ্যেও বাদ-বিসম্বাদের অন্ত নাই। কেহ বলেন জ্ঞান বড়, কেহ বলেন ভক্তি বড়, আবার কেহ বলেন কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সদ্‌গুরুর সমন্বয়দৃষ্টির সম্মুখে এই ত্রিবিধ বাদে কোন ভেদ-বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য নাই। এই তিনটি মত বা পথ পরস্পর পরস্পরের সহায়ক এবং পরিপূরক বলিয়াই সদ্‌গুরুর শ্রীমুখে আমরা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। উপমাচ্ছলে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন—"জ্ঞান হইল মিশ্রি, ভক্তি হইল দুগ্ধ; কর্ম্মসহায়ে দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রি মিশাইলে দুগ্ধের মাধুর্য্য আরও বাড়িয়া যায়।" তেমনি চতুরাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের ভিতরেও কোন ভেদ-বিভেদের কারণ নাই। প্রত্যেক আশ্রমের সঙ্গেই প্রত্যেক আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সম্পর্ক ছিন্ন করিলে কোন আশ্রমেরই কল্যাণ

নাই। একক ভাবে কোন আশ্রমই দাঁড়াইতে পারে না। গার্হস্থ্য আশ্রমের সঙ্গে সন্ন্যাস আশ্রমের কোন সম্পর্ক নাই—এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের উক্তি মোটেই যুক্তিপূর্ণ নহে। যোগবাশিষ্ঠে আছে—

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥

—বৈরাগ্যপ্রকরণ, ১ম সর্গ, ৭ম শ্লোক।

"একপক্ষযুক্ত পাখী যেমন আকাশে উড়িতে পারে না, তেমনি জ্ঞান-কর্ম্মের একটির সাহায্যে চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইতে পারে না। পাখীকে আকাশে উড়িতে হইলে দুই পাখারই সাহায্য লইতে হয়, তেমনি জ্ঞান, কর্ম্ম উভযেরই সমপ্রয়োজনীয়তা আছে।"

গৃহী-সন্ন্যাসী পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত কোন আশ্রমই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। গৃহীর অর্থ ও সন্ন্যাসীর পরমার্থের সম্মিলনেই লাভ হইযা থাকে সম্পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধি। সদ্‌গুরু নিগমানন্দ পরমহংসদেবও সিদ্ধিলাভান্তে জনহিতকর কর্ম্মসাধন করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গৃহী-সন্ন্যাসী উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা সমভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া উভয়কেই আহ্বান করিয়াছিলেন। গৃহী এবং ত্যাগীর সম্মিলন ব্যতীত সমাজের উন্নতিসাধন অসম্ভব, আমরা তাঁহার শ্রীমুখে বারংবার এই উপদেশ শুনিযাছি। তাঁহার উপদেশে সন্ন্যাসীর একান্ত সন্ন্যাসজীবন বা বিবিক্তজীবনের অহঙ্কার-অভিমান যেমন চূর্ণ হইয়াছে, তেমনি গৃহীর গার্হস্থ্যজীবনের অর্থাৎ সেবাধর্ম্মের অহঙ্কার-অভিমানও লোপ পাইয়াছে। আশ্রমবৈশিষ্ট্য লইয়া গৃহী-ত্যাগীর ভিতর আর কোন দ্বন্দ্ব নাই আমাদের মধ্যে। আমরা একেরই সন্তান। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। গৃহী বলিয়া কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর যে তাঁহাদের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা,

আবার সন্ন্যাসী বলিয়া সমাজের ভার মনে করিয়া গৃহীদেরও যে তাঁহাদের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব—সারস্বত সঙ্ঘের গৃহী-সন্ন্যাসীর পরস্পর কাহারও মনে এই ভাব নাই। সদ্‌গুরুর শিক্ষার ফলেই আমাদের ভিতর এই মধুর মিলনের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। গৃহী-সন্ন্যাসী পরস্পর ভ্রাতৃবোধে শ্রীগুরুর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রেরণা আমরা সমন্বয়বাদী সদ্‌গুরু নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচরণতলে বসিয়াই লাভ করিয়াছি। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি অভিমত ছিল, ধারাবাহিক ভাবে এক্ষণে তাহার আলোচনায় ব্রতী হইলাম।

"তোমরা আদর্শ গৃহী হও—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। গৃহস্থ লইয়াই সমাজ। সমাজ জাগাইতে হইলে আদর্শ গৃহীর বিশেষ প্রয়োজন। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সমাজের সে অভাব পূরণ কর।" – গৃহীদের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ইহাই ছিল মর্ম-উপদেশ। সমাজের বৃহত্তর জাগরণের পক্ষে আদর্শ গৃহীই যে একমাত্র প্রধান অবলম্বন, সমাজ-উন্নয়নকামী শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান মঠাশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতে গিয়া প্রথমেই তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্যই দেখি, আদর্শ সন্ন্যাসী সৃজন-অভিপ্রায়ে প্রাচীন যুগের আশ্রম বা তপোবন-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনসম্পর্কেও যুগপৎ তিনি উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে সংসারী ছিলেন বলিয়াই সত্যলাভান্তে সমাজে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহীদের গলদ কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার সমগ্র সাধনলব্ধ শক্তি বিশেষ করিয়া গৃহীদের উন্নতির জন্যই তিনি অকাতরে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। সংসারীলোকের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা কোন্‌খানে, ঠাকুর তাহা মর্ম দিয়াই অনুভব করিতে

পারিয়াছিলেন। পরিব্রাজকরূপে গৃহীদের উন্নতির জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি গৃহীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার অংশভাগী হইয়া সাধনলব্ধ আত্মশক্তিসঞ্চারণে মানব-জীবন গঠনে তাহাদের প্রভূত সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। মনুষ্যত্ব লাভ হইলে দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব এবং ব্রহ্মত্বলাভ সবই সম্ভবপর। অমানুষ হইলে কোনটাই লাভ সম্ভবপর নহে। জীবনের পক্ষে যাহা পরম শ্রেয়ঃ, তাহা লাভ করিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সাধন-ভজনলব্ধ পারমার্থিক সম্পদ্ এবং শিষ্য-ভক্ত-জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অজস্র আর্থিক সম্পদ্ অকাতরে জীবসেবার জন্য বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌কে লাভ করিবার পর, ব্রহ্মকে অপরোক্ষ অনুভবে সাক্ষাৎ করিবার পর ভগবানের অক্লান্ত জীবসেবার আদর্শই তাঁহার সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। গৃহস্থ লইয়াই সমাজ। তাই সমাজের উন্নতির জন্যই তাঁহার সমগ্র শক্তি তিনি অকাতরে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ গঠনোদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক গৃহীকেই দেহে-মনে-প্রাণে আদর্শ হইবার উপদেশ প্রদান করিতেন।

আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবনের কথা বলিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাচীনকালের ঋষিযুগের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করিতেন। গৃহে অবস্থান করিয়া স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব লইয়া সংসারধর্ম নিখুঁত ভাবে এবং নিপুণতার সহিত পরিপালন করিয়াও ঋষিরা যেমন ব্রহ্মজ্ঞানে অবিষ্ঠিত থাকিয়া সমাজসেবা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও ছিল সেই ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থের—আদর্শ সমাজেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কোন গৃহস্থকে তিনি ধর্ম, ভগবান্ বা ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে গমন করিতে হইবে এই শিক্ষা বা উপদেশ

প্রদান করেন নাই। সমাজে আদর্শ গৃহীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই প্রত্যেক গৃহীকে তিনি উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে যে সব ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থ-ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অম্বরীষ—ঠাকুরের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যভক্তদিগকেও সেই ভাবে গঠিত করিয়া তোলা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়-পরিজন লইয়াও গৃহস্থ ঋষিরা যেমন ব্রহ্মজ্ঞানকে করামলকবৎ আয়ত্ত রাখিতে সমর্থ ছিলেন, ঠাকুর তাঁহার শিষ্যভক্তদিগকেও সেইরূপ সমর্থ, ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থ বা গৃহমেধীরূপেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ গৃহী, আর প্রাচীন যুগের ঋষিসমাজ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আদর্শ গৃহীর কোন কথা উঠিলেই দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি প্রাচীন ঋষিযুগের ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থ ঋষি-বৃন্দের নাম উল্লেখ করিতেন।

গৃহীর সাধনক্ষেত্র—সংসার। আদর্শ গৃহীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে কিরূপে সংসারধর্ম প্রতিপালন করিতে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর এ সম্পর্কে তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যভক্তগণকে বহু অমূল্য এবং আশাপ্রদ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন গঠনসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি পরিকল্পনা বা মনোভাব ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সেই সব উপদেশবাণী অবলম্বনেই আমাদিগকে আলোচনায় ব্রতী হইতে হইবে। সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশপ্রদানকালে এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের চিঠির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিলে আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন গঠনসম্পর্কে বহু কার্য্যকরী অব্যর্থ ইঙ্গিত আমরা খুঁজিয়া পাই। চিঠিগুলি পাঠ করিলে ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঠাকুর গৃহীদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যথেষ্ট চিন্তা-

গবেষণা করিয়াছেন এবং বহু উপায়ও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গৃহীদের দৈনিক জীবনযাপনোদ্ভূত সমস্যাগুলিকে ঠাকুর কিরূপ দরদের দৃষ্টি লইয়া দেখিতেন এবং তাহার প্রতিকারার্থ কিরূপ সহজ সরল এবং যুগোপযোগী উপায় বলিয়া দিতেন, চিঠিগুলি পাঠ করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। কলির দুর্ব্বল, ভোগপ্রবণ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবের পক্ষে আদর্শ গৃহস্থ-জীবনযাপন যে কত কঠিন, ঠাকুর তাহা ভালরূপেই বুঝিতেন। বুঝিয়া শুনিয়াই তাহাদের মত উপযুক্ত পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের যুগোপযোগী স্বাবলম্বনশিক্ষা এবং কার্য্যকরী উপদেশ প্রত্যেক গৃহীরই গ্রহণোপযোগী হইয়াছে।

অধিকাংশেরই ধারণা, সংসারে স্ত্রীপুত্র লইয়া আরামে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিলেই গার্হস্থ্যধর্মে সুখী হওয়া গেল, কিন্তু গৃহস্থ-জীবনে এইরূপ সুখকে ঠাকুর আদর্শ গৃহীর সুখ বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"ভগবান্ বা গুরুকৃপা মানে ইহা নয় যে, সংসারে স্ত্রীপুত্র লইয়া বেশ আরামে দিন কয়টা কাটাইয়া দেওয়া। বিধিনির্দ্ধারিত প্রারব্ধ ভোগ করতঃ মদন-মরণের মধ্য দিয়া হাসিমুখে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়াই যথার্থ সদ্‌গুরু বা ভগবানের কৃপা। আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আদর্শ গৃহীরূপে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হও। আমিও এই কামনা লইয়া গুরুগিরির অভিমান বহন করিতেছি। প্রতি শিষ্য-হৃদয়ে ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমাদের ঘরে-ঘরে আবার শঙ্কর-গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হউক।"

শঙ্কর-গৌরাঙ্গের ন্যায় আদর্শ পুত্র লাভ কি এতই সহজ? তাহার জন্য ব্রত-উপবাস, তপস্যা সংযমের একান্ত প্রয়োজনীয়তা

রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহের জনক-জননী ত্যাগে, সংযমে, তিতিক্ষায়, সেবায় আদর্শ হইয়া শঙ্কর গৌরাঙ্গের ন্যায় আদর্শ সন্তান লাভের অধিকারী হউক—ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। সুশিক্ষা অর্থাৎ তপস্যা এবং সংযমের ধারাবাহিক অনুশীলন ব্যতীত দেবসন্তানের জন্মলাভ কি সম্ভবপর? ঠাকুর তাঁহার কোন গৃহী শিষ্যকেই কামনা-বাসনা-কলুষিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ঘৃণ্য সংসারী জীবরূপে দেখিতে চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য হইবে সমাজে আদর্শ পিতা—আদর্শ জনক, এবং শিষ্যা অর্থাৎ মায়েরা হইবে আদর্শ মাতা—আদর্শ জননী। আদর্শ জনক-জননী ব্যতীত আদর্শ সমাজপ্রতিষ্ঠা কি সম্ভবপর?

ঠাকুরের ধ্যানের দেবতাকে, ঠাকুরের প্রাণের ইচ্ছাকে তিনি শিষ্য-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এবং রূপায়িত দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। এই জন্যই প্রতি শিষ্যহৃদয় দেবতার পবিত্র মন্দিরে পরিণত হউক—ইহাই ছিল তাহার আন্তরিক অভিপ্রায়। হৃদয়কে দেবতার সিংহাসনে বা প্রতিষ্ঠা-বেদীরূপে সজ্জিত করিতে হইলে স্বেচ্ছাচার ব্যভিচার-অনাচার করা কি আর সম্ভবপর? দেবতার মন্দিরে পূজার ফুল—পূজার উপকরণই থাকে। ঠাকুরও তাঁহার শিষ্যের হৃদয়মন্দিরে পূজার উপকরণরূপে—শ্রদ্ধা, ভক্তি, আচার, নিয়ম, নিষ্ঠাকেই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। পূজার মন্দিরে যাহাতে আবর্জ্জনাস্তূপ জমিয়া না উঠে সেই দিকে ঠাকুরের প্রখর দৃষ্টি ছিল। বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বেচ্ছাচারিতার যুগে চারিত্রিক সম্পদ্ বা গুণ অর্জ্জনের দিকে সমাজের মোটেই লক্ষ্য নাই। অথচ এই দিকে লক্ষ্য ফিরিয়া না আসিলে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে আমরা চারিত্রিক গুণ অর্জ্জনের শিক্ষাকেই বুঝি। কর্ম্ম-শক্তি যদি চারিত্রিক গুণকে প্রস্ফুটিত না করিয়া কেবল ভোগোপকরণ সংগ্রহ এবং ভোগপ্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিতই করিয়া তুলে, তবে তাহাকে

কি করিয়া মানব-জীবনগঠনোপযোগী সুশিক্ষা বলা যায়? ব্রহ্মচর্য্যবিহীন শিক্ষা মানুষকে শুধু ভোগপঙ্কেই নিমজ্জিত করে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন —"মানব-মনের ভগবদভিমুখী গতিতেই আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা, আর ভগবদ্‌বিমুখী চিত্তবৃত্তির অনুশীলনেই সমাজের অধঃপতন।"

——

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজসেবী গৃহীদের পক্ষে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে (বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনযন) বিবাহই হইল মুখ্য সংস্কার। গার্হস্থ্য ধর্ম পরিপালনেব অধিকার অর্জ্জন করিয়া তবে উক্ত আশ্রমে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। এইজন্যই প্রাচীন যুগে ব্রহ্মচারিরূপে গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশবর্ষ পয্যন্ত অতিবাহিত করাব বিধি ছিল। তৎপর অস্খলিত ব্রহ্মচয্যাবস্থায গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার বিধান। শাস্ত্রে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুব, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই অষ্টপ্রকার বিবাহের কথাই উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহই মঙ্গলজনক এবং সাধুসম্মত। উক্ত বিবাহে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ব্রহ্মতেজোযুক্ত ও সাধুসম্মত হয়। কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগবশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। ইহা কামমূলক এবং মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত। সংসার-অভিজ্ঞ হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের কোন আদেশ-উপদেশের পরোয়া না করিয়া আজকাল অনেক ক্ষেত্রে এই গান্ধর্ব্ব বিবাহেরই অনুষ্ঠান হয়। শাস্ত্র এইরূপ বিবাহকে সাধুসম্মত এবং কল্যাণপ্রদ বিবাহ বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরও এইরূপ বিবাহ যে সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ আদর্শ নহে এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আদর্শ গৃহী হইতে হইলে বিবাহিত জীবনের একটা উচ্চ লক্ষ্য এবং উন্নততর আদর্শ থাকা প্রয়োজন। দাম্পত্য-জীবনের মূল লক্ষ্য কি, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এক গৃহস্থ ভক্ত-শিষ্যকে

লিখিয়াছেন—"বিবাহিত জীবন বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। দাম্পত্যজীবনে একপ্রাণে মিলিয়া মিশিয়া উভয়ের ভাবাবিভবচেষ্টায় উভয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিয়া পরিপূর্ণ ভগবানে বিশ্রামপ্রাপ্ত হও। কামের ছলনায়, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় যাহারা দাম্পত্যজীবন কলুষিত করে, তাহারা পশু এবং সমাজের শত্রু। দাম্পত্যজীবন মধুময়, পবিত্রতাময় এবং প্রেমময়।"

গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিয়া যাহারা অসংযমী, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্মম ভাষায় কশাঘাত করিতেন। এমন কি তাহারাই যে সমাজের শত্রু ইহা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই তাহাকে আদর্শ গৃহী বলা চলে না। সন্তান-সৃজনই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুশাস্ত্রে পত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলা হইযাছে। অধ্যাত্ম উন্নতির পথে সাহায্য হইবে বলিয়াই পত্নী-গ্রহণের বিধি শাস্ত্রেও অনুমোদিত হইয়াছে। ধর্ম্মোন্নতি লাভ করার জন্যই বিবাহ—কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। হিন্দুর বিবাহ একটি পবিত্র ব্রতবিশেষ। ইহা স্বেচ্ছাচারীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নহে। এই শুভ এবং পবিত্র ব্রত বা অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলেও হৃদয় এক দিব্য স্বর্গীয়ভাবে আমোদিত হইয়া উঠে। মন্ত্রগুলি যথা :—

ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং
ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি
র্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥

—হে বধূ! আমি সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। আমার সহিত তুমি বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অর্য্যমা, সবিতা, পূষা—এই সমস্ত দেবতাগণ গার্হপত্যসম্পাদনার্থ তোমাকে

আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তোমার সাহায্যেই আমি সুচারুরূপে গৃহস্থ-ধর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব।

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

—আমাদের উভয়ের হৃদয় একীভূত হউক। ত্বকের সহিত ত্বক্, মাংসের সহিত মাংস, অস্থির সহিত অস্থি মিলিত হউক।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি
মম চিত্তমনুচিত্তন্তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব
প্রজাপতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

—হে কন্যে! জগৎপতি তোমার হৃদয়ে আমার কর্ম সম্পাদনার্থ উদ্দীপনা প্রদান করুন। আমিও তোমার কর্ম সম্পাদনার্থ আন্তরিক প্রযত্ন করি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক। প্রজাপতির প্রসাদে তুমি একমনা হইযা আমার বাক্য প্রীতির সহিতই শ্রবণ করিবে। সেই প্রজাপতিই তোমার বিনোদনার্থ আমাকে প্রেরিত করুন।

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বদেবাঃ সমাপোহৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

—হে কন্যকে! বিশ্বদেবা আমাদের হৃদয়কে নির্মল করিয়া একত্রিত করুন। সেইরূপ বরুণ (জলাধিপতি), মাতরিশ্বা (বায়ু), প্রজাপতি ও অন্যান্য উপদেষ্টৃ দেবগণ আমাদিগের হৃদয় হইতে কলুষতা দূরীভূত করিয়া উভয় হৃদয়কে একত্রিত করুন।

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূর্জ্জীবসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

—হে কন্যকে! তুমি সস্নেহদৃষ্টি হইবে। তুমি পতিবিদ্বেষিণী হইবে না। তুমি গো-মহিষাদি পশুর বৃদ্ধিকারিণী হইবে। সর্ব্বদা সুপ্রসন্নমনা হইবে। তেজস্বিনী হইবে। বীরপ্রসবিনী, সৎপুত্রপ্রসবা, মৃতবৎসাদোষরহিতা, পঞ্চমহাযজ্ঞাভিরতা, সুখদায়িকা, আমার আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গলকারিণী হইবে।

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

—হে কন্যে! তুমি পতিকুলে আসিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননদ, দেবর, দেবরপত্নীদিগের উপর আদর-আপ্যায়নাদি গুণের দ্বারা স্বীয় আধিপত্য বিস্তার কর।

ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা।
ত্বাদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

—স্রষ্টা প্রজাপতি আমাদিগকে পুত্র-পৌত্রাদি সমৃদ্ধি প্রদান করুন। অর্য্যমাদেব আমাদের সন্ততিবর্গকে প্রশংসনীয় গুণালঙ্কৃত করুন। হে কন্যকে! তুমি সুমঙ্গলকারিণী হইবে। মঙ্গলময় দেবগণ তোমাকে এই পতিকুলে প্রবেশ করাইতেছেন। তুমি পতিকুলের মনুষ্য ও পশ্বাদির মঙ্গলকামিনী হইবে।

উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্যজীবন একটি পবিত্র ব্রত বা কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হয়। বিচ্ছেদের আশঙ্কা মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়া যায়। বিবাহের এই বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী-স্ত্রীর ভিতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে একটি দিব্য ভাবজগৎ। ব্রতধারণ করিয়া উভয়ে তখন সেই পরম লক্ষ্য বা আদর্শের দিকেই প্রধাবিত হয়।

উপযোগীবোধে প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে মদীয় সতীর্থ শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী বিরচিত "**বিবাহ-বাসরে**" শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—

আজি এ পুণ্য মধুব বাসরে হে প্রিয বন্ধু তোমার ঠাঁই।
সংসার-পথ-যাত্রাব পথে দু'টি কথা আমি বলিতে চাই॥
বিবাহ-বাসরে সারা দেশ জুড়ে প্রীতি-উপহার দেওয়ার রীতি।
সেই রীতি স্মরি প্রথমেই তোমা জানাই আমার স্নেহ ও প্রীতি॥
লহ স্নেহাশিস্ তরুণ যাত্রি! কুসুমিত হোক্ তোমার পথ।
ঘর্ঘর রবে কর্মমুখর চলুক তোমার জীবন-রথ॥
জ্ঞান ও প্রেমের মধুর মিলনে মধুময় হোক্ জীবন তব।
ভাবশতদল উঠুক ফুটিয়া মানস-সরসে নিতুই নব॥
আজি এ পুণ্য সুশুভ লগনে অজ্ঞাত এক জীবন-ধারা।
তোমার জীবনে সঁপিয়া জীবন হল আজি হায আপনহারা॥
আপন করিয়া লইযা তাহারে একপ্রাণ হয়ে ছুটিয়া যাও।
অসীম প্রেমের সিন্ধুর পানে কলকল্লোলে নিযত ধাও॥
তোমাদের দু'টি জীবনে বাঁধিল মধুর প্রেমের মিলন-রাখী।
তোমার হৃদয়ে তাহার হৃদয়, তোমার আঁখিতে তাহার আঁখি॥
তার মাঝে তুমি দেখ গৌরীরে, সেজন দেখুক তোমাতে শিব।
শিব-শক্তির মিলন দেখিয়া তৃপ্ত হউক জগৎ-জীব॥
কামের মিলন নহে তোমাদের, প্রেমের মিলন সফল হোক্।
তোমাদের শুভ মিলনের ফলে নন্দিত হোক্ সকল লোক॥
অগ্নি সাক্ষী করিযা আজিকে পড়িলে যে বেদমন্ত্রচয়।
জীবন ভরিয়া স্মৃতির ফলকে তাহা যেন সদা উজল রয়॥
"সংসার-পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময়" কবির বাণী।
চল সেই পথে তরুণ যাত্রি! প্রবীণ-দেশনা সতত মানি'॥

সংসার নহে ভোগের ক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র এ যে গো হায়!
অবিকম্পিত চিত্তে বহিতে হইবে ইহার বিষম দায়॥
শত দিকে আছে শত আহ্বান, করণীয় আছে শত ও শত।
মিলিয়া মিশিয়া সাধিতে হইবে জীবনেতে মহা সেবার ব্রত॥
প্রাণ ভ'রে কর জগতের সেবা পরহিতে নিজে বিলায়ে দাও।
অঞ্জলি ভরি' সংসার-বিষ আপন কণ্ঠে তুলিয়া নাও॥
এতদিন তুমি ছিলে অপূর্ণ, পূর্ণ আজিকে হইল ভাই।
অর্দ্ধাঙ্গিনী-রূপে বর্ণিতা শাস্ত্রে ধর্মপত্নী তাই॥
সহধর্মিণী সহকর্মিণী সেবিকা প্রেমিকা সখী ও জায়া।
শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের পাশে শান্ত শীতল তরুর ছায়া॥
পরস্পরের ভাববিনিময়ে পূর্ণ হউক উভের প্রাণ।
পরস্পরের কণ্ঠ মথিয়া উঠুক একই মহিমাগান॥
ব্রতচারী ব্রতচারিণী তোমরা তোমাদের প্রাণ পরের তরে।
তোমাদের শুভ মিলনে দেবতা নামিয়া আসুন মাটির ঘরে॥
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে করিও তোমরা পরাণ পণ।
ভগবৎস্নেহ-আশিস্-ধারায় ভরিয়া লইও পরাণ-মন॥
ব্যবহারে হও কুসুমকোমল কর্মে কঠোর বজ্রপ্রায়।
তোমাদের পাশে আসি যেন সবে পরাণে বিমল শান্তি পায়॥
হৃদয় হইতে নিঃসৃত হোক্ শ্রদ্ধা স্নেহ ও প্রীতির ধারা।
গৃহ-সংসার-সমাজ-স্বদেশ-সেবায় হও গো আপনহারা॥
গণদেবতার হোক্ জাগরণ, শৌর্য্য নামুক ধরণীতলে।
শ্রী ও বিদ্যা আসুক নামিয়া, ভাসুক জগৎ প্রেমের জলে॥
মূর্ত্ত হউক শান্তি ও প্রীতি তোমাদের শুভ পরশ লভি।
হর্ষে গাহুক কম্বুকণ্ঠে মিলন-গীতিকা প্রেমিক কবি॥

কি আর কহিব, পরমেশপদে যাচি তোমাদের আয়ু ও জয়।
তাঁহার আশিসে দোঁহার জীবন হউক পূর্ণ শান্তিময় ॥

দাম্পত্যজীবন অশান্তিময় এবং কলুষিত হয় কামের ছলনায় ও ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়। অপরিহার্য্য কামকে ব্রত-নিয়ম-তপস্যার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। সুনিয়ন্ত্রণের ফলে—সংযত বিহারের ফলে কামও প্রেমে রূপান্তরিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন "সংসার করিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। আগে শিক্ষা এবং সংযমের পরেই গার্হস্থ্যধর্ম্মের ব্যবস্থা ছিল। সে সমাজ নাই বলিয়াই দাম্পত্যজীবন এখন কলুষিত পশুজীবনে পরিণত—তাই ঘরে ঘরে রোগ-শোক, অশান্তি-কলহের আবির্ভাব হইযাছে।" পারিবারিক জীবনে এত অশান্তির মূল কারণ কি, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর চোখে আঙ্গুল দিয়াই গৃহস্থদের দেখাইয়া গিয়াছেন। গার্হস্থ্যাশ্রম যে অক্ষম-দুর্বলের জন্য নহে, মনুসংহিতাশাস্ত্রগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৯ শ্লোকেও তাহার উল্লেখ আছে। যথা :—

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতানিত্যং যোঽধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥

"যিনি পরকালে অক্ষয় স্বর্গকামনা এবং ইহকালে সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অতি যত্নের সহিত গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন করিবেন। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইলে অথবা ইন্দ্রিয়গণ সুসংযত না থাকিলে এই পবিত্র গৃহস্থাশ্রমধর্ম প্রতিপালন করা যায় না।"

গৃহস্থধর্মপালন মুখের কথা নহে। এই আশ্রমের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিবিধ কর্ত্তব্যপূর্ণ সংসারাশ্রমের দায়িত্বপালন অসম্ভব। সংযতেন্দ্রিয় বীর না হইলে

সংসারীর কর্ত্তব্যসম্পাদন সম্ভবপর নহে। গার্হস্থ্যাশ্রম জ্যেষ্ঠাশ্রম। মনুসংহিতাতে আছে ঃ—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

৩।৭৭ ৭৮ শ্লোক

—"যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই অপরাপর আশ্রমবাসিগণ জীবনধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং ভিক্ষু—এই তিন আশ্রমীই গৃহস্থের দ্বারা প্রতিপালিত। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

শ্রেষ্ঠ যেমন, তেমনি এই আশ্রমের কর্ত্তব্যও গুরুতর। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ এবং অতিথিসকল— ইহারা সকলেই গৃহস্থের উপর প্রত্যাশী। অতএব ইঁহাদিগের প্রতি বক্ষ্যমাণ কর্ত্তব্যসকল সম্পাদন করাই জ্ঞানবান্ গৃহস্থের উচিত। স্বাধ্যায়দ্বারা ঋষিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে, হোমদ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণের, অন্নদ্বারা মনুষ্যগণের এবং বলিপ্রদত্ত অন্নাদির দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জীবগণের যথাবিধি তৃপ্তিসাধন করিবে—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন এই পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না পঞ্চসূনাজনিত পাপ প্রত্যহই অনুষ্ঠিত হইতেছে। গৃহস্থের পাঁচটি সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান আছে; যথা—চুল্লী (উনন), প্রেষণী (জাঁতা বা শিল-নোড়া), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উদূখল-মুষল) এবং উদকুম্ভ বা জলাধার কলস। এই পাঁচটিকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত

রাখিলে প্রাণিহিংসা হয়। এই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য গৃহীদের প্রতি পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই সব শাস্ত্রীয় বিধি অপালনজনিত প্রত্যবায় গৃহস্থদের অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যুধিষ্ঠির নারদের নিকট গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে নারদ গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্পর্কে বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্য হইতে বিশেষ কয়েকটি উপদেশশ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথাঃ—

যাবদর্থমুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তো রক্তবত্তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ॥ ৭।১৪।৫
যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥ ৭।১৪।৮
ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্॥ ৭।১৪।১০
আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ॥ ৭।১৪।১১
সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ।
শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ॥ ৭।১৪।১৪

"পণ্ডিতব্যক্তি যাবন্মাত্র প্রয়োজন তাবন্মাত্র অর্থের সেবা করতঃ দেহে ও গেহে, অন্তরে বিরক্ত এবং বাহিরে অনুরক্তের ন্যায় থাকিয়া লোকসমাজে পুরুষকার আবিষ্কার করিবে। যাবৎপরিমিত ধনাদিতে উদর পূরণ হয়, দেহিগণের তাবৎপরিমিত দ্রব্যেই স্বত্ব, তাহার অধিকে নিজের স্বত্ব আছে বলিয়া যে মনে করে, সে দণ্ড পাইবার যোগ্য। গৃহস্থব্যক্তি অতিশয় আয়াসে ত্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ, কামের) সেবা করিবে না। যে দেশে যে কালে দৈবাধীন যাহা লাভ হয়, তাহারই সেবা

করিবে। কুক্কুর, পতিত এবং চণ্ডালাদি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকে যথাযোগ্য তাহাদের ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। যে নিজের ভার্য্যাতে এ আমারই ভোগ্য, এই স্বত্বজ্ঞান আছে, সেই একমাত্র ভার্য্যাকেও অতিথি উপস্থিত হইলে, নিজের শুশ্রূষা না করাইয়া অতিথি-পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিয়োগ করিতে হয়। হে রাজন্! গৃহস্থ দৈবলব্ধ অর্থ দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে এবং পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অর্থ দ্বারা আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এইরূপে জীবিকা সম্পাদন করিয়া শেষ বিষয়ে যে পুরুষ স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তিনি প্রাজ্ঞ এবং তিনি নিবৃত্তিমার্গের পথিক মহাজনের পদবী প্রাপ্ত হয়েন।"

মহাভারতাদি পুরাণগ্রন্থে এবং মনুসংহিতাদি স্মৃতিগ্রন্থে গৃহস্থদের কর্ত্তব্যসম্পর্কে এইরূপ বিস্তারিত আলোচনা অনেক স্থলেই আছে। আমরা প্রত্যেক গৃহীকে মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের চতুরধিকশততম অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বাস্তবিকই আদর্শ গৃহস্থ ধর্মপালন সহজ কথা নহে। আদর্শ গৃহীর ধর্মপালন অতীব কঠিন। সংযত তপস্বী অনাসক্ত গৃহী ব্যতীত এই ধর্ম যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নহে। গৃহী বলিয়া কেবল গৌরব অনুভব করিলেই চলিবে না। সুখভোগে তো গৃহীর অধিকার আছেই—এই ধারণা পোষণ করিয়া ত্যাগধর্মটা কেবল সন্ন্যাসীদের স্কন্ধেই চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া আদর্শগৃহীর লক্ষণ নহে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিত্য কি না অর্থাৎ পরকাল-পরলোকেও ভোগ-সুখের অটুট ব্যবস্থা থাকিবে কি না—এই মনোভাব লইয়া জনৈক গৃহীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপ কশাঘাত করিয়াছিলেন, গৃহীদের তাহা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। গৃহীদের যেমন সুখভোগের ব্যবস্থা আছে, তেমনি কঠোর কর্ত্তব্যও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। সেই কর্ত্তব্যের কথাও

তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। বিবাহ করিয়া সন্তানেব জনক হওয়াকেই আদর্শ গৃহী বলে না। কেবল ইন্দ্রিয়সুখভোগ করাই আদর্শগৃহীর ধর্ম নহে। গৃহীর সমগ্র জীবন পরেব জন্য উৎসর্গীকৃত। তাহার সমগ্র জীবন একটি বিবাট যজ্ঞবিশেষ। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা আদর্শগৃহীরও ধর্ম। পরের সুখ—পবেব শান্তি উৎপাদন করিয়া চলাই সেবাধর্মী গৃহস্থের লক্ষণ। সাম্যবাদেব কথ বিদেশ হইতে আমদানী কবিযা জনসাধাবণকে আমরা বিভ্রান্ত কবি এবং শাস্ত্রের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে আমরা সমাজ-ব্যবস্থাপকদের উপব বিতৃষ্ণ এবং ক্ষুব্ধ করিয়া তুলি। পরিবাব এবং সমাজের প্রত্যেকের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা তো আমাদেব শাস্ত্রে উল্লিখিত আছেই, এমন কি গৃহপালিত পশুপক্ষীদেব প্রতিও কর্ত্তব্যেব নির্দ্দেশ আছে। নিজেব জন্য স্বল্পমাত্র রাখিয়া পরকে সব বিলাইয়া দিবাব মনোবৃত্তি অর্থাৎ স্বার্থত্যাগের প্রেবণা আমরা শাস্ত্র হইতেই লাভ করি। খাদ্য এবং ধন সমভাবে বিভাগ এবং বণ্টনের ব্যবস্থা - আমাদের শাস্ত্রে পবিষ্কারভাবে উল্লিখিত আছে। সেই মহান কর্ত্তব্য ভুলিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদনে ত্রুটি করিয়া যাহারা সমাজে গৃহীরূপে অবস্থিত, তাহাবা সমাজেব মিত্র নহে, ববঞ্চ তাহারাই সমাজের ঘোরতর শত্রু। যাহা হউক, গৃহধর্মপালন সহজসাধ্য নয় বলিয়া বিবাহেব দায়িত্ব গ্রহণ না কবিয়া সুবিধাবাদী স্বেচ্ছাচারীর জীবনযাপনকেও ঠাকুর আদর্শজীবন বলেন নাই। গৃহস্থ-জীবন—সুবক্ষিত দুর্গবিশেব দুর্গে বাসিয়া যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করা যেমন সহজ, তেমন সংসারাশ্রমে থাকিয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আদর্শগৃহী হওয়া সম্ভবপর। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই এক গৃহীভক্তকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন - "বরঞ্চ বিবাহ করিয়া তুমি যদি একজন আদর্শ গৃহস্থ

হইতে পার, তবে জগতের বহু উপকার হইবে। বক্তৃতা অপেক্ষা কার্য্যে দেখাইতে পারিলে জগতের স্থায়ী উপকার হয়। সে আদর্শ অন্ততঃ দশজনের ভিতর প্রবেশ না করিয়া পারে না। আর এক্ষণে সমাজে আদর্শ গৃহস্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।" বিবাহ না করিয়া ব্যভিচারীর জীবন যাপন করা অপেক্ষা বিবাহিত জীবন যাপনকে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ গৃহীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আরও দশজনকে সে আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেই ঠাকুর তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যভক্তবৃন্দকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আদর্শ গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন যে কত কঠিন তাহা ঠাকুর জানিতেন। জানিয়া শুনিয়াই তিনি গৃহীদের তদ্বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক নূতন সংসারী গৃহস্থকে সংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িতে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্বাসবাণী প্রদান করিতেছেন—"বৎস। সংসারাশ্রম কঠোর এবং ভীষণতর জানি, তথাপি সংসারাশ্রমই জীবের উন্নতির সোপান। সংসার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে মা সন্তানকে কোলে লন না। মায়ারাজ্যের নামই সংসার। কোথায় গিয়া তুমি মায়া অতিক্রম করিবে? মায়ের শরণাগত হইয়া সংসার-আগুনে পুড়িতে থাক, মা-ই রাস্তা খুলিয়া দিবেন। মায়ের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার নাম লইয়া তাঁহারই সংসারে কাজ কর। রোগে, শোকে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে যেমন রাখেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যাস কর। ভগবান্ সংসারের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাস্তা বানাইয়াছেন। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যে না আছে তাহা নহে, কিন্তু ইহাই হইল সাধারণ বিধি। অর্থাৎ সংসারীকে ভয়ে সংসার হইতে পলায়ন করিলে চলিবে না। তীব্র বৈরাগ্য যাহার আসে, তাহার কাছে সাংসারিক কর্ত্তব্য অবশ্য তুচ্ছ হইয়া পড়ে,

যেমন বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি ; কিন্তু সেই পরাবৈরাগ্য কয়জনেরই বা আসে ? সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতেই ক্রমশঃ গৃহীর চিত্ত ভগবদভিমুখী হইয়া উঠে। সংসারের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাস্তা তৈরী হয়। গৃহীর পক্ষে সংসারধর্ম পালন করিয়াই সংসারের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আর ঠিক ঠিক ভাবে গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন করিলে পরিণত বয়সে আপনি বৈরাগ্য না আসিয়াই পারিবে না। কবি কালিদাসকৃত রঘুবংশের প্রথম সর্গের অষ্টম শ্লোকে এই স্বাভাবিক পরিণতির কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

—"তাঁহারা (রঘুবংশীয় রাজন্যবর্গ) শৈশবকালে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনকালে বিষয়সম্ভোগ এবং বৃদ্ধকালে মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তকালে যোগবলে অর্থাৎ পরমাত্মচিন্তায় দেহত্যাগ করিতেন।" এই ছিল ভারতবর্ষের আদর্শগৃহীর লক্ষণ। সংসারের খুঁটিনাটি কর্ত্তব্য নিখুঁতভাবে প্রতিপালন করিয়াও অন্তিমে সজ্ঞানে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে আদর্শগৃহী করিতেন দেহত্যাগ। বিশেষভাবে যোগানুষ্ঠান-পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়াও কেবলমাত্র সাংসারিক কর্ত্তব্য যথাযথ-ভাবে প্রতিপালন করিয়া বিবিক্ত যোগিদের ন্যায় আদর্শগৃহী মৃত্যুর ক্ষণ-কাল অবগত হইয়া পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে প্রস্তুত হইবার সঠিক নির্দ্দেশ দিতে পারিতেন। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী যে অবস্থা আসে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালনের পর সংসারধর্মে স্বভাবতঃই একটা বিরাগ জন্মে। তখন বানপ্রস্থ অবলম্বনের বিধান। কিন্তু কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া জোর করিয়া অসময়ে এই বিধান সৃষ্টি করিলে তাহাতে কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

সংসারকে যে ভয় করে, সে তো কাপুরুষ। শ্রীশ্রীঠাকুর পুরুষের ভিতর এই কাপুরুষত্বকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। পুরুষের ভিতর থাকা চাই পুরুষত্ব। সংসারভয়ে ভীত এক গৃহস্থ ভক্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা—"মায়ের সংসার দিয়াই মায়ের কোলে উঠিতে হইবে। সুতরাং ইহা না ভুলিয়া জীবন-পথ বাহিয়া চলিয়া যাও, শুধু ভয় পাইলে চলিবে কেন? নারীমাত্রেই একাধারে মা ও মায়া। তোমার সাধনায় মায়ের আবির্ভাবও হইতে পারে কিম্বা মায়ার বিকাশ পূর্ণমাত্রায় হইতে পারে। যাহা চাও সেই প্রকার সাধনার দরকার।" এই অমূল্য উপদেশের ভিতর নিগূঢ় তাৎপর্য রহিয়াছে। গৃহী স্ত্রীকে ভোগবতীরূপেও পাইতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে ভগবতীরূপেও সন্দর্শন করিতে পারে। পুরুষের ইচ্ছানুযায়ীই সেবাপরায়ণা প্রকৃতি ইন্ধন যোগায়। প্রকৃতির যাবতীয় প্রচেষ্টা পরার্থে অর্থাৎ পুরুষের জন্য। পুরুষের কামনা-বাসনা শুদ্ধ পবিত্র হইলে প্রকৃতির ভিতর অশুদ্ধ বাসনার স্পন্দন আপনিই স্তব্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতি তখন পরমাপ্রকৃতিরূপে রূপান্তরিতা হন। হর-পার্ব্বতীর দিব্য কৈলাসলীলা এই মর্ত্ত্যভূমিতেই তখন অবতরণ করে। পুরুষের ইচ্ছাই প্রকৃতির রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তর আসে তপস্যার ভিতর দিয়াই। পার্ব্বতী রূপযৌবন দিয়া মহাদেবকে যখন ভুলাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি পতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। কুমারসম্ভবে অমরকবি কালিদাস নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং,
পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।

নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী,
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥

—পঞ্চম সর্গ, প্রথম শ্লোক।

—"মহাদেব সেইরূপে পার্ব্বতীর সমক্ষে মদনকে ভস্মসাৎ করাতে তাঁহার মনোরথ ভঙ্গ হইল, তখন তিনি মনে মনে আপনার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যেহেতু প্রিয়তমের প্রীতিভাজন না হইলে সেই সৌন্দর্য্যের কোন ফল নাই।"

পার্ব্বতী তখন রূপকে সফল করিবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাহা আর কিছুই নহে, ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তপস্যা-সংযমের পথ।

ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং,
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥

—পঞ্চম সর্গ, দ্বিতীয় শ্লোক।

—"তখন তিনি তপস্যার দ্বারা সমাধি অবলম্বনে স্বীয় রূপ সফল করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাহা তাঁহার পক্ষে উচিত কার্য্যই হইয়াছিল। যেহেতু তপস্যা না করিলেই-বা যাহার দ্বারা হরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইবেন, সেইরূপ প্রেম এবং যে পতির বনিতা হইলে বিধবা হইতে হয় না সেইরূপ স্বামী কিরূপে লাভ করিতে পারিবেন?

রূপকে সফল করিতে আজকাল যেরূপ বিবিধ বিলাস-প্রসাধন-দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, পূর্ব্বে সেইরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন প্রশংসনীয় ছিল না। সংযমে, তপস্যার অনলে কাম বিদগ্ধ হইলে যে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি দেহে ফুটিয়া উঠে, তাহার সঙ্গে কি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের তুলনা চলে?

হিন্দুনারী পতিকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। বাস্তবিকই শিবকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্যারই প্রয়োজন। "যাহা চাও সেই প্রকার সাধনার দরকার"—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উপদেশের ভিতর সেই গভীর তাৎপর্য্যই নিহিত অর্থাৎ পুরুষ নারীকে যে ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিবে, নারী তাহার সম্মুখে সেই ভাবেই ফুটিয়া উঠিবে। পুরুষের মনোরঞ্জন নারীর স্বাভাবিক গুণ। কাজেই নারীকে আদর্শ নারীরূপে গঠন করিয়া তুলিতে হইলে পুরুষেরও অনেকখানি সংযম এবং সাধনার দরকার। এই দিব্য সাধনার ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পরমাপ্রকৃতি সারদারূপে লাভ করিয়াছিলেন। এই স্বর্গীয় ভালবাসা বা প্রেমের বলেই শ্রীশ্রীঠাকুরও তাহার সহধর্ম্মিণী সুধাংশুবালাকে মনোময়ী দেবীমূর্ত্তিতে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পৌরুষ না থাকিলে এইরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ভীত না হইয়া প্রাণে বলসঞ্চয়পূর্ব্বক সংযমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাইয়া আদর্শ-গৃহীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতেই গৃহীশিষ্যগণকে শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অনেকের ধারণা, বিবাহ করিলেই বুঝি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। বিবাহ করাকে অনেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরও এই ধারণার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা—"যথাশাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিয়াও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যাইতে পারে। আর শ্রীভগবান্ যাহাকে শ্রীচরণে টানিবেন, সংসার কখনও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। গৃহস্থাশ্রমেও বিধি-নিষেধ আছে, বর্ণাশ্রমধর্ম আছে। তাহার ব্যভিচার করিলে গৃহস্থধর্মও কলুষিত হয়। যাহা হউক ভগবানে নির্ভর করিয়া চলিও, তিনিই সব ঠিক করিয়া দিবেন।" সংযতভাবে সংসার-জীবন যাপন করিয়াও অধ্যাত্ম-উন্নতি লাভ করা যায়, অসংযম-ব্যভিচারের ফলে গৃহস্থধর্মও কলুষিত হয়—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম। নতুবা গার্হস্থ্যধর্ম আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী নহে। সংযমই গার্হস্থ্য ধর্মের মূল কথা। নববিবাহিত এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"বিবাহিত জীবন বা গার্হস্থ্যধর্ম স্বেচ্ছাচারীর নহে। গৃহস্থ হইযাই পূর্ণ সংযম শিক্ষা করিতে হইবে, আদর্শ গৃহী হইতে হইবে। কিছুদিন দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচয্য পালন কর। উভয়ের দেহের পূর্ণ পরিণতি বা পরিপুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কর্তব্য। উভয়কে উক্ত ভাবে ভাই-ভগিনীর মত থাকিতে হইবে; উভয়কে ভক্তের ন্যায় গুরু-ভগবানের ভজন-সাধনা ও প্রার্থনাদি করিতে হইবে। ভোগ-ইয়ারকি না দিয়া পবিত্রভাবে উভয়ে ধর্মপালন করিবে। যেন মনে কোনরূপ

কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার না হয়। পরস্পরের সাহায্যে সন্তানসেবা, জীবসেবা, জগৎসেবার উপযোগী দেহ-মন গঠন করিতে হইবে।" পূর্ব্বে সমাজে গৌরীদানের ব্যবস্থা ছিল। কাজেই বিবাহিত-জীবনেও কিছুকাল সংযতভাবে স্বামী-স্ত্রীকে জীবনযাপন করিতে হইত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দেহের পূর্ণ পরিণতি বা পরিপুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়কেই শাস্ত্রীয় বিধানে সংযত-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু বর্তমান কালস্রোত সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দিকে প্রবাহিত। কাজেই সংযমের প্রশ্ন কোন সময়ে বা কোন কালেই উত্থাপিত হয় না। 'গৃহস্থ হইয়াই 'পূর্ণসংযম শিক্ষা করিতে হইবে'—এই কথা আর এখন মোটেই গ্রাহ্যের বিষয় নহে। কেবল সন্তান-সন্ততিসৃষ্টিই এখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুসন্তান সৃষ্টির দায়িত্ব বহন করিতে গেলেই ত্যাগ-সংযমের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই দিকে আর মাথা ঘামায় কে ?

বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী কিভাবে চলিবে, এ সম্পর্কেও শ্রীশ্রীঠাকুর এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া সুন্দর কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা—"উভয়ের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলে উত্তেজনা বা কামের ভাব চলিয়া যাইবে। প্রকৃত প্রেম জন্মিলে ঘৃণ্য কাম আপনা হইতে চলিয়া যায়। এতদর্থে উভয়ে একসঙ্গে ভগবদুপাসনা প্রার্থনাদি করিবে। উভয়ে একত্রে ভক্ত ও ভগবানের লীলাকাহিনী আলোচনা করিবে। যেন কাহারও মনে কোনপ্রকার অপবিত্র ভাবের উদ্রেক না হয়। প্রথম প্রথম হইলেও পরে অশান্তি বা উদ্বেগ চলিয়া যাইবে। নতুবা দূরে দূরে থাকিলে সহজেই সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। উভয়ে সংযত হইয়া ভক্তের মত জীবনযাপন করিতে পারিলে দাম্পত্যজীবন মধুময় হয়। আদর্শ-গৃহস্থ হইয়া সংসার-সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করা যায়।" স্ত্রী হইতে কেবল দূরে

থাকিলেই সংযমী হওয়া যায় না। আসলকথা ভগবদুপাসনা বা প্রার্থনা দ্বারাই ক্রমশঃ চিত্তের কামভাব দূরীভূত হয়। এইজন্যই স্ত্রীকে ভয় না করিয়া, সর্ব্বনাশের হেতু মনে না করিয়া চিত্তে পবিত্র ভাব আনয়নজন্য সম্মিলিত ভগবদুপাসনার একান্ত প্রয়োজন। দাম্পত্যজীবনে অন্যান্য প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যের সঙ্গে উপাসনার ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। ভাগবত-ধর্ম আলোচনায় এবং উপাসনায় মনের গতি ভগবদভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, পারিবারিক জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় এই বিষয়টির প্রতি এক্ষণে সমাজের কাহারও তেমন সজাগ দৃষ্টি নাই। বিধিনিষেধ পালন করিয়া চলিলে গৃহস্থধর্ম পালন করিয়াও জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহার প্রমাণ—উপনিষদের ঋষিসমাজ। গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন করিয়াও সমাজে তখন বহু ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালীন গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির নিকট অনেক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধক শ্রদ্ধাবনতচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিতেন, গৃহে বসিয়াই শান্ত-সমাহিতচিত্তে তাঁহারা পরব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। উপনিষদে এই ব্রহ্মজ্ঞ গৃহমেধী বা গৃহস্থ-ঋষির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। গৃহস্থধর্ম্মের কোন দোষ নাই, আসল গলদ হইল শিক্ষার। সংযমের অভাবই সামাজিক জীবনের অধঃপতনের মূল কারণ।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে খ্যাতনামা সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজকে তাঁহার এক বিবাহিত গৃহস্থশিষ্য কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিল। তদুত্তরে স্বামীজী যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা খুবই প্রাণস্পর্শী এবং গৃহীদের পক্ষে উপযোগী বোধ করায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রশ্ন :—"বাবা! ধর্মরাজ্যে উন্নত হইবার সহজ উপায় কি? আমরা ত বিবাহিত, ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে নাকি ধর্মরাজ্যে উন্নতি হতেই পারে না, তবে বাবা! আমাদের গতি কি হবে?"

উত্তর ঃ—"কে বলেছে যে বিবাহিত জীবনে ধর্ম্ম হয় না? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের কত পুত্র ছিল জানিস্? একশত। তাঁহার কি ধর্ম্ম হয় নাই, তাঁহার কি জ্ঞান হয় নাই? যুধিষ্ঠির কি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন না? নলরাজা কি অধার্ম্মিক ছিলেন? তবে তোদের এ আশঙ্কা কেন? বেটা! গার্হস্থ্যজীবনেই ধর্ম্মরাজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করা যায়। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণও গৃহস্থ ছিলেন। শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রীসংসর্গ করলে ব্রহ্মচর্য্যের কোনও হানি হয় না। ঋতুকালে স্ত্রী-সংসর্গ করলেও ব্রহ্মচর্য্য অটুট থাকে। কিন্তু তোরা যদি অজ, কবুতর, বানর ইত্যাদি প্রাণীর ন্যায় প্রত্যহই কামরিপুর সেবা করিস্ তবে বুঝতে হবে তোদের ধর্ম্মরাজ্যে উন্নত হবার ইচ্ছা আদৌ নেই, ও শুধু মুখে বলছিস্। পশুরাজ সিংহ বৎসরে একবার মাত্র কামরিপুর সেবা করে, দেখ্‌ত কি তার সংযম! আর তোরা মনুষ্য হয়েও ইতর প্রাণীর ন্যায় ভোগে মত্ত হচ্ছিস্। বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গৃহস্থ-জীবন যাপন করলে এই পবিত্র গার্হস্থ্যাশ্রমেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়।"

সকল মহাপুরুষের উপদেশেই ঐক্যের সুর প্রতিধ্বনিত। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের নিন্দা কেহই করেন নাই। কিন্তু আসল গলদ কোথায় তাহার ইঙ্গিত সকলেই করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা এবং সংযমের অভাবই যত অনিষ্টের কারণ। শক্তিশালী জাতির অভ্যুদয়ে সংযমই একমাত্র প্রধান সহায়। সমাজে মাতৃশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলেও সংযমের প্রয়োজন। ব্যভিচারী কোন দিন মাতৃশক্তির উদ্বোধন করিতে পারে না। সংযত গৃহী বিবাহিত-জীবনেও মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে সমর্থ। শ্রীশ্রীঠাকুর চাহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক গৃহী-শিষ্যের জীবন গড়িয়া উঠুক আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থ ঋষির মত। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলেই আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

গৃহস্থালী বা সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনেব আদর্শের কথা উঠিলেই শ্রীশ্রীঠাকুব ১৩২৭ সালের আর্য্যদর্পণে প্রকাশিত "বৈদান্তিকের গৃহস্থালী' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ কবিতে সকল গৃহীভক্তকেই উপদেশ দিতেন। প্রবন্ধটি বড়ই মনোবম, আমেবিকায স্বামী রামতীর্থেব ইংরাজীতে দেওয়া বক্তৃতাবই বঙ্গানুবাদ। উপযোগীবোধে উক্ত প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বৈদান্তিকের গৃহস্থালী

(প্রথম পর্ব্ব)

নবনারীরূপী পবমাত্মন্ !

আজকে যে কথা তুলব, তা নিযে আবও একদিন আমাদেব আলোচনা হয়েছে। কথাটা বড গুরুতর—"বিবাহিত কোন ব্যক্তি ন্যায়তঃ সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা কবৃতে পারে কি-না!" প্রসঙ্গও বড দীর্ঘ হবে, কাজেই এক রাত্রের বক্তৃতাব সব কথা শেষ হবে না। তবুও দেখা যাক্ আজকে আমবা কতদূর কবতে পারি।

এখন, যা তোমাদেব সকলের পক্ষেই প্রয়োজন, বাম সেই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করছেন।

প্রশ্ন এই—বিবাহিত দম্পতি কিভাবে জীবনযাপন করলে তাঁদের বিবাহের পরিণামে দুঃখ-শোক বা জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ না করতে হয়। লোকে বলে "হে ভগবান্! আমার দুঃখ দূর কর। হে প্রভু খৃষ্ট! আমার দুঃখ ঘুচাও। হে বুদ্ধ, হে কৃষ্ণ, আমার দুঃখ দূর কর প্রভু!" কিন্তু রাম তোমাদের বলছেন, মরণের পর তাঁরা তোমাদের দুঃখ দূর করবেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতেই কে তোমার দুঃখ

দূর করবে ? এই জীবনে স্বামী হচ্ছেন স্ত্রীর পক্ষে খৃষ্ট আর স্ত্রীও হবেন স্বামীর খৃষ্ট; কিন্তু আসলে হচ্ছে কি না, স্বামীর কাছে স্ত্রী হলেন জুডাসের (**Judas Isacriot—**খৃষ্টের অন্যতম শিষ্য—ইহার বিশ্বাসঘাতকতায় খৃষ্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন) অবতার আর স্ত্রীর কাছে স্বামীও তাই। এখন কি করে এ গোল মিটানো—কি করেই বা সকল দিকের সুব্যবস্থা করা ?

প্রত্যেক স্বামীকে এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে ত্যাগধর্ম্ম আশ্রয় করতে হবে। তোমরা জান, খৃষ্টানজগৎ খৃষ্টকে ত্যাগের অবতার বলে বিশ্বাস করে। তেমনি প্রত্যেক স্ত্রী যদি ত্যাগের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হতে পারেন, তাহলে তাঁর স্বামীকে তিনি বাঁচাতে পারেন। এখন ত্যাগ কথাটার এমনি দুরদৃষ্ট যে, যে ত্যাগের নাম শোনে, তারই পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শিউরে ওঠে যেন !

ত্যাগের নামে সকলেই ভয় পায় বটে, কিন্তু আবার ত্যাগ না হলেও গৃহকে তোমার স্বর্গে পরিণত করবার কল্পনাও অসম্ভব। ত্যাগ কথাটাকে লোকে কেন বা খুবই ভুল বোঝে ! আর এ কথাটা বহু বক্তৃতায় এত ব্যবহার করা হয়েছে যে, এখন এর খাঁটী অর্থটা কি তা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। ত্যাগ বললে এ বোঝায় না যে তোমাকে হিমালয়ের গভীর অরণ্যে যেতে বলা হচ্ছে ; ত্যাগের অর্থ এমন নয় যে তোমাকে ন্যাংটা হয়ে ফিরতে হবে বা খালি পায়ে খালি মাথায় বেড়াতে হবে। তার নাম ত্যাগ নয়। তাই যদি ত্যাগের অর্থ হতো, তাহলে বিবাহিত দম্পতি কি করে ত্যাগী হতে পারত ! তারা স্বামী-স্ত্রীতে ঘর করছে, তাদের ঘর-বাড়ী আছে, জায়গা-জমি আছে—তাহলে আর তাদের ত্যাগী বলা যায় কি করে ? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ত্যাগের চিত্র আঁকা হয়েছে, তাতে শিব আর পার্ব্বতী তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসে

রয়েছেন, এই দেখান হয়েছে। লোকে ভাবে, হিন্দুরা বুঝি লোকজনের সংস্পর্শ ছেড়ে জঙ্গলে বসে থাকাকেই ত্যাগ বলে—সব ছেড়ে-ছুড়ে দেওয়া, সবকেই ঘৃণা করা, এই বুঝি তাদের ত্যাগ, কিন্তু হিন্দু জানেন ত্যাগের অর্থ তা নয়। গার্হস্থ্য-জীবনেও হিন্দুকে ত্যাগের মহিমা প্রচাব করতে হয়। বেদান্তের এই মহান্ সত্য এই ত্যাগের বিধান যদি কেবল গুটিকতক এমন লোকের জন্য হত, যারা জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে, তাহলে তার সার্থকতা থাক্ত কোথায়?

বিবাহিত ব্যক্তি কি করে এই ত্যাগধর্ম্ম আচরণ করতে পারে? স্বামী আর স্ত্রী যদি পরস্পবের আনন্দ বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাহলে এই মুহূর্ত্তেই সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায। স্বামী আর স্ত্রী যদি পরস্পবের মুক্তিদাতা না হয়, তাহলে হাজার বাইবেলেও কারুর কিছু করতে পারবে না। দেখনা কেন, লোকে যখন ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে যায়, তখন তাদের সব জিনিস ত্যাগ করতে বলা হয়; তাদের ধন-জন, তনু-মন সকলই ভগবানের বলে ভাবতে বলা হয়; নিজেকে দেহ না ভেবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হতে বলা হয়—এমনি কত কথাই তারা শোনে। কিছু জ্ঞান তারা পায় বটে, কিন্তু যখন তারা বাড়ী ফিরে তখন কি হয়? হযত তখন স্ত্রী এসে তাঁকে বল্‌লেন, ওগো শুনছ আমার একটা বারাণসী শাড়ী চাই—স্বামী বল্‌লেন, 'হাতে ত এখন টাকা নাই'। একি অভিনয়? ছোট একটি ছেলে এসে হযত বল্‌ছে, 'বাবা, ও বাবা, এদিকে এস'! হায়রে হায়, আমার ছেলে, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা, আমার বোন—তারাই তো এই বল্‌ছে। সেই স্ত্রী-কন্যা, সেই ঘর-বাড়ী, সেই পরিবার-পরিজন—মন্দিরে বসে ভগবান্‌কে তাদের সমর্পণ করে দেওয়া হয়েছিল; আর

যেই ঘরে এসে পা পড়্‌ল, অমনি ভগবানের কাছ থেকে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হল—চারদিক থেকে "আমার" "আমার" রব উঠ্‌ল - তখন আর ভগবানের নাম নাই। সেই যে এক মুহূর্ত্তের ভাবের ঘোরে মন বলে উঠেছিল, "হে ভগবান্! আমি তোমারই—আমি তোমারই, আমার সবই তোমার—আমার সব তোমায় দিলাম।" —স্ত্রী-পুত্রের মুখ যখন চোখে পড়্‌ল তখন কোথায় গেল সেই ভাবের ঢেউ।

স্পষ্টই দেখ্‌ছ, আজকাল সংসার করা আর আধ্যাত্মিক উন্নতি ক্রমেই যেন পরস্পরের বিরোধী হয়ে উঠ্‌ছে। দেবস্থানে যা করা হয়, ঘরে এসে তার সব উল্টে যায়। এ যেন পেনিলোপের (Penelope) কাহিনীর মত। সারাদিন ধরে সে যা বুনতো, রাত্রে আবার একটি একটি করে তার সবগুলি সুতা খুলে নিতে হতো। তেমনি দেবস্থানে গিয়ে পূজার্চ্চনায় তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির যে কাপড় বুনে এস, বাড়ী এসে আবার এক এক করে তার সব বুনোনি খুলে ফেল। চিরকালই যদি এমনি চলে, তাহলে আর আশা নাই। ভগবানের সঙ্গে রসিকতার সাধ মিটানো যদি তোমার উদ্দেশ্য না হয়, সাধন-ভজনকে যদি একটা প্রহসন করে না তুলতে চাও, তাহলে তোমাকে ঠিক ঠিক করে সব কাজ করতে হবে। যার জন্য তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে না, সেই বিঘ্নকে আগে দূর করতে হবে—তোমাকে ঘর সামলাতে হবে সকলের আগে। প্রত্যেক স্বামীকে তার স্ত্রীর খৃষ্ট হতে হবে, আবার প্রত্যেক স্ত্রীকে তার স্বামীর খৃষ্ট হতে হবে। লোকে বলে, "ওগো, তোমায় আমি ভালবাসি।" কি ভণ্ডামি! তোমার স্বামীকে বা তোমার স্ত্রীকে সত্য সত্যই যদি তুমি ভালবাস, তাহলে তার জন্য তোমাকে কিছু না-কিছু

আত্মত্যাগ করতেই হবে—কিন্তু তুমি কি তা কর? না। স্ত্রীটি চান, স্বামীটি তার দখলে থাকে, আবার স্বামী চান, স্ত্রীকে তাঁর হাতের মুঠোর ভিতরে রাখেন—যেন স্ত্রী একটি নির্জীব জড় পদার্থ—অস্থাবর সম্পত্তির মত তাকে যেন দখলে রাখা চলে। এমনি একজন আর একজনের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে চায়। কিন্তু তোমরা স্বামী-স্ত্রী যদি বাস্তবিকই পরস্পরকে ভালবাস, তাহলে তোমাদের পরস্পরের যাতে হিত হয়, তাই তোমাদের করা কর্তব্য নয় কি? কিন্তু বাস্তবিকই কি তোমরা তাই কর? তোমরা হয়ত ভাব যে তোমরা কর—কিন্তু এ তোমাদের একটি মহাভ্রম। ভাই, স্বামী বা স্ত্রীর কামপ্রবৃত্তিতে আহুতি দেওয়াই তার সুখবিধান করা নয় বা তার তৃপ্তিসাধন করা নয়—মোটেই তা নয়। তাই যদি একমাত্র সুখের নিদান হত, তাহলে জগৎজোড়া সব পরিবারই সুখী হতে পারত। কিন্তু তাই কি হয়েছে? জগতের সব পরিবারই কি সুখী?—না, হাজারে একটিও না। কেন তাদের সুখ নাই? কেননা, তারা জানে না কি করে পরস্পরকে সুখী করতে হয়। কি করে পরস্পরের কল্যাণ সাধন করা যায়, তারা তা জানে না। কাম-চরিতার্থ করাই তারা মনে করে সুখের চরম। এমনি করে পরস্পরের মোহকে নিবিড় করে তোলাই কি সুখ? কেউ কেউ আবার বলে ভালবাসার অর্থই হচ্ছে দুঃখের সঙ্গে রফা করে চলা, আর এ সম্বন্ধে যত ঔপন্যাসিক—ঐতিহাসিক, যত বাজে লোক—সবারই ঐ এক বুলি! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভালবাসায় এমন কি পাপ আছে যাতে দুঃখ আসবে?—কিছুই না। তাহলে তুমি যেমন করে ভালবাসাকে ব্যবহার কর, তার মাঝেই এমন কি গলদ রয়েছে, যাতে ভালবাসায় তোমার মাঝে দুঃখ নিয়ে আসছে।

বিধাতার বিধান এই, এ জগতে কোন মানুষের বা এ জগতের কোন জিনিসের প্রতি যার আসক্তি থাকবে, তাকেই দুঃখ পেতে হবে, হয় তার ভালবাসার জনকে ভগবান্ তার কাছ থেকে সরিয়ে নেবেন, নয় তাদের দু'জনার একজনকে মরতে হবে, নয়ত তাদের মাঝে একটা মনোমালিন্য ঘটবে। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। আনমনা হয়ে এ কথাগুলি শুনো না। এগুলো তোমার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে থাক—তোমার মনকে অনুপ্রাণিত করুক তারা। সাংসারিক কোন বিষয়ে মানুষ যখন আসক্ত হয়, যখনই কোন বস্তুকে কেবল সেই বস্তুর জন্যই সে ভালবাসতে আরম্ভ করে—তার মাঝেই তৃপ্তি খোঁজে—তখনই সে প্রতারিত হয়, সে কেবল ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ে। সংসারের জিনিসের প্রতি আসক্তি থাকলে কি সুখ মিলে? জগতের নিয়মই যে তা নয়। সংসারাসক্তির পরিণামে কেবল তোমার বুক ভেঙ্গে পড়বে মাত্র—আর কিছু হবে না! সর্ব্বশক্তিময়ী রৌপ্যমুদ্রাতে আস্থা রেখো না—আস্থা রেখো ভগবানের উপর। এটা-সেটাকে বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো ভগবান্‌কে বা আত্মাকে। সংসারানুরক্তির ফল দুঃখ, কেননা সংসারের আসক্তি একরকম পৌত্তলিকতা বৈ তো নয়। লোকে সুন্দর সুন্দর প্রতিমা তৈরি করে, সুন্দর সুন্দর পাষাণমূর্ত্তি গড়ে। এ সমস্ত দেহপিণ্ডও তেমনি প্রতিমার মত—তারা যেন ছবি বা পুতুল। তুমি শুধু ছবির খাতিরেই একটা ছবিকে ভালবাসছ, অথচ যার ছবি, তাকে অগ্রাহ্য করছ। এটা কি প্রতিমাপূজা নয়? মনে কর তোমার এক বন্ধুর একখানা ছবি তোমার কাছে রয়েছে,—তুমি সর্ব্বদা তাকে কাছে রাখছ, তাকে সোহাগ করছ, তাকে ভালবাসছ, তোমার সমস্ত মায়া-মমতা যেন ঐ ছবিটার উপরই ঢেলে দিচ্ছ—

এমন কি ছবিটাতে তুমি এত মজে গিয়েছ যে, যখন যার ছবি, সে তোমাব বাড়া এল, তখন তুমি তাকে গ্রাহ্যই করলে না—তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করলে যেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এ কাজটা কি তোমার ভাল হল? এর পরে কি আর তোমার বন্ধু ছবিটা তোমার কাছে রাখতে চাইবেন? না, না—ছবিটা তিনি তোমাকে দিয়েছিলেন তাঁকে স্মরণ রাখতে। ছবি পেয়ে তাঁকে ভুলে যাবে, এর জন্য তো ছবিখানা তোমাকে দেওয়া হয়নি। কাজেই অমন করে তাঁর পূজা করা ভাল হয়নি—ছবির খাতিরে ছবির পূজা করা হচ্ছে প্রতিমাপূজা। যাঁর ছবি, ছবির যিনি প্রভু, ছবির যিনি ঈশ্বর, তাঁকে তোমার ভালবাসা উচিত ছিল। তেমনি, এ জগতে যা কিছু দেখছ, সকলই ভগবানের ছবি, সব তাঁরই নিদর্শন। স্বামী আর স্ত্রীও এ জগতে ছবি নিয়েই মেতে যায়—তারা পূজা করে প্রতিমার, তারা গোলামি করে পুতুলের। তোমার বাইবেল বলছেন, তুমি প্রতিমা স্থাপন করো না, ভগবানের কোন মূর্ত্তি স্থাপন করে তাঁর পূজা করতে যেও না। মূর্ত্তিপূজা বলাতে এমন কথা বুঝায় না যে, খড়-মাটির মূর্ত্তিকে পূজা করতে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে, অর্থ এই যে, তা ছাড়াও জ্যান্ত পুতুল রয়েছে—সেই নকল পুতুলের খাতিরে তুমি আসলকে যেন ভুলো না—এই হচ্ছে তাৎপর্য্য।

ভারতবর্ষের কোন এক শ্মশানে একটা চিতার উপরে রাম একটা শিলালিপি দেখতে পেয়েছিলেন, তার ভাবার্থ অনেকটা এইরকম—"আমার পরাণপুতলি—আমার খোকা এখানে আছে। ভগবান্ তাকে নিয়েছেন—তা ভালই করেছেন; আমাদের মাঝে ছাড়াছাড়ি হওয়াই হয়ত প্রয়োজন ছিল।" কথাগুলো একটি মেয়ের লেখা।

ছেলেটিকে তিনি খুবই ভালবাস্তেন' অর্থাৎ ছেলেটির আসলের চেয়ে তার নকল নিয়ে তিনি মজে গিয়েছিলেন বেশী। যে এবসত্তার প্রতিমূর্তি ঐ শিশুটি, তাকে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, সুতরাং ভগবানের বিধানে ছেলেটিকে কেড়ে নেওয়াই ন্যায়সঙ্গত হল। এটা হল প্রকৃতির নিয়ম। ছবির যদি সদ্ব্যবহার তুমি কর, তাহলে ছবি তোমার কাছে রাখা হবে, কিন্তু একবার তাদের অসদ্ব্যবহার কর, দেখ্‌বে দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, ভয়, বিচ্ছেদ—সকলই এসে পড়েছে। ছবি আমরা রাখ্‌তে পারি কখন, যখন ছবির চেয়ে তার আসলকে আমরা ভালবাসি বেশী। ছবি রাখবার এই হল একমাত্র সর্ত। এ ভগবানের বিধান। এরই নাম ত্যাগ।

এমনি করে ঘরে ঘরে ত্যাগের মহিমা প্রচার করতে হবে।

কথাটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে বলা যাক্। ধর, এই যেন তুমি রয়েছ—একজন পুরুষ বা স্ত্রী, দেব বা দেবী, যাই হও না কেন; আর ঐ যেন রয়েছে তোমার ভালবাসার জিনিস। বল্‌তে পার, কিসের জন্য তুমি তাকে ভালবাস? তার কিসে তুমি আকৃষ্ট বা মুগ্ধ? একি তার শরীর, না চামড়া, না চোখ, না নাক, না কান?—নিশ্চয়ই এসব কিছু নয়। কবিদের চেয়ে একটু হিসাবী হয়ো, তাদের চেয়ে একটু যুক্তি মেনে চলো। বাস্তবিকই চোখ কান নাকে তুমি আকৃষ্ট হচ্ছ না। তা যদি তোমার প্রীতির কারণ হত—তাদের মাঝে বাস্তবিকই মনভুলান কিছু যদি থাকত, তাহলে দেহটার যখন মৃত্যু হতো তখনও তারা মনকে মুগ্ধ করতে পারত। মানুষটা মরলেও তার দেহের মোহে তুমি বাঁধা থাক্‌তে—কিন্তু তাতো তুমি থাক না। তাহলে আকর্ষণটা কিসের? কে এই মোহ সৃষ্টি করল?—দেহের মাঝে যে শক্তি, যে প্রাণ রয়েছে—দেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা বিরাজিত রয়েছেন, তিনি। সকলের

ভিতর হতেই তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন যিনি, তিনি ভগবান্। ভগবান্ রয়েছেন ভিতরে, আর এই বাহিরের দেহটা যেন তাঁর ছবি বা তাঁর পোষাক। মানুষটার চেয়ে পোষাকটার বেশী আদর করো না।—এই পোষাক পরে রয়েছেন যে অন্তর্নিহিত সত্তা, তিনিই লক্ষ্য। এখন স্থির হয়ে একথা একবার ভাব, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।

কিন্তু জগতে মানুষ যখন ভালবাস্‌তে আরম্ভ করে, তখন এই পোষাককেই তারা ভালবাস্‌তে থাকে, তাকেই তারা কামনা করে—কিন্তু এই পোষাকের ভিতর দিয়ে যিনি প্রকাশিত হচ্ছেন, পোষাকের বাড়া যে সেই অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তা—তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। এমন করে, প্রতিমাপূজার মত, আসলকে ভুলে, সত্যকে ভুলে, অন্তরকে ভুলে, বাইরের সাজ-সজ্জা বা পুতুলের পূজাতেই মানুষ মেতে যায় বেশী। এই জন্যই মানুষকে দুঃখভোগে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবতে হয়। এই ত জগতের হাল। ছাড়িয়ে ওঠ এই মোহকে তোমরা! প্রত্যেক স্বামী আর স্ত্রী ভগবান্‌কে পরস্পরের মাঝে দর্শন করুক—প্রাণের ঠাকুরকে তোমরা দেখ—তাঁকে তোমরা পূজা কর।

সকলই তোমার কাছে ব্রহ্মরূপে পরিণত হবে। স্ত্রী স্বামীর পক্ষে নরকের দ্বার না হয়ে এমন হবে যে, তার স্বচ্ছ প্রকৃতির ভিতর দিয়ে স্বামী তার মাঝে ভগবান্‌কে দেখতে পাবে। তেমনি স্বামীও স্ত্রীর কাছে নরকের দ্বারস্বরূপ না হয়ে তার ব্রহ্মানুভূতির স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ হবে।

স্বামী বা স্ত্রী তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে কি করে এই অনুভূতিতে—এই ব্রহ্মোপলব্ধিতে উন্নীত করবে? কি করে বৈদান্তিক পন্থায় তাদের সমস্ত শক্তি এক কেন্দ্রে সংহত হতে পারে? কেমন করে তারা তা করবে?

স্ত্রীকে যদি স্বামীর ত্রাণকর্ত্তা হতে হয়, তাহলে প্রথমতঃ স্বামীকে তার বাইরের কুসংস্পর্শ হতে বাঁচাতে হবে। পুরুষ যদি অবিবাহিত থাকে, তাহলে সাধারণতঃ তার নানা রকম প্রলোভনে পড়ার সম্ভাবনা আছে। সে যেন তখন কর্ণধারহীন তরণীর মত—সকল রকম ঝড়-ঝঞ্ঝার কৃপাপাত্র সে, এখন যে দিক্ থেকেই তারা বয়ে যাক্ না কেন। যতদিন পর্য্যন্ত ভাগবত-জ্ঞান মানুষের মাঝে না ফুটে ওঠে, অথচ সে অবিবাহিত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সব দিক্ থেকে সব রকম দোষের ছোঁয়াচ তার লাগ্‌তে পারে। এখন স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে, স্বামীকে এই সমস্ত ছোঁয়াচের হাত হতে রক্ষা করা। কিন্তু তার জায়গায় সমাজে কি হয়? সাধারণতঃ স্ত্রীরা তো স্বামীকে এসব আপদ-বিপদ হতে বাঁচায় না-ই, উপরন্তু তারা নিজেরাই স্বামীর কাঁধে বোঝা হয়ে চেপে বসে। এ কেমন, না থলিভরা টাকার বদলে কোম্পানীর কাগজ কেনার মত। সব রকম আপদ হতে স্বামী বেঁচে গেল বটে কিন্তু এই এক নূতনতর গোলামাগরি এসে এখন আর সকল আপদের শোধ তুলতে লাগ্‌ল। আর আর দোষের ভয় তার থাক্ বা না থাক্, এই এক দোষই এখন তার "গুণরাশিনাশী"।

ব্যাপারটা কেমন হল, না ঘোড়া যেমন মানুষের কাছে এসেছিল আপদের হাত এড়াতে, সেই রকম। তোমরা জান, এমন এক সময় ছিল যখন মানুষও জঙ্গলে বাস করত। তখন অবশ্য আজকালকার মত জঙ্গলে ঘোড়াও থাকত, হরিণও থাকত। একবার একটা হরিণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ঘোড়া হেরে যায়। হরিণ তার গায়ে শিং বসিয়ে দিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে ঘোড়া মানুষের কাছে এল সাহায্য ভিক্ষা করতে। মানুষ বল্‌ল, আচ্ছা, বেশ, আমি তোমাকে আলবৎ সাহায্য করব, আমার হাতে তীর-ধনুক আছে, তুমি আমাকে পিঠে তুলে

নাও—দেখ, আমি তোমার সকল শত্রু নিপাত কচ্ছি।" এই বলে মানুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বনে গিয়ে হরিণ মার্‌ল। ঘোড়ার তো খুব স্ফূর্ত্তি! ঘোড়া আর মানুষ, দুজনেই বিজয়ী বীরের মত ফিরে এল। তারপর ঘোড়া বাড়ী যেতে চাইল। মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে বল্‌ল— "তোমাকে শত শত ধন্যবাদ। তবে এখন আমাকে বিদায় দাও।" কিন্তু মানুষ তার উত্তরে বল্‌ল, "সে কি? তুমি যাবে কোথা? এখন না বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোমাকে দিয়ে কত কাজ হতে পারে, আর কি তোমায় ছাড়ি? তোমাকে আমার চাকর হতে হবে এখন, আমার জন্য খাট্‌তে হবে।" ঘোড়া বাঘ ভাল্লুক-হরিণের হাত হতে বাঁচল বটে, কিন্তু নিজের স্বাধীনতা সে হারাল। বাইরে তার যে জিত হল, তার ফলে যে দাসত্ব তার কপালে ঘটল, সেই গোলামিতে কিন্তু তার জয়ের আনন্দ পুষিয়ে গেল না!

মানুষেরও সেই দশা। বিবাহের পর বহু প্রলোভনের হাত হতে সে বাঁচে। কিন্তু এই যে এক নূতন প্রলোভন—স্ত্রীর সঙ্গে যে তার এই অভিনব দাসত্বের সম্বন্ধ, এ-ও ঠিক ঘোড়ার সঙ্গে মানুষেব সম্বন্ধেরই মত।

এখন স্ত্রী যে কি করে স্বামীর ত্রাণকর্ত্তা হবে? কতক উপদ্রবের দায় থেকে সে স্বামীকে নিষ্কৃতি দেয় বটে, মান্‌লাম, কাজটা সে ভালই করে। কিন্তু তার পরের কথাই হচ্ছে, স্বামীকে আবার সে গোলাম না বানিয়ে তোলে! স্ত্রীর যেমন কর্ত্তব্য হচ্ছে স্বামীকে দাসত্বে আবদ্ধ না করা, তেমনি স্বামীরও কর্ত্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীকে নিতান্ত পরাধীনা করে না তোলা। আসল গলদ তোমার ঘরের মাঝে—তোমার গৃহস্থালীতে। যে পর্য্যন্ত স্ত্রী স্বামীর প্রকৃত কল্যাণে আত্মনিয়োগ না কর্‌ছে, অথবা স্বামী স্ত্রীর যথার্থ হিতসাধন না কর্‌ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব।

শোন খৃষ্টান, শোন মুসলমান, শোন হিন্দু, বাস্তবিকই যদি জগতের দুঃখ সমূলে তোমরা দূর করতে চাও, বাস্তবিকই যদি মানুষের দৈন্য হতে মানুষকে বাঁচাতে চাও, তাহলে তোমাদের এই বিষযে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মানুষের যৌন-সম্বন্ধে যেন কোনও বিষ না ঢোকে—প্রত্যেক নর-নারীর হৃদযে এই সত্য গভীরভাবে মুদ্রিত করে দিতে হবে যে, তারা যেন স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষে খৃষ্টস্বরূপ হতে পারে—এই তাদের কর্ত্তব্য। আমাদের প্রত্যেকের এ দায় . খৃষ্টকে জীবনে মূর্ত্তি'ন্ত কর। প্রত্যেকের অবধারিত কর্তব্য। কেমন করে তা হবে? না, স্ত্রী যদি স্বামীকে গোলাম বানাতে না চায, আর স্বামী যদি স্ত্রীকে তার দাসী বানাতে না চায়। তোমার বন্ধন হতে সকলকে মুক্ত কর, তাহলে তুমি নিজেও মুক্ত হবে।

তোমার স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন কর, যেন তাতেই তোমরা ঠিক ঠিক উন্নতির পথেই চলতে পার—প্রকৃতির বিধানের অনুকূলে তোমাদের জীবন গঠিত হয। আর প্রকৃতির বিধান কি, না স্বাধীনতা—অবাধ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধন হতে মুক্ত কর, তুমিও তার বন্ধন হতে মুক্ত হবে। এর অর্থ কি? এর অর্থ কি এই যে আলেকজাণ্ডারের গর্ডিযান্ গ্রন্থি (Gordian knot) ছেদনের মত তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক রহিত করতে হবে? তার সঙ্গে কোন কারবারই থাকবে না, এই কি ত্যাগের অর্থ? তাহলে পৃথিবীশুদ্ধ সব পুরুষকে আপন খুসীমত চরে বেড়াতে দেওয়া যাবে, আর সব স্ত্রীকেও তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে,—না? আমরা বলি, না—তা করতে হবে কেন? অমন করে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না- ও হচ্ছে বন্ধন বা দাসত্বেরই নামান্তর। তোমার জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে "বন্ধনমুক্ত" করার অর্থ তোমার নশ্বর দেহের উপর তার আস্থা জন্মাতে না দিয়ে

তোমার অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তার উপর তার নিশ্চল প্রত্যয় জাগিয়ে দেওয়া। যখন তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসে, বা তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস, তখন বাস্তবিক তুমি তার অন্তরের ভগবান্‌কেই ভালবাস, আর সেও তোমার অন্তরের ঠাকুরটিকেই পূজা করে। তোমরা ত সবাই বল যে প্রভু যিশুখৃষ্টে তোমাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু রাম বলেন তেমনি অগাধ বিশ্বাস তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের উপরও থাকা উচিত। তাই রাম বার বার বলছেন তোমরা পরস্পরের দেহপিণ্ডকে বিশ্বাস করো না—পরস্পরের অন্তর্নিহিত ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও তোমরা। এই যে বাইরে দেখতে পাচ্ছ হাড় মাস আর চামড়া—এ যেন পর্দার মত, তোমাদের সত্যপূতদৃষ্টিতে এ আবরণ স্বচ্ছ হযে যাক্, আর সেই আবরণকে অতিক্রম করে তাব অতীত যে সচ্চিদানন্দময় সত্তা—তাকেই তোমরা দেখ—তাকেই তোমরা অনুভব কর।

একটি পাখী এসে যেন গাছের কচি একটা ডালে গিয়ে বসল, মুহূর্তের জন্য ডালটা দুলে উঠল, কিন্তু পাখীটা তাতে কোন ভয় না পেয়ে মনের আনন্দে গান গেযে উঠল—কেননা সে জানে তার পাখা আছে। আমরাও ঠিক এই পাখীর মত হব। ডালটা উপর হতে নীচে নাম্‌ছে উ'ছে, কিন্তু পাখীর তাতে কোন ভয় নাই, যদিও সে ডালের উপর বসে রযেছে—তবু সে যেন এখনও পাখার উপরেই ভর করে রযেছে—এইটুকু সে জানে। সে জানে ডাল তার ভরসা নয়—ভরসা তার পাখা।

তেমনি তুমি যেভাবেই যেখানে থাকনা কেন, তোমার স্ত্রী-পুত্র কন্যার সঙ্গে তোমার যেমন অনুরাগের সম্বন্ধই থাক না কেন, ওটাকেই তুমি শুধু ধরে থেকো না - তোমার মন শুধু ওই নিয়েই পড়ে থাকে না যেন। মনটি ভগবানে সমর্পণ কর, তোমার অন্তরস্থিত ভগবৎসত্তার সঙ্গে তুমি যুক্ত থাক। এই হচ্ছে খাঁটি পথ। যেমন নিজের জীবনকে তুমি এই

ভাবে চালাবে, তেমনি তোমাব স্ত্রী-পুত্র কন্যাকেও এইভাবে চল্‌তে শেখাবে , তাহলেই তুমিও যেমন তাদের বন্ধন হতে মুক্ত থাকবে, তেমনি তারাও তোমাব বাঁধন এড়িয়ে যেতে পারবে। অধীনতা চাই না—চাই উন্মুক্ত স্বাধীন প্রাণ! এমনি করে জগতের প্রত্যেকেই স্বাধীন হতে পারে।

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

বিবাহিত জীবনে কি আত্মজ্ঞান লাভ করবার আশা করা যেতে পারে? কিছুদিন পূর্ব্বে রামকে ঠিক এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা কবা হয়েছিল, আর তিনি তার সম্পূর্ণ উত্তরও দিয়েছিলেন। আজ সোজাসুজি সেই কথা না তুলে রাম তারই আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করবেন।

কিন্তু এখনকার মত প্রশ্নটা হচ্ছে এই – স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন নিয়ে যে ঘর কর্‌ছে, অর্থাৎ সোজা কথায় সংসারের একজন সাধারণ লোক কি কখনো সত্যলাভ করতে পারে, আত্মজ্ঞান পেতে পাবে?—একটা দিক হতেই আমরা প্রশ্নটার আলোচনা করব।

বেদান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, তববারিতে কি শত্রু বধ করা যায়? যদি বল "হা", তবে "গৃহী কি আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে?"—এই প্রশ্নেব উত্তরেও আমরা বল্‌ব, হাঁ, পারে বৈকি? তবে কিনা সবই নির্ভর করছে তলোয়ারটা আমরা কেমন করে ঘোরাব বা সংসারের সম্বন্ধগুলি কেমন করে ব্যবহার কর্‌ব তার ওপর। একই তলোযাব দিযে নিজেকে যেমন মেরে ফেলা যায়, তেমনি বাইরের আঘাত হতেও নিজকে বাঁচানো যায়, সংসার-সম্বন্ধের অপব্যবহারেও তেমনি আধ্যাত্মিক উন্নতিব পথ রুদ্ধ করে মানুষ যেমন আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করতে পারে, আবার তেমনি তাদের যথাযথ ব্যবহারে আত্মোন্নতির ফলে ভগবানেব সাক্ষাৎলাভ পর্য্যন্তও করতে পারে। তাই বল্‌ছিলাম যে, দুটা প্রশ্নেরই এক উত্তর।

আমাদের যে নিত্যকার চলাফেরা, আচার ব্যবহার—তা থেকেও আমরা যথেষ্ট আমোদ ও সোয়াস্তি আদায় করতে পারি, ঠিক ঠিক তাদের ব্যবহার করতে জান্‌লে, ওতেও আমাদের উপকার হয়, জীবন-যাত্রা সুমার্জিত, সভ্যোচিত হয়। কিন্তু অপব্যবহারে তারাই আবার ভ্রান্তি, বিরক্তি বা ব্যাধির নিদান হয়ে উঠতে পারে।

তেমনি হচ্ছে আমাদের সংসার-সম্বন্ধ—তারা আমাদের উন্নত করতেও পারে, আবার জাহান্নামের পথেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

সক্রেটিসের (Socrates) এমন একটি স্ত্রী ছিলেন যে, জগতে কেউ তেমন সহধর্ম্মিণীর কামনা কববে না। একদিন সক্রেটিস গভীর চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে অভ্যাসমত যা-ইচ্ছে-তাই বলে তাঁকে গালাগালি দিতে লাগলেন। সক্রেটিসকে একটা কিছু করতে হবে, তাই তাঁর স্ত্রীর কথা তাঁর শোনা দরকাব, সেই সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যই এই গালাগালি আর অপমান-নির্য্যাতনের বহর। কিন্তু সক্রেটিসের ধ্যান তাতে ভাঙ্গল না—একটা প্রশ্নেব মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সেটাব মাঝে ডুবে থাকা ছিল তাঁর স্বভাব।

এদিক দিয়ে স্ত্রীর গর্জ্জনের আর বিরাম নাই, কিন্তু সক্রেটিসের কাণে কিছুই ঢুকছে না। অবশেষে রাগের ভরে সাধ্বী এক গামলা ময়লা জল এনে স্বামীর মাথায় ঢেলে দিলেন। কিন্তু তাতেও কি সক্রেটিসের রাগ হল? তিনি শুধু একটু মৃদু হেসে বল্‌লেন—"লোকে যে বলে গর্জ্জনে বর্ষণ, তা ঠিকই তো!"

স্ত্রীর গর্জ্জন নূতন নব, কিন্তু বর্ষণ সব দিন হত না, আজ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষণ নেমে এসেছে। কথা কয়টি বলেই সক্রেটিস্ আবার ধ্যানমগ্ন হলেন।

এ হতে এই বুঝতে পারি, চিত্তজয়ের সামর্থ্যসম্বন্ধে কারুর সন্দিহান হওয়ার প্রয়োজন নাই। সক্রেটিস্ মানুষ, একজন মানুষে যদি অমন করে চিত্তজয করে থাকে, তবে আর আর মানুষে তা পারবে না কেন? আজও কি জগতে এমন লোক দেখা যায় না, যারা চিত্তকে দমিয়ে রেখেছে, অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে? এমন লোক শত শত আছে, চেষ্টা করলে তুমিও তাদের মত হতে পার।

সত্যলাভ করা, ভগবানের সঙ্গে তোমার ঐক্য অনুভব করা, বিশ্বের সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা—এক কথায় আত্মোন্নতির সকল পথই সরল হতে পারে—সংসারকে বজায় রেখেও, যদি তা করতে তোমার বাস্তবিক ইচ্ছা থাকে।

মানুষ যখন চলাফেরা করে, তখন একটামাত্র দেহকে সে সঙ্গে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু হাত-পা, নাক-কাণ এ গুলোকে তো সে রেখে যায় না—তারাও যে তার সঙ্গে চলে। তাই বেদান্ত বল্‌ছেন সত্যের সন্ধান যখন তুমি পাও, তখন তোমার আধখানি শুধু সেই সত্যলোকে না নিয়ে গিয়ে, সবখানিই তো তুমি নিতে পার; তোমার স্ত্রী-পুত্রকেও তো তুমি সঙ্গে নিতে পার—তারা তো তোমারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এমনি করে, ভগবানের সঙ্গে তোমার ঐক্যবোধ হবার পূর্ব্বে, তোমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে তোমার একাত্মতাবোধটুকু আগে প্রতিষ্ঠিত হোক্। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গেও যে একাত্ম হতে পারেনি, বিশ্বের সকলের সঙ্গে সে একাত্ম হবে কি করে?

ভারতে এমন লোক আছে, যারা রোমান ক্যাথলিকদের মতই ভগবানের উপাসনা করে; তারা মূর্ত্তি ও প্রতীকের ভিতর দিয়ে ভগবানের পূজা করে। ভারতবর্ষে রাম বা কৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজা করা হয়—তাঁরাই হলেন খৃষ্ট। একবার এক বৃদ্ধা একজন সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন যে, এখন তার ঘরবাড়ী, পরিবার-পরিজন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করা যুক্তিযুক্ত হবে কি-না? পরিবারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, আত্মীয়-স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করে সেই পরম রমণীয় বৃন্দাবনে যাওয়ার কি তাঁর সময় হয়নি এখনও?

বৃদ্ধার সঙ্গে ছিল পৌত্র। সাধু উত্তর করলেন, "আচ্ছা, দেখ দেখি মা, তোমার ঐ নাতির চোখ দিয়ে ও কে তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে? এ কোন্ শক্তি, কোন্ সত্তা, কোন্ পরম দেবতা—যিনি ঐ শিশুর প্রতিলোমকূপ হ'তে অনিমেষ সহস্রলোচনে তোমার দিকে চেয়ে আছেন?" বৃদ্ধা উত্তর করলেন, "ওই তো ভগবান্! এ ক্ষুদ্র শিশুর মাঝে পাপ নাই, কোন প্রলোভন নাই—সে পবিত্র, নির্মল। যখন কাঁদে, তখন সে যে ভগবানেরই পরাণ আকুল করা কান্না!" তখন সাধু বল্লেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাবে মা, তখন সেখানেও ত শ্রীকৃষ্ণের একটি বিগ্রহকেই তোমার আশ্রয় করতে হবে—তাঁকেই তোমার ভগবান্‌জ্ঞানে উপাসনা করতে হবে। কিন্তু আমি বলি, বৃন্দাবনে যে গোপালবিগ্রহ তুমি দেখ্‌তে পাবে, এই শিশুটিই কি তোমার সেই গোপাল হতে পারে না?" কথাটা শুনে বৃদ্ধা একটু চমকিত হলেন; তারপর ভেবে চিন্তে তাঁর মনে হল হাঁ, তাইতো, এই শিশুটিকে গোপাল মনে করে এর ভিতর দিয়েই তো তিনি ভগবান্‌কে ডাকতে পারেন,—কেননা ওই যে ভগবানই শিশুর চোখে চোখ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—তিনিই ওর কাণে কাণ দিয়ে আমার কথা শুনছেন—ওর অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে বেড়ে উঠ্‌ছেন—ওর শক্তিতে শক্তি ঢেলে দিয়ে ফুটে উঠছেন—তার শরীরের প্রতি রোমকূপে যে ভগবান্ বিকশিত হচ্ছেন—এই যে আমার সাক্ষাৎ গোপাল! সাধুর উপদেশ পেয়ে, সে-ছেলেকে

তার আর নাতি বলে দেখা হল না বা কোন রকমে তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক পাতান চল্‌ল না—কিন্তু সংসারের বা পরিবারের সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়ে তাকে ভগবান্ বলে তার দেখ্‌তে হল, তার সঙ্গে তার একমাত্র সম্পর্ক হল ভগবানের সম্পর্ক। এই হল ত্যাগের পথ।

ত্যাগেব অর্থ শুধু কঠোরতাই নয়। সমস্ত বস্তুকে শুদ্ধ করে তোলার নামই হচ্ছে ত্যাগ। ঐ মেয়েটির পক্ষে সেই শিশুটীকে ত্যাগ করা অর্থ তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছেদ করা নয়, কিন্তু তাকেই ভগবদ্‌বিগ্রহ বলে ভাবনা করাই হল ত্যাগ। সকলের মাঝে ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত দেখা—এই হল বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্য। বেদান্ত তোমাকে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে যেমন ব্যবহারিক সম্পর্ক তুমি গড়ে তুলেছ, সেইটি ছেড়ে দাও—স্ত্রীকে শুধু স্ত্রী বলে ভেবো না, তার মাঝে যে পরমাত্মা রয়েছেন, যে ভগবান্ রয়েছেন, তাঁকে উপলব্ধি কর। শত্রুকে আর শত্রু বলে ভেবো না, কিন্তু তার মাঝে ভগবান্‌কে দেখতে শেখ,—বন্ধুকে বন্ধু বলে জেনো না, কিন্তু ভগবান্‌কে তার মধ্যে জান। স্বার্থে গড়া ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছেদন করে সকলের মাঝে ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত কর—'ঘট ঘট বিরাজে রাম'—এই তোমার অনুভূতি হোক। হিন্দুশাস্ত্র প্রতি স্বামী-স্ত্রীকে এই অনুভূতিতে সিদ্ধ হতে উপদেশ দিচ্ছেন—এই হল শাস্ত্রমর্ম।

স্বার্থ দিয়ে গড়া যে ব্যক্তিগত বন্ধন, তাকে তোমরা ত্যাগ কর, সবার মাঝে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে শেখ—এই হল বিবাহিত নর-নারীর উপর হিন্দুশাস্ত্রের অনুজ্ঞা। রাম সংসারে থাকতে এই অনুশাসন পালন করেছিলেন, তাতে পতি-পত্নীকে এইভাবে সাধন করতে হত।—স্ত্রীকে খুব প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করতে হত। তারপর রাম যখন

গভীর ধ্যানে মগ্ন, দেহ-মনের সত্তা ছাড়িয়ে ব্রহ্মোপলব্ধিতে তিনি যখন আত্মহারা—সেই অমৃতের ধারা তিনি আকণ্ঠ পান করছেন—ঠিক সেই সময় তাঁর স্ত্রী এসে তোমাদের মাঝে রোমান্ ক্যাথলিকেরা যেমন করে প্রতিমাপূজা করে, তেমনি করে তিনি রামের পূজা করতেন,—অপলক দৃষ্টিতে তিনি রামেব দিকে তাকিয়ে থাকতেন, কিন্তু তাঁর দেহকে তিনি দেখতেন না। এদিকে রাম তখন জড়ের বন্ধন কাটিয়ে দেহের সত্তা ছাড়িয়ে ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সুতরাং স্ত্রীও তখন রামের স্থানে শুধু ভগবান্‌কেই দেখ্‌তে পেতেন। রামের দেহ হতে একটু দূরে বসে, তিনি রামের ভ্রূমধ্যে দুটি চক্ষু নিবদ্ধ করতেন। প্রথমতঃ খুব উচ্চ ধারণা করা তাঁব পক্ষে সম্ভব নয় বলে, রামের দেহকেই তিনি ভাবনা করতেন—এমনি কবে প্রণব জপ করতে করতে রামের দেহটাই তাঁর কাছে এত জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ত যে তখন তাঁর মনে আর অন্য কোন চিন্তা থাকৃত না—এমন কি তাঁর নিজের দেহজ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেযে যেত। তখন তাঁর উপলব্ধি হত, যেন রামের দেহে তিনি ডুবে গিয়েছেন—তাঁর দেহে তিনি রূপান্তরিত হযে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আত্মার তখন কি হত? না, সে অবস্থায় তাঁর আত্মাকে তিনি রামের আত্মারূপেই অনুভব করতেন। তিনি দেখতেন এ তো রাম কেবল ধ্যানে ডুবে যান নি—এ যে তিনি ভগবানের মাঝে আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন। রামের ধ্যান যে তাঁরই ধ্যান—তিনিই যে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এক—তিনিই সমস্ত বিশ্বের আত্মা!

এমনি করে তিনি রামকে যেমন অধ্যাত্মসাধনায় সাহায্য করতেন, রামও তেমনি অধ্যাত্মজীবনে তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু রামকে তিনি সাহায্য করতেন কেমন করে? স্ত্রী যখন স্বামীকে ভগবান্‌রূপে

ভাবনা করেন, তাঁর চিন্তার প্রবাহ যখন স্বামীতে ভগবত্তাস্বরূপ আরোপ করে, তখন তাঁর শক্তি, তাঁর ধ্যানবল কি বাস্তবিকই স্বামীকে ভগবান্ করে তুলতে পারে না? তা দিয়ে স্বরূপলাভের পথে স্বামীকে তার সাহায্য করা হয় না কি? নিশ্চয়ই হয়।

খৃষ্টান বৈজ্ঞানিকেরা তো সবাই নিজের অভিজ্ঞতা হতে জানতে পেরেছেন যে, আমরা একটী লোককে যেমন খুসী তেমন চিন্তা করাতে পারি। এই ধর, স্ত্রী এমনি অধ্যাত্ম-চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করছেন— তিনি সর্ব্বদাই যেন ভাবনা করছেন যে তাঁর স্বামী ভগবান্। তাঁর সেই চিন্তাতেই তাঁর স্বামী ভগবানের সঙ্গে নিজের ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হবেন। তেমনি আবার স্বামী যখন ভগবানের সঙ্গে আপনাকে এক বলে জানেন, তখন তিনিও স্ত্রীর অধ্যাত্মসাধনার সহাযতা করেন। আহা কি মধুর এই অধ্যাত্মযোগ কি পরমাশ্চয্য এই মিলন! স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাহায্য করছেন আবার সাহায্য পাচ্ছেন। এই আধ্যাত্মিক মিলনের উপর যে বিবাহ প্রতিষ্ঠিত, জগতে তার আর তুলনা নাই। শুধু আকার-প্রকার, মুখচোখের গড়ন, আর সৌন্দর্য্যের উপর যে বিবাহের প্রতিষ্ঠা, তার পরিণামে শুধুই ক্ষতি শুধুই অশান্তি। তাতে কেবল বুকভাঙ্গা দুঃখ আর উদ্বেগ। কিন্তু অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের উপর যে বিবাহের প্রতিষ্ঠা— যাতে মুখচোখের রঙের হিসাব নাই—শরীরের গড়নের চমক নাই— কিন্তু যে যোগ অন্তরের ব্রহ্মবস্তুকে আবিষ্কার করতে পারে—সেই যোগই চিরন্তন এবং পরম নিরাপদ। সেই যোগের ফলেই জীবনে শান্তি আর আনন্দ আস্তে পারে।

একবার একটী ভদ্রমহিলা কোনও সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার স্বামী কয়েকমাস আগে মারা গিয়েছেন—কি করে তাঁর উদ্ধার হবে?" সেই সময় আর একটী ভদ্রলোক এসে বল্লেন, তাঁর একমাত্র

সন্তানের মৃত্যু হওয়াতে তার বিরহ সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্ম-হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। আর একজন এসে বল্লেন, সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছে, তাই তাঁরও আর বাঁচতে সাধ নাই। এখন বল দেখি সাধু এব কি জবাব দেবেন ?

মহিলাটী একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন—কি করে স্বামীকে বাঁচাবেন, তাই ছিল তাঁর চিন্তা। সাধু বল্লেন, "মা, অমন করে তুমি মুস্ড়ে পড়ো না, তোমার স্বামীকে তুমি রক্ষা করতে পারবে—আমার কথা তুমি শোন। যখনি তোমার মনে হতাশ ভাব আস্‌বে বা স্বামীর কথা হৃদয়ে জাগবে, তখনি তুমি স্থির আসনে বসে, চোখ বুজে তোমাব স্বামীর চেহারাটা মনেব সাম্‌নে ধবো, জানই তো মা, আমরা যাদের ভালবাসি, ইচ্ছা করলেই তাদেব মুখ মনে আনতে পারি। তারপব তোমার স্বামীর ছবিটী যখন তোমার মনে ভেসে উঠ্‌বে, তখন কেঁদো না বা দুঃখ কবো না—কান্নাকাটী করে চোখের জলের বাঁধন দিয়ে তোমার স্বামীকে শুধু মাটির সঙ্গে বেঁধে বাখবে মা, তার সংসারবন্ধন কঠিন কবে তুল্‌বে শুধু—তাতে তার ক্ষতিই হবে। কিন্তু তার উন্নতির পথে কাঁটা দিয়ে তাকে নামিযে আনাটা কি তোমার ভাল হবে ? তোমার স্বামীকে তো অন্তবকম করে তুমি ভাবনা করতে পার—এমনও তো মনে করতে পাব যে, তিনি যেন বেঁচেই রয়েছেন, চোখ বুজে তাঁব স্পষ্ট যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ—সেটা অতি জীবন্ত। এমনি করে স্বামীকে যখন সাম্‌নে পেলে, তখন মনে করো যেন তিনি ভগবান্! অবিরাম তাঁকে বলো—সমস্ত মন-প্রাণ এক করে এই চিন্তা তাঁর অভিমুখে প্রেরণ করো—"তুমি ভগবান্—তুমি ভগবান্—সকলের প্রভু তুমি। এই যে তোমার রূপ, এই যে ছায়া, এই যে কায়া—এর মাঝ দিয়ে ভগবান্‌ই আমার কাছে প্রকাশ হচ্ছেন।"—টেলিফোঁ-যন্ত্রের কাছে গিয়ে

তাতে যখন আমরা কান দিই, তখন কিছু শুনতে পাই, কিন্তু আমরা জানি, সে শব্দটা ঐ লোহার যন্ত্রটা থেকে আসে নি, কিন্তু যন্ত্রের অপর প্রান্তে আমাদের যে বন্ধু রয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই সেটা আস্‌ছে। তেমনি তোমার মৃত স্বামীর চেহারা যখন দেখতে পাবে, তখন মনে করো যেন—এমন কি তখন উপলব্ধি করো যে ভগবান্ তাঁর পেছনে রয়েছেন; আর তোমার স্বামীকে তুমি অনবরত বলো—"তুমিই ভগবান্, তুমিই ভগবান্।"—এমনি করে তাঁকে তুমি উদ্ধার করতে পারবে।

যারা মরে গিয়েছে তাদেরও যদি উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের যে সব বন্ধু বেঁচে আছে, ঠিক তেমনি করে তাদেরও কি আমরা উন্নত করতে পারি না? এই ভাব আশ্রয় করে স্বামী-স্ত্রী যদি জীবন-যাপন করতে পারে, তাহলে তাদের মিলন অধ্যাত্ম-মিলন হয়—তারা পরস্পরের কাছে আনন্দের খনি হয়ে ওঠে। তোমরা হয়ত বলবে, সব জায়গাতেই তো স্বামী স্ত্রীর সুখ বাড়াতে চায়, যাতে স্ত্রীর সুখ হয় স্বামী তাই করে। অজ্ঞান বলে লোকে ভাবে, তারা বুঝি ঠিক পথটা ধরতে পেরেছে—তাই তারা মনে করে, পরস্পরের রুচির যোগান যদি দিতে পারা গেল, তবেই বুঝি সব হল।

কিন্তু তাতো নয়। এমনি করে তুমি যে শুধু নিজেকে নয়—পরকে শুদ্ধ ডোবাও। প্রকৃতির আইন হচ্ছে, আমার যাতে বাস্তবিক সুখ হয়, তাতে তোমারও সুখ হবে—আমি এগুলে তুমিও এগুবে—আমার উন্নতিতে তোমারও উন্নতি হবে—আমি যদি অসুখে পড়ি তাহলে সবাই অসুখে পড়বে, আমি সুস্থ থাক্‌লে সবাই সুস্থ থাক্‌বে। ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া তুল্যবল এবং বিপরীত। আমি যদি বাস্তবিকই তোমাকে সুখী করে থাকি, তাহলে আমিও সুখী হব। মানুষ ভাবে, মন জুগিয়ে চল্‌তে পারলেই বুঝি সুখ মিলে। কিন্তু তা কক্ষনো হয় না—তার ফল হয় শুধু

ঘৃণা আর বুকফাটা দুঃখ। দুই পক্ষই এতে কষ্ট পায়—দুয়েরই প্রাণে শান্তি থাকে না, মন ভেঙ্গে যায়—ভয় আর আশঙ্কা এসে তাদের ঘিরে ফেলে।

এই ভয় আর বিরক্তি কেন হয় জান? শুধু কি করে অপরকে বাস্তবিক সুখী করা যায়, তার মর্ম না বুঝতে পারার দরুণ। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে যদি সুখী করতে হয়, তাহলে এই ক্ষুদ্র আমিত্বকে কিন্তু আগে তুলে ধরতে হবে। যাকে ভালবাস, তার অন্তরের অন্তরটুকু পর্যন্ত চিনে নিতে হবে। তার মাঝে অসীম শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে—পরস্পরকে তোমাদের জ্ঞান বিতরণ করতে হবে। তাহলে তোমাদের সঙ্গ হবে চিরমধুর—আর পরিণামে তোমরা সুখীও হতে পারবে। প্রিয়তমের যদি তুমি বাস্তবিকই হিতাকাঙ্ক্ষী হও, তাহলে যাতে তার যথার্থ আনন্দ হবে এমন বস্তুই তাকে দিও।—সে কি? না, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি। তোমার প্রিয়তমকে তাই তুমি দাও। প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য তার স্ত্রীকে সুশিক্ষিত করে তোলা। যে স্বামী স্ত্রীর আচার্য্য নয়, বা যে স্ত্রী হতে স্বামী উন্নত ও সুমার্জিত না হয়—যার কাছ থেকে অধ্যাত্মসম্পদ্ না মিলে—তাদের জীবন কখনও সুখের হবে না। এক্ষেত্রে স্ত্রীও যেমন অপরাধী, স্বামীও তেমনি। স্বামীর কর্তব্য যে, স্ত্রীর পক্ষে গৃহকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় করে তোলেন।—এমনি হলে তবে দম্পতির জীবন মধুময় হবে।

খৃষ্টজননীর চিরকুমারীত্ব সম্বন্ধে খৃষ্টীয় সমাজে যে একটা মতবাদ রয়েছে, তার সম্বন্ধে রামের অভিমত এই যে, খৃষ্টজননী মেরী পুণ্যশীলা, পূত-চরিত্রা, ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন—তিনি ঈশ্বরজানিতা সাধ্বী—উপলব্ধির উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিতা—এমন কি ভগবানের সঙ্গে তাঁর একাত্মতাবোধ জন্মেছিল। জ্যাকেরিয়াস্ (Zacharius)—জোশেফ (Joseph) মেরীর

সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অবশেষে তাঁর পতিত্ব স্বীকার করেন—না হয় জ্যাকেরিয়াসের কথা না বলে যোশেফের নামই করি—সেই যোশেফও মেরীর মতন সাধুপুরুষ ছিলেন, তিনিও ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তরুণ, উভয়েরই ভরা যৌবন। তারপর এমন হল যে মেরী এবং তাঁর স্বামী যেন আপন সত্তা হারিয়ে ফেললেন—তাঁদের যেন দেহাত্মবোধ রইল না, এমনি একটা আত্মবিস্মৃতির অবস্থায় গর্ভাধান হল। তারপর এমন একটা কিছু যে ঘটেছে, সে কথাও যেন মেরী ভুলে গেলেন।

অনেক সময় রাত্রে মা ছেলেকে তুলে হয়ত দুধ খাইয়েছেন ; তার পর-দিন তাকে যখন রাত্রে দুধ খাওয়ানোর কথা জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সে হয়ত উত্তর দিল, "না কই, আমাকে তো দুধ দাওনি—দিদিকে দিয়েছ বুঝি?" আসলে কিন্তু সে-ই দুধ খেয়েছে, কিন্তু সে কথা এখন আর তার মনে নাই। ব্যাপার মূলে এই যে, রাত্রে দুধ খাওয়ার সময় ছেলেটী সাধারণ চেতনার বাইরে ছিল—তার মন অন্য জায়গায় হয়ত আটকা ছিল—ঘুমের মাঝে যারা বেড়িয়ে বেড়ায়, অনেকটা তাদেরই মত। তারা তো ঘুমের ঘোরেই অনেক সময় কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে, কিন্তু সকাল বেলা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আর রাত্রের কথা কিছুই বল্‌তে পারে না। তেমনি রামের মতে খৃষ্টের কুমারীসম্ভব হওয়া ব্যাপারটারও ব্যাখ্যা এই যে, জ্যাকেরিয়াস্ বা যোশেফই মেরীর গর্ভাধান করেন, কিন্তু সে সময় তাঁরা উভয়েই সাধারণ চেতনার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন—তাঁরা ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় গেলে আর এই ক্ষুদ্র দেহের কথা মনে থাকে না—শরীরটাই যেন তখন ভাগবতবিগ্রহ হয়ে যায়। এমনি সময়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন। কাজেই পরে গর্ভের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুই বলতে পারেন নি।

খৃষ্টানেরা বলেন যে, পরমাত্মা তাঁর গর্ভাধান করেন। এ কথার অর্থ এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে মেরী যুক্ত ছিলেন, তাঁর সত্তাতে তিনি লীন ছিলেন, আর তাঁর দ্বারা আবিষ্ট হয়ে তিনি অন্তসত্ত্বা হন। এইজন্য খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। জন্মের নৈসর্গিক বিধান পূর্ব্বেও যেমন ছিল, খৃষ্টের জন্মের সময়ও তেমনি ছিল, কিন্তু তবু আমরা বল্‌তে পারি বৈ কি যে, খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। তাই ত রাম বলেন, জগতের পক্ষে এই হচ্ছে একমাত্র পথ—যে পথে চল্‌লে এই মর্ত্ত্যধামে শত শত খৃষ্টের উদয় হতে পারে। যদি সন্তানকে মিল্টন-সেক্সপীয়রের মত কবি কর্‌তে চাও, বা খৃষ্টের মত মহা-পুরুষ কর্‌তে চাও—যদি এমন চাও যে, সে শুধু তোমার বংশকে নয়, বসুধাকে সে পবিত্র করুক—তবে আগে চিত্তশুদ্ধি কর—আত্মাকে অবসাদিত করো না। রাম বলেন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এমন ভাবে জীবন যাপন কর, যাতে ক্ষুদ্র স্বার্থ হতে বহু উর্দ্ধে তোমার প্রতিষ্ঠা হয়—সমস্ত জীবন ধরে যেন সেই সর্ব্বময় মহাপুরুষের সঙ্গেই তুমি যোগযুক্ত হতে পার। ভগবানের ভাব, তাঁর তেজ, তাঁর ধ্যান যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে এমনি করে আবিষ্ট করে রাখ্‌তে পারে, তবে তোমাদের সন্তান-সন্ততিরাও খৃষ্টের মত হবে। খৃষ্টকে জন্ম দেওয়া যে তোমাদেরই ইচ্ছাধীন!

গৃহ হবে প্রেমের কেন্দ্র, প্রেমের সীমা নয়। কিন্তু মানুষ ঘরের মাঝেই প্রেমের গণ্ডী রচে, তার বাইরে আর ভালবাসাকে ছড়াতে দেয় না। রাম বলেন, গৃহ আর গৃহলক্ষ্মীই হল তোমার প্রেমের কেন্দ্র—প্রেমের কিরণ সেখান হতেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তোমার প্রেম তো শুধু ঘরের মাঝেই আট্‌কা থাক্‌বে না—তোমার গৃহিণীকে বেষ্টন করেই তো প্রেমের সীমানা রচনা করা চল্‌বে না! যদি তাই কর, তা হলে তোমার স্বার্থচিন্তাদ্বারা তোমার গৃহিণীকে তুমি নামিয়ে

আনলে, তোমার নিজেকে তুমি অবনত করলে—দুজনার কাজই তুমি পণ্ড করে দিলে। স্ত্রী তোমার প্রেমের গুরু, কিন্তু সেই প্রেমকে বিশুদ্ধ করে নিতে হবে—তাকে বিশ্বপ্রেমে পরিণত করে, নাম-রূপ-বর্ণ-কায়ার ভালবাসা হতে ভগবৎপ্রেমে উন্নীত করতে হবে। তখন যদি তুমি সবার দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়াও—সেই প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে নদী-পর্ব্বত, তরু-লতার দিকে তাকাও, তাহলে স্পষ্টই তুমি দেখতে পাবে—বিশ্বের সঙ্গে তুমি এক।

সমস্ত জগতের সঙ্গে কি করে তোমার সম্বন্ধ নিরূপণ করতে হবে তার শিক্ষা পাবে তোমার স্ত্রীর কাছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সে তোমার সুর বেঁধে দেবে। এখন রাম তোমাদের গুটিকতক অধ্যাত্মজগতের নিয়ম বলে দেবে। সংসারের সমস্ত প্রেমের মূলে ঐ অধ্যাত্ম-বিধান। রাম যদি তার কথা তোমাদের না-ও বলতেন, তবুও তোমাদের অনুভূতির মাঝে চিরকাল ধরে সে বিধান জাগ্রত থাকত এবং থাকবেও। কিন্তু আগে থেকে বলে দিলে তোমরা হুঁসিয়ার হতে পার বটে। রাস্তা দিয়ে জুড়ি হাঁকিয়ে চলবার সময় কেউ যদি হঠাৎ কিছুর উপর পড়ে গিয়ে গাড়ীখানা উলটিয়ে ফেলে, তাহলে হয়ত সে খুব জখম হয়েও পড়তে পারে,—কেননা সে তো আগে থেকে জানে না, কি বিপদ্ তার হবে। কিন্তু আগে থেকেই যদি তাকে বেশ খেয়াল করে চলতে বলে দেওয়া হত, তাহলে সে সতর্ক হত—অমন করে তাকে গাড়ীচাপা পড়তে হত না। তেমনি সংসার করতে গেলেও অনেক ঝুঁকি, অনেক বিপদ, বিফলতা, ব্যথা আসবেই। কিন্তু এই সব নৈরাশ্যের বোঝা কখন এসে ঘাড়ে চাপে? রাম তারই কথা তোমাকে বলে দেবেন—আর তা জানলে আর তোমাকে হোঁচট খেতে হবে না। পথ খুবই সোজা—যতদূর সম্ভব বাধা এড়িয়ে সহজেই চলতে পারা যায়; কেননা গণিতের

বিধানের মত এখানকার বিধানে মোটেই নড়চড় নেই কারণ এটা একটা বাস্তব জগতের সত্য। যে কোনও নর-নারী যদি কোনও দেহকে বা রূপকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ করে, তাহলে সেই জড়বস্তুকে ভোগ করা কিছুকালের জন্যই তার পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু জড়ের রূপ যদি একবার হৃদয়ে গাঁথা পড়ে, একবার তার সত্তাকে গ্রাস করে, তাহলে সে বস্তুটা আর সেখানে থাকে না—এই হল বিধান। একে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নাই। এমন কোনও শক্তি জগতে নাই, ঐ বিধানকে যে লঙ্ঘন করে যেতে পারে। সুদূর অতীত হতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কেউ এর একটী ব্যতিক্রম খুঁজে বের করতে পারবে না।

কোনও বাইরের জিনিষের সঙ্গে মনকে বাঁধ—কোনও নাম বা ব্যক্তিবিশেষকে আঁকড়ে ধরে—কোনও বড়লোকের ওপর নিজের ভরটুকু ছেড়ে দাও, তাকেই সব বলে মনে কর—দেখবে তোমার আশ্রয়যষ্টি খুলে পড়েছে—তুমি মাটীতে লুটছ। একটা টেবিলের ওপর যদি ভর দিয়া দাঁড়াও, আর টেবিলটা যদি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কি হয় ?—তুমি তখন চিৎপাত হয়ে পড়ে যাও। ওতে কি শিক্ষা হয় ? এ হতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, স্থূল জড়-বস্তুর ওপর আমাদের প্রেম সমর্পণ করা চল্‌বে না—অথচ এই স্থূল জড় অবলম্বন না হলে আমাদের হৃদয়ে প্রেম জাগেও না। এই জড়ের ভিতর দিয়েই না আমরা ভালবাস্‌তে শিখি ;—কিন্তু একবার প্রেমের শিক্ষা পেলে পর, প্রকৃতির নিয়মেই স্থূলবস্তুতে আর প্রেমকে বেঁধে রাখতে পারা যায় না। প্রেমকে সাম্‌নে চল্‌তে হবে – জড়ের অন্তরালে যে ভগবান্ রয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তাকে পৌছাতে হবে। স্ত্রীর কাছে যে প্রেমের শিক্ষা তুমি পেলে, তার অন্তরের ভগবানের কাছে যদি সে প্রেম তুমি নিবেদন করে না দাও—তবে

ধিক্ তোমাকে! ভগবান্‌কে সেই প্রেম হতে বঞ্চিত করলে তোমার অনন্ত ক্ষয়—অনন্ত দুঃখ। স্বামী আর স্ত্রী একযোগে গড়ে উঠ্‌বে, স্ত্রী যেমন আমাদের প্রেমের শিক্ষা দেবেন, তেমনি সেই প্রেম শুধু দেহপিণ্ডের মাঝে আবদ্ধ না রেখে প্রতিজনার মাঝে - বিশ্বের বুকে তাকে বিলিয়ে দিতে হবে।

ভোগমত্ততার জমীনে অধ্যাত্ম-বীজের আবাদ করলে ফসল ফল্‌বে না। স্বামীই হোক্, আর স্ত্রীই হোক্—মাটীর দেহের মাঝে যদি প্রেমের বীজ বোন, তাহলে মাটীতে বীজ বুনে মাটী দিয়েই যেন তাকে ঢেকে দিলে। কিন্তু কোন্ প্রেম খাঁটী জান? বীজ মরে গিয়ে যার অঙ্কুর মাটী ঠেলে মুক্ত আকাশতলে আপনাকে সার্থক কর্‌বার অবসর পায়, সে-ই। তাই বলি, স্বামী বা স্ত্রীর মাঝে 'বীজ বোন; তারপর মাটীর মাঝে যে বীজ বুনলে, সে ধ্বংস হয়ে যাক—তার প্রাণ নিয়ে অঙ্কুর বেরিয়ে যেন তাতে প্রেমের ফল ফলায়। সংসারাসক্তির কথা যতদূর জানি, তার সবটাই নিস্ফল। তবে এ-ও জানি, যে বীজটা বুন্‌লে, সেটা মর্‌ল—কিন্তু সেই বীজই আবার ভগবানের সঙ্গে তোমায় মিলিয়ে দেবে। মানুষকে যে ভালবাস্‌তে না পেরেছে, সে ভগবান্‌কে পাবে কি করে?—এ বড় খাঁটী কথা।

ধর্মের সঙ্গে সাংসারিক ভালবাসার কোনো যোগই হতে পারে না, এই কথাটাই সাধারণে প্রচার করা হয়। কিন্তু রাম বল্‌ছেন, যোগ আছে বই কি?—ভালবাসাকে ঠিক পথে চালাতে পারলে তবেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ভগবান্ প্রেমেই ধরা দেন—তিনিই যে প্রেমস্বরূপ। স্বামীর লক্ষ্য থাক্‌বে, তাদের দাম্পত্যবন্ধনকে যেন সে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—শুধু টাকা রোজগার করা আর সংসার-সম্বন্ধকে যেমন-তেমন করাই তার আদর্শ নয়। যে-বস্তু

আগে সুখের নিদান ছিল, তাকেই দুঃখের মূল করে তোলা কেন? যা নিমিত্ত মাত্র, তাকেই চরম করে তুলো না। টাকা পয়সা যদি তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করে, শীত থেকে তোমাকে রক্ষা করে, তোমাকে যেখানে কেউ অকারণ উত্যক্ত না কর্‌তে পারে এমন একটা আশ্রয় জুটিয়ে দেয়—তাহলেই তো যথেষ্ট হল। এখন বল দেখি, খাওয়াদাওয়া আর কাপড়চোপড়ের জন্য তোমাদের কত টাকারই বা দরকার? আসল কথাটা কি জান, শীতবাদ আপনা হইতে আসে না, আমরাই তাকে ডেকে আনি, তেমনি রোগ-তাপকেও আমরাই খুঁজে খুঁজে বের করে ঘরে তুলি। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কাপড়-চোপর অবশ্যই গায়ে দিতে হবে, কিন্তু সেটাতো শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ না হয় এই জন্যই। সে কাপড় মোটা হতে পারে, কম দামের হতে পারে, সে যে বেশী টাকারই হবে, এমন কোন কথা নাই। আজকাল যে সব বড় বড জমকাল বাড়ী তৈরী হচ্ছে, তাতে না থেকে ছোট ছোট বাড়ীতেও আমরা থাকতে পারি। বন্যপশুর উপদ্রব থেকে বা অপর লোকের অন্যায় অত্যাচার থেকে নিজেকে বাঁচবার জন্য সাদাসিধে রকমের ছোট ছোট ঘর-দরজাই তো যথেষ্ট—বাড়ীঘর যে জাঁকালোই কর্‌তে হবে তার মানে কি?

বাডীঘরের জাঁকজমক হল মানুষের এক পুরুষার্থ, পোষাকে জাঁক দ্বিতীয় পুরুষার্থ, আর ভোজনবিলাস হল তৃতীয় পুরুষার্থ, কেবল পুরুষার্থ, নয়, এরা হচ্ছে সাধ্য-সাধন দুই-ই। কিন্তু তবুও জগতের ইতিহাসে এমন লোকের কথাও পাওয়া যায়, যারা কুঁড়ে ঘরে থাকৃত, মোটা খেত, মোটা পরৃত—অথচ তারাই ছিল বিশ্ববিজয়ী বীর।

তোমরা হয়ত প্লেটোর কথা শুনেছ; তিনি থাক্‌তেন একটা পিপের ভিতর। তাই ছিল তাঁর পরম আশ্রয়; সংসার হতে বিরক্ত হয়ে তার মাঝে গিয়ে তিনি ঢুকতেন।

একবার ভেবে দেখ দেখি, এমন গরীবের হালে যাঁরা থাকতেন, জগতের জন্য তাঁরা কত করে গিয়েছেন। ষ্ট্যাফোর্ড সহরে সেক্সপীযরের যে বাড়ীটি ছিল, তাকে কোনরকমেই লোভনীয় বলা চলে না। জীবনের প্রথম ভাগটা তিনি নেহাৎ গরীবই ছিলেন—কেবল শেষ বয়সে অবস্থা যা একটু সচ্ছল হয়েছিল। নইলে প্রথম যুগে রঙ্গালয়ের দর্শকের ঘোড়ার লাগাম ধরে, তাদের পরিচর্য্যা করে তাঁর দিন কেটেছে।

নিউটনও গরীব ছিলেন। বই কিনবার বা লোককে দেবার জন্য যখন তাঁর হাতে টাকা থাকৃত না, তখন তিনি দুঃখ করৃতেন—কিন্তু তা ছাড়া আর কখনো কেউ তাঁকে গরীব হওয়ার জন্য দুঃখ করৃতে দেখে নি। তবেই দেখ, যে সমস্ত লোক মোটা খেয়েছেন মোটা পরেছেন, তাঁরাই না জগতের জন্য এতখানি করে গিয়েছেন! প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দুরা বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাক্‌তেন। অথচ এঁরাই জগৎকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন-শাস্ত্র উপহার দিয়েছেন—যার মাঝে মুক্তির আব প্রেমের বার্ত্তা রয়েছে, সেই বেদান্ত প্রচার করে গিয়েছেন।

বেদান্তের চরমানুভূতি পাওয়ার পরেও রাম গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। সে সময় তিনি তাঁর ধর্মপত্নীকে বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। রামের পত্নী ফুল তুলে আনতেন, ধূপ-দীপ সাজাতেন আর আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যেতেন। পূজা শেষ হয়ে গেল পর রামের প্রতি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন এবং এমনিভাবে

ওঁকার উচ্চারণ করতে করতে রামের মাঝে আত্মদর্শন করতেন; আবার নিজের মাঝে রামের অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করতেন। এমনি করে তাঁদের পরস্পরের অনুভূতির বিনিময় হত। তাঁরা পরস্পর একে অপরের মাঝে আত্মদর্শন করতেন। এই আত্মদর্শনের সাধনা ছিল সদাচার। একেই যথার্থ সহধর্ম বলা যায়। এমনি করে রাম স্ত্রীকে অনুভূতির উচ্চশিখরে নিয়ে যেতেন; কিছুকাল পর্য্যন্ত এই ভাবধারা সমানে প্রবাহিত থাকত। কাম-বাসনা বা ক্ষুদ্রভাব কোথায় উড়ে গেল, দেহের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটল। এমনি করে দুজনাই মুক্ত হলেন। লৌকিক পতি-পত্নীসম্বন্ধের চিন্তামাত্রও যেখানে ছিল না, সেখানে এই সম্বন্ধের আভাস কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? তিনিও রামকে তাঁর স্বামী বলে ভাবতেন না, রামও তাঁকে স্ত্রী বলে মনে করতেন না।

* * *

ভারতবর্ষের দাম্পত্য-জীবনের মূল সুরটি স্বামী রামতীর্থের বক্তৃতায় অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত বক্তৃতা হইতে বিবাহিত জীবনের আদর্শ এবং কর্ত্তব্যসম্পর্কে আমরা বহু উপদেশ নিজ নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়া শান্তি এবং আনন্দলাভের অধিকারী হইতে পারি।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্তানের মুখদর্শন না করা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর জীবনের সার্থকতাই সম্পন্ন হয় না। সৃষ্টিলীলা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে এবং চলিবেও, কিন্তু আদর্শের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আচারভ্রষ্ট অধিকাংশ নব-নারীকে বিবাহের সুমহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুতই বলিতে হইবে। প্রজাসৃষ্টির জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরম তপস্যা করার বিধানের কথা কাহারও কি আজ স্মরণ আছে? সন্তানকামনাকে কি আর কেহ এখন পবিত্র ব্রত বলিয়া মনে করে? শ্রীমদ্ভাগবতের পৃশ্নি-সুতপার তপস্যার কথা কি আর এখন কেহ বিশ্বাস করিবে? তাঁহারা যে ভগবান্‌কে পুত্র-রূপে কামনা করিয়া ভগবানেরই জনক জননী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন! পৃশ্নি-সুতপার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ যখন তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া "ব্রিয়তাং বরঃ"—এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা উভয়ে ভগবান্‌কেই পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার সদৃশ অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্বয়ংই পৃশ্নিগর্ভ আশ্রয় করিয়া সন্তানরূপে ভক্তমনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। যথা ঃ—

অদৃষ্টান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৪১

ভগবান্‌কে পুত্ররূপে কামনার দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের আরও বহুস্থলে বর্ণিত আছে। পৃশ্নি-সুতপার ন্যায় কশ্যপ অদিতি ও নাভি-মেরুদেবীও

ভগবান্‌কে পুত্ররূপে কামনা করিয়াছিলেন। "অত্রিরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত"—অত্রিও ভগবান্‌কে পুত্ররূপে কামনা করিয়াছিলেন। ভগবানের মত পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা সমাজের অধিকাংশ সতীনারীরই তখন কাম্য ছিল। তপস্যা ব্যতীত ভগবান্‌কে সন্তানরূপে লাভ করা যায় না। এই জন্যই সন্তানকামনায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পূর্ব্বে ব্রতধারণ করিতেন। পুত্রই যদি লাভ করিতে হয়, তবে ভগবান্‌কেই পুত্ররূপে চাই—ইহাই ছিল নারীজীবনের সার্থক কামনা। বর্ত্তমানে সন্তান-কামনা করিয়া স্বামী-স্ত্রীকে আব পূর্ব্বের মত ব্রত-নিযম পালন করিতে দেখা যায় কি? সন্তানের জনক-জননী হওয়া যে কতখানি গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করা, তাহা কি আর এখন কেহ ভাবিয়া দেখে? কাহারও অন্তরে আর সেই দৈবীভাব নাই—তপস্যা নাই। সন্তানকামনা করিতে গিযা তপস্যাগ্রহণ না করিয়াছেন এইরূপ নর-নারী আদর্শ যুগে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায। পবিত্রভাবে ভাবিত হইয়া স্বামী শুদ্ধ-আচারপরায়ণা স্ত্রীর গর্ভে যে বীজ সঞ্চার করিতেন, তাহার ফলে আদর্শ দেবসন্তানের মুখসন্দর্শন করিয়া পিতা-মাতা উভয়েরই আনন্দ এবং তৃপ্তি হইত।

সুসন্তান-কামনায় ব্রতপালন শাস্ত্রীয় বিধি। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ ব্রতের কথা উল্লিখিত আছে। যথা—

শ্রীকশ্যপ উবাচ

এতন্মে ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ।
যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্ ॥ ৮।১৬।২৪

—কশ্যপ কহিলেন,—"হে ভদ্রে! আমি ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অপত্যকামী জনগণের, যে হরিতোষণব্রত আমার নিকট বলিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি।"

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্।
অর্চ্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়াম্বিতঃ॥ ৮।১৬।২৫

—"অপত্যকামী ব্যক্তি ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিবস দুগ্ধপায়ী ও পরমভক্তিযুক্ত হইয়া কমললোচন শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।"

অপত্যকামী দম্পতি কি ভাবে ব্রতধারণ করিবেন এবং সেই ব্রতের নিয়ম কি, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ১৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আমরা প্রত্যেক নর নারীকে এই অধ্যায়টি মনোনিবেশসহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অনলসভাবে **পয়োব্রতের** কঠোর নিয়ম পালন করায় স্বয়ং শ্রীহরি অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বয়াচ্চিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ।
স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্ গোপ্তাস্মি মারীচতপস্যধিষ্ঠিতঃ॥
৮।১৭।১৮

—"হে দেবি, পুত্রগণের রক্ষার নিমিত্ত তুমি পয়োব্রতের দ্বারা আমার যথোচিত অর্চ্চনা ও স্তবস্তুতি করিয়াছ; অতএব আমি কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় অংশে **তোমার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া** তোমার পুত্র দেবগণকে রক্ষা করিব।"

উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্।
মাঞ্চ ভাবয়তী পত্যাবেবং রূপমবস্থিতম্॥ ৮।১৭।১৯

—"হে ভদ্রে! **পতির মধ্যে এইরূপে আমি অবস্থিত আছি—** ইহা ভাবনা করতঃ তুমি নিষ্পাপ পতি প্রজাপতি কশ্যপের ভজনা কর।"

অব্যর্থজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ প্রজাপতি কশ্যপ সমাধিযোগে নিজের প্রতি অদিতির স্নেহ অনুবর্ত্তন এবং নিজের মধ্যে যে শ্রীহরির অংশ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

সোঽদিত্যাং বীর্য্যমাধত্ত তপসা চিরসংভৃতম্।
সমাহিতমনা রাজন্ দারুণ্যগ্নিং যথাঽনিলঃ॥ ৮।১৭।২৩

—"হে মহারাজা পরীক্ষিৎ! অনন্তর বায়ু যেমন ঘর্ষণ দ্বারা কাষ্ঠে পূর্ব্বসিদ্ধ অগ্নিই সঞ্চার বা আধান করে, সেইরূপ প্রজাপতি কশ্যপ সমাহিতচিত্ত হইয়া তপস্যার দ্বারা বহুকাল যাবৎ যাহা হৃদয়ে ধারণ করিতেছিলেন, সেই অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্রূপ বীর্য্য অদিতির গর্ভে আধান করিলেন।"

এই অদিতি পূর্ব্বজন্মে পৃশ্নি নামে অভিহিতা হইতেন, ভগবান্ সেই জন্মেও তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

পুংসবন অর্থাৎ পুত্রপ্রদ এই **বৈষ্ণব-ব্রতের** বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায়ে আরও সুন্দরভাবে আছে। অধ্যায়শেষে বলা হইয়াছে—"এই বৈষ্ণব-ব্রত আচরণ করিলে কুমারী সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন পতি লাভ করে, বিধবা স্ত্রী পাপশূন্যগতি অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করে, মৃতবৎসা রমণী এই ব্রতপ্রসাদে জীববৎসা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালিনী রমণীও এই ব্রতের ফলে সৌভাগ্যশালিনী ধনেশ্বরী হয় ও উত্তম রূপ লাভ করে, আর রূপহীনা নারী মনোহর রূপ লাভ করে এবং এই ব্রতের মাহাত্ম্যে রোগিণী রোগমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদিসহ সমর্থদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে ইহা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণের অসীম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, আর হোমাবসানে অগ্নি, লক্ষ্মী ও শ্রীহরি পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমস্ত কাম্যবস্তু প্রদান করিয়া থাকেন।"

আজ পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম-জগতে যত সব মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহাদের পিতামাতার জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। দেবভাবে ভাবিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ঘরে দেবতারাই আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রত্যেকের জনক-জননীই ছিলেন আদর্শ তপস্বী-তপস্বিনী। বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায় তাঁহারা দেবসন্তানের জনক-জননী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। এই ত গেল অধ্যাত্ম জগতের কথা। রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ইতিহাসেও যাঁহারা মনীষী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের জনক-জননীর অনুসন্ধান করিলেও আমরা তাহাদের চরিত্রে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পাই। সমাজে আদর্শ মনীষী বলিয়া যাঁহারা সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই আদর্শ পিতা-মাতা লাভ করিবার সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সামাজিক অধঃপতনের দিনে আজ আমাদের প্রত্যেককেই এই কথাগুলি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। দায়িত্ববিহীন, সংযম-নিষ্ঠা-ব্রতহীন জীবনকে পশুজীবন বলিতে কোন বাধা নাই। পশুর ঘরে পশুই জন্ম নিয়া থাকে। আজ সমাজের অবস্থিতি হইয়াছে পাশবিক স্তরে—তাই সমাজে যথার্থ মানুষের এবং দেবতার আবির্ভাব না হইয়া কেবল পশুবৃত্তিসম্পন্ন জীবেরই সৃষ্টি হইতেছে। চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতাই এখন মানুষের আদর্শগুণ বলিয়া অভিহিত। এক মুহূর্ত স্থির হইয়া বসিয়া থাকার ক্ষমতা কাহারও নাই। মর্কটচাঞ্চল্যই বর্তমান সভ্যতার বিশেষ অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের এই নিদারুণ দুরবস্থা দেখিয়াই মহাপুরুষগণ গৃহীদের কর্তব্য, দায়িত্ব এবং সাধন-পথের কথা নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। সমাজে থাকিয়া সামাজিক জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রেরণা থাকিলেই শুধু চলিবে না, সঙ্গে

সঙ্গে কর্তব্য এবং দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া তদনুসারে জীবন-গঠনেও ব্রতী হইতে হইবে। সংযম এবং শক্তির অভাবই বর্তমান সামাজিক অবনতির মূল কারণ।

ভগবানের আসন আজ অনেক গৃহস্থ-পরিবার হইতেই বিলুপ্ত। আহার, নিদ্রা, মৈথুন—ঐ ত্রিবিধ কর্মের গতানুগতিক ধারাতেই এখন পারিবারিক জীবন পরিচালিত। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া দেব-পূজার্থে পুষ্পচয়নের সময় এখন চা-পানের মাহেন্দ্র-ক্ষণে পরিগণিত, সংসারে ইন্দ্রিয়ভোগের কর্ম সবই ঠিক আছে, কিন্তু ভগবানের বা ঠাকুর-দেবতার উপরই যত আক্রোশ এবং বিরাগ। ভগবান্ যেন ভোগপথের কণ্টকস্বরূপ। সত্যই কি তিনি ভোগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন? তাহার অমৃত উপদেশ হইল—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥—গীতা ৬।১৭

ভগবান্ শুধু বলিয়াছেন, মাত্রা ঠিক রাখিয়া ভোগ করিতে। সংযম-তপস্যায় জীবন গঠিত না হইলে, এই মাত্রাবোধটুকু অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানটুকু মানুষ হারাইয়া ফেলে। মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য-জীবন পশু-জীবনের স্তরেই নামিয়া আসে।

প্রাচীন যুগে গৃহস্থ পরিবারে ভগবানের আসন ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। ভগবদারাধনা করিয়া, ভগবান্‌কে গৃহের মালিক বা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক পরিবারই ছিল তখন সুখী। সুখে-সম্পদে, ঐশ্বর্য্যে তখন গার্হস্থ্যজীবন ছিল ভরপুর। ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া গৃহীর ভোগসামর্থ্য যেমন তখন অক্ষুণ্ণই থাকিত, তেমনি ভগবৎ-প্রসাদী শক্তিলাভ করিয়া পশুজীবনের স্তর হইতে আরও বহুগুণ ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত দিব্যজীবনলাভেও তাঁহারা হইতেন ধন্য। ভগবদারাধনায়

মানুষের সর্বনাশ না হইয়া সর্বতোভাবে উন্নতিই সাধিত হইয়া থাকে। জীবনে একমাত্র ভোগই যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদেরও ভগবান্‌কে স্বীকার করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন কারণ নাই। সমাজ পরিচালক ঋষিগণ কালজয়ী দৃষ্টিদ্বারা ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে, আজীবন সুস্থদেহে সুখভোগ করিতে হইলেও ইন্দ্রিয়-সংযম, নিয়ম-নীতি-পালনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ভোগসামর্থ্য যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, এই ভাবেই ঋষিগণ সমাজের নর-নারীকে সংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এই সুন্দর মনোরম জগৎ হইতে দৃষ্টি অন্ধ করিয়া বিষাদগ্রস্ত মন লইয়া বসিয়া থাকিতে তাঁহারা উপদেশ প্রদান করেন নাই। ভগবদ্ধ্যান-ধারণা বা পূজা-অচনাদিতে চিত্তের সাম্যভাব পরিবর্দ্ধিত হয়। চিত্তের স্থৈর্য্যেই প্রকৃত শান্তি, আর চিত্তের চাঞ্চল্যেই যত অশান্তি। বিক্ষোভ চিত্তের একাগ্রতাশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই জন্যই চিত্তকে সাম্যে স্থিত রাখিবার জন্য সমাজকল্যাণকামী ঋষিগণ এই বিধি-নিয়ম প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। চিত্ত স্থির এবং একাগ্র করিতে হইলে, সম্মুখে সত্য-শিব-সুন্দর ভগবান্‌কে আদর্শরূপে ধরিতেই হইবে। ভগবদ্ধ্যানে মানুষের শক্তি ক্ষয় না হইয়া বরঞ্চ আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনন্তশক্তির আধার যিনি, তাঁহার ধ্যান-ধারণা করিয়া কি জাতি শক্তিহীন হইতে পারে? দিব্যশক্তিলাভে মানুষ তখন সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী হইতে পারে। সুস্থ সবল পারিবারিক জীবনের পক্ষে ভগবদ্ধ্যান-ধারণার সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

মানুষ দিবসের অধিকাংশ সময় কর্মের উত্তেজনা লইয়াই অতিবাহিত করে। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে প্রশান্তির পথে ফিরাইয়া আনিতে হইলে

প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারেই একটি উপাসনা-গৃহ বা মন্দির থাকা প্রয়োজন। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে সেখানে সকলকে সমবেত হইতে হইবে। উপাসনা বা ধ্যান-ধারণার দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ সহজেই বিদূরিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারে ভগবদুপাসনার সুব্যবস্থা রাখিতে গৃহস্থমাত্রের প্রতিই নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক উপাসনা তাঁহার আশ্রিত-শিষ্য-ভক্ত-সন্তানের একটি অবশ্য-করণীয় বিধি।

এই জগৎ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্‌দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সকাল সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনার দ্বারা সর্বশক্তিমানের নিকট হইতে আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনার যে কি উপকারিতা, তাহা আর বলিবার নয়। প্রার্থনার দ্বারা চিত্তমল সহজে বিদূরিত হয়, প্রাণে এক অপূর্ব শান্তি এবং আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 'জীবন-বেদ' গ্রন্থে প্রার্থনার মহান্ উপকারিতা এবং অপার্থিব শক্তির কথা বর্ণিত আছে। তিনি নিজ জীবনে একমাত্র প্রার্থনার দ্বারাই সম্পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্ব-মুখের উক্তি, যথা :—

"আমার জীবনবেদের প্রথম কথা—প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধকশ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর' 'প্রার্থনা কর'—এই ভাব, এই শব্দ ভিতরে উত্থিত হইল। কেন, কিসের জন্য প্রার্থনা করিব, তাহাও সম্যক্‌রূপে বুঝিতাম না, তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। কেন প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিল না। কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন

লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহ হইল না। প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা কর, বাঁচিবে, চরিত্র ভাল হইবে; যাহা কিছু অভাব, পাইবে, এই কথাই জীবনের পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে, উত্তরদিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ, প্রলোভনকে ভয়ানক সঙ্কল্পের মূর্ত্তি দেখাইতাম। প্রার্থনা করিব বলিলেই সব ভয় পাইত। সকল বিষয়েই সহায় ছিল এই প্রার্থনা। স্থখের প্রত্যাশা করিতাম প্রার্থনার নিকট। সাহায্য পাইতে হইলে প্রার্থনারই আশ্রয় লইতাম। 'সবে ধন নীলমণি' যেমন কথায় বলে, প্রার্থনা আমার তেমনি ছিল।"

কলির দুর্বল জীবের পক্ষে প্রার্থনা একটি শক্তিশালী অমৃতরসায়ন। আর কিছু করিতে না পারিলেও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার আশ্রিত শিষ্য-ভক্তদের আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিবার কথা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য-ভক্ত-পরিবারে সকাল-সন্ধ্যায় ইষ্টমন্ত্র জপ ও ধ্যান-ধারণার পর সর্বশেষে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি গীত হয়।

দাসের প্রার্থনা পূর্ণ কর দয়াময়।
তব পদে মতি রতি সদা যেন রয়॥
তব পথ হতে যেন দূরে নাহি যাই।
যখন যে ভাবে থাকি তব গুণ গাই॥
নিবারিতে নারি প্রভু কুমতি প্রবল।
কৃপানাথ কৃপা করে দাও হৃদে বল॥
পরনিন্দা পরচর্চ্চা হতে রাখ দূরে।
তব গুণগাথা যেন প্রাণে সদা স্ফুরে॥

অহঙ্কার অভিমান কিছুতে না যায়।
করুণায় দাস করে রাখ রাঙ্গা পায়॥
বিষয়ে সহজে হয় আসক্তি যেমন।
তেমতি তোমাতে যেন লিপ্ত থাকে মন॥
লোকমান্য নাহি চাই কর দীন হীন।
দীননাথ এস হৃদে ফুরাইল দিন॥
অসংখ্য আমার ক্রটী করি সংশোধন।
কৃতার্থ করহে দাসে এই আকিঞ্চন॥

পূর্বে প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারেই ঠাকুরসেবার সুব্যবস্থা ছিল। জায়গা-জমি-সম্পত্তি গৃহদেবতার নামেই উৎসর্গীকৃত ছিল। প্রত্যেক সংসারের প্রকৃত মালিক ছিলেন ইষ্টদেবতা। গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেই ছিল ইষ্টদেবতার আশ্রিত। দেবতার প্রসাদ দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। প্রত্যেক পরিবারে ইষ্টদেবতার পূজারাধনার ব্যবস্থা থাকায় পরিবারের প্রত্যেকের ভিতরেই একটি দেবভাব স্বাভাবিকভাবে লীলায়িত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত। দেবতার কোন না কোন সেবার কার্য্যে গৃহস্থ-পরিবারের প্রত্যেকেরই অংশ থাকিত। অতি প্রত্যুষে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দেবপূজার জন্য পুষ্পচয়নে বহির্গত হইত। ফুলের সাজি তাহাদের হস্তে কি এক অপূর্ব দিব্য শোভারই না বিকাশ করিত। আজ গৃহস্থ-পরিবার হইতে সকল সুনিয়ম-প্রণালী নিশ্চিহ্নতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবতার মন্দির আজ আবর্জ্জনাস্তূপে পরিপূর্ণ। গৃহস্থের বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যায় আর সেই আরতি-বন্দনা স্তোত্রের অপূর্ব সুরলহরী শ্রবণ করিতে পাওয়া যায় না। অধঃপতিত হিন্দুজাতির পুনরুত্থানের পক্ষে সকাল-সন্ধ্যায়

শ্রীগুরু-ইষ্টপূজা এবং স্তবস্তুতির নিয়মকে এইজন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর অবশ্য-করণীয় অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 'মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেরই মসজিদ, গীর্জ্জা আছে। তাহারা এখনও নিষ্ঠার সহিত উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকে। আর আজ হিন্দুজাতির কি অধঃপতন! কি ব্যক্তিগত উপাসনা, কি সঙ্ঘবদ্ধ উপাসনা, কোনও উপাসনার দিকে আজ তাহাদের লক্ষ্য নাই। দেবমন্দির, পূজাপার্বণ আজ হিন্দুর কাছে উপেক্ষা অবজ্ঞার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা হিন্দুজাতির মন হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই হিন্দু আজ সর্ববিষয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। পারিবারিক পূজা, ধ্যান-ধারণা বা উপাসনাকে আর আমাদের এখন উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাঁচিতে হইলে ঋষিমুনিদের ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার সহিত আবার গ্রহণ করিতে হইবে। দেবশক্তিকে উদ্বোধন করিবে কে?—আদর্শ গৃহস্থ। আজ সমাজে সেই আদর্শগৃহীরই প্রয়োজন।

গৃহীর পক্ষে সংসারত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই, কেননা সংসার-ধর্ম পালন করিয়াও জীবনে অভীষ্ট লাভ করা যায়; কিন্তু ইহাও আদর্শ নহে যে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আর যেন কোন গত্যন্তর নাই, এই বলিয়া সংসারাশ্রমের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে, স্বাধ্যায়দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া পরিবারাদি প্রতিপালনের সমুদয় ভার যোগ্য পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া পুত্র-দার-ধনাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহী মধ্যস্থভাবে গৃহেই অবস্থান করিবে। ভোগাসক্ত গৃহীর—এই শাস্ত্রীয় উপদেশও ভুলিলে চলিবে না। সংসার-ত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা যেমন গৃহীদের পক্ষে পরম

আনন্দের কথা, নিরাসক্তভাবে সংসারে অবস্থানের বিধিও তেমনি গভীর চিন্তার এবং অনুধাবনের বিষয়। যথাযথভাবে সংসারাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যে অভিজ্ঞ গৃহস্থের মনে অনাসক্তি বা নির্বেদ উপস্থিত হয়, তাঁহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বনের স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য নহে কি? অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি এই নির্বেদ বা নির্লিপ্ততার ভাবকে বড় ভাল চক্ষে দেখেন না। পাশ্চাত্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা চাহেন সমগ্র জীবন ভরিয়া এই সংসারের জন্যই খাটিয়া মরিতে। ভারতীয় আদর্শ তাহা নহে। বিশিষ্ট আশ্রমে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকা দারুণ ভোগাসক্তিরই লক্ষণ। এইরূপ আসক্তিকে আমাদের হিন্দুশাস্ত্র নিন্দার্হ বলিয়া গিয়াছেন।

গৃহস্থের পরিবার দেব-দেবীরই লীলাভূমি। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে একটি সম্বন্ধ অবলম্বনে ব্রত গ্রহণ করিয়া সাধনা করার কথা অনেক মহাপুরুষই বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে হরগৌরীব্রত, অথবা পতিব্রত এবং স্ত্রীব্রত পালনের উপদেশ স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরও দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ, স্বামী স্ত্রীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা দর্শন করিবেন। শিব এই পবিত্র দাম্পত্য-ব্রত সাধনপূর্বক মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া যোগীদিগেরও গুরু হইয়াছিলেন। যশোদা কৃষ্ণের মুখশ্রীতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া গোপাল বলিয়া আত্মহারা হইতেন। এই গোপাল প্রত্যেক গৃহেই বিরাজমান থাকিয়া এখনও লীলাখেলা করিতেছেন। বালক-বালিকার মুখশ্রীতে এবং ক্রীড়াতে ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে বাৎসল্যভাব উপস্থিত হয়। গৃহীর যত রকমের সম্বন্ধ আছে, সবই ভগবানের সঙ্গে স্থাপিত সম্বন্ধ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই পঞ্চভাবের সাধনা ভগবানেরই

বিভিন্ন প্রতিমূর্তির সঙ্গে স্থাপন করিয়া সংসারধর্ম্ম পরমানন্দের সহিতই প্রতিপালন করা যায়। হিন্দুর পরিবাব বিচিত্রভাবে ভগবদারাধনাই করিয়া চলিযাছে। কিন্তু আজ আর সেই ভাব নাই। মূলে ভাব না থাকিলে সবই পণ্ড হইয়া যায়, আবার ভাবেই সব ভাবের পরিণতি বা পরিপুষ্টি ঘটে।

অন্যান্য আশ্রম হইতে গার্হস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্য হইল—সেবাধর্মে। গৃহস্থ-পবিবারের শ্রেষ্ঠ আদর্শই হইল সেবা। দেবসেবা, অতিথিসেবা গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য। সেবাধর্মবিহীন গৃহীর গার্হস্থ্যাশ্রমে বাসের কোনই মূল্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, গৃহস্থদের পক্ষে অতিথিসেবা পরম ধর্ম। কিন্তু—

গৃহেষু যেম্বতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নিযান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ॥ ৮।১৬।৭

—"যে সকল গৃহে অতিথিগণ আসিয়া জলদ্বারাও অর্চ্চিত না হইয়া নির্গত হযেন, ঐ সকল গৃহ শৃগালের বিবরতুল্য।"

ঠাকুর বলিতেন, গার্হস্থ্যাশ্রমে গৃহীকে শ্রীগুরু-ভগবানের সেবক-সেবিকারূপে অবস্থান করিতে হইবে। সংসারের যাবতীয় কর্তব্যপালন করিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে থাকিবে ঠাকুরসেবা—ভগবৎসেবার মনোভাব। প্রত্যেক গৃহীকে মনে রাখিতে হইবে, সংসারের মালিক বা কর্তা—শ্রীগুরু-ভগবান্। তাঁহারই নিয়োজিত সেবক-সেবিকা বা দাস-দাসীরূপে সংসার-ধর্ম পালন করিয়া যাইতে হইবে, কর্তব্যসাধন করিতে হইবে। কিন্তু কোথাও অহংএর এতটুকু ছাপ থাকিলে চলিবে না। গৃহীদের হইতে হইবে 'নাহংবাদী'। পরিবারের সকলেই মনে করিবে আমরা সকলেই শ্রীগুরু-ভগবানের নিত্যসেবক বা দাস-দাসী। গৃহীর দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম

এই ভাবে ভগবৎপ্রীত্যর্থে বা তদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ, যথা ঃ—

"তোমরা প্রেমের সংসার স্থাপন কর। আমাকে মূলে প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার সংসারেই কাজ কর। যেন মনে থাকে, প্রত্যেক কার্য্য ঠাকুরের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঘরবাড়ী ইত্যাদি সব ঠাকুরের, সংসার ঠাকুরের—তোমরা সেবক মাত্র। তোমাদের প্রত্যেক নিঃশ্বাস যেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়।'

আদর্শ গৃহীর সংসার হইবে এই ধরণের। গৃহীর যাবতীয় গৃহধর্ম তখন দিব্যযজ্ঞে রূপান্তরিত হইবে। সব শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাঁহারই নিয়োজিত কর্মচারীরূপে, সেবকরূপে নিষ্কাম-ভাবে সংসারধর্ম পালন করিয়া যাইতে হইবে। গৃহী হইলেই আমরণ সংসারাসক্তি বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে—এইরূপ মনোভাব আদর্শ গৃহীর লক্ষণ নহে। আদর্শ গৃহীকে সর্বাবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যসংগঠনের বীর-সাধক শিবাজী যেমন তাঁহার সুবৃহৎ সাম্রাজ্য গুরু রামদাসকে অর্পণ করিয়া পুনঃ তাঁহারই আদেশে সেবকরূপে সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি প্রত্যেক গৃহীকেও তাহার গৃহসাম্রাজ্য শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া তাঁহারই নিয়োজিত আজ্ঞাবাহী সেবকরূপে গৃহস্থধর্ম পালন করিয়া যাইতে হইবে। রামায়ণে দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্রও পরম জ্ঞানী বশিষ্ঠদেবের উপদেশ লইয়াই নির্লিপ্তভাবে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে প্রত্যেক আদর্শ-রাজার পেছনেই এক একজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি থাকিতেন। বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিত ব্রহ্মবল, ক্ষাত্রতেজের সঙ্গে সম্মিলিত থাকিত ব্রহ্মতেজ। রাজত্ব করিয়াও এইজন্যই রাজাদের মনে পরপীড়ন, অত্যাচার, অনাচার-

প্রবৃত্তির উন্মেষ না হইয়া, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ত্যাগী সংসারীকেই আদর্শ সংসারী বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন যুগে এইরূপ আদর্শ প্রত্যেক গৃহেই বিরাজমান ছিল। গৃহে তখন ঠাকুরদেবতার পূজা, ভোগরাগ নিয়মিতভাবে সুসম্পন্ন হইত। কেহই নিজের জন্য অন্ন পাক করিয়া রাক্ষসী ভোগ গ্রহণ করিত না। আহার্য্যবস্তু দেবতাকে নিবেদন করিয়া প্রসাদগ্রহণের ব্যবস্থা গৃহীদের পরিবারে তখন অক্ষুণ্ণ ছিল। আদর্শ গৃহস্থ শাস্ত্রের নিম্নলিখিত নির্দেশ ভালরূপেই অবগত ছিলেন। যথা :—

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।

যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥—মনুসংহিতা ৩।১১৮

—"যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপই ভোজন করে। যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে।"

পরিবারের প্রত্যেকেই তখন ঠাকুরদেবতার প্রসাদলাভে ধন্য কৃতার্থ হইত। গৃহীর গৃহ ছিল দেবতার মন্দিরবিশেষ। পরিবারের ছোট বড় সকলেই ছিল সেই মন্দিরের সেবক-সেবিকা। প্রত্যেক গৃহস্থ সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠাসহকারে দেবতার পূজার আয়োজন-রূপেই সুসম্পন্ন করিত। প্রার্থনা-নিবেদনের মন্ত্রে, আর প্রসাদ-বিতরণের ধ্বনিতে প্রত্যেক গৃহীর অঙ্গন থাকিত মুখরিত। গৃহস্থ-পরিবারের আকাশ-বাতাস সকাল-সন্ধ্যায় ধূপধুনার দিব্য গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিত। পরিবারে প্রবেশ করিলেই মনে হইত যেন দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুর সেই প্রাচীন যুগের দেবতার মন্দিরেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন।

———

পঞ্চম অধ্যায়

সংসারধর্ম যথাযথভাবে প্রতিপালন কাপুরুষ বা ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্তের কর্ম নহে। বীর ছাড়া সংসারী হওয়া যায় না। সংসারের স্রোতে যাহারা গা ভাসাইয়া চলে, যাহাদের নিরোধশক্তি বিলুপ্ত—তাহারা দুর্বল। এইরূপ দুর্বল অধিকারী সমাজের পক্ষে গলগ্রহ মাত্র। সামাজিক জীবন ধারণ করিলেও তাহাদের দ্বারা আদর্শচ্যুতি ব্যতীত আদর্শের সংরক্ষণ বা পরিপুষ্টি সম্ভবপর হয় না। কি ভাবে সংসার করিলে আদর্শগৃহী হওয়া যায়, তৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর এক গৃহস্থ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"সংসারের সর্বপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে আপনাকে অবিচলিত রাখাই বীরত্ব। বীর না হইলে সংসার করা কাপুরুষের কর্ম নয়। এই সব জানিয়া শুনিয়া সংসারে প্রবেশই আর্য্যরীতি। এখন অশিক্ষায় সংসার নরকে পরিণত হইয়াছে। ভগবানে নিভর করিয়া চলিতে পারিলে, তিনিই সবদিক সামলাইয়া পরিচালন করিবেন। কোন অবস্থায় নির্ভরতা ও নামজপ ভুলিও না।"

আর্য্যঋষিগণ চিরকালই কর্তব্যপরায়ণতাকেই মূল ভিত্তি করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিতে বিভিন্ন অবস্থায় বিশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াও কিরূপে কর্তব্যপালন করিতে হয়, তাহা নানা উপাখ্যানে দেখান হইয়াছে। পূর্বে সমাজের লোকদিগের কর্তব্যপরায়ণতা উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যেই সেই সকল আখ্যায়িকা কথকতায়, যাত্রাভিনয়ে, গল্পে, ব্রতকথায় সর্বত্র প্রচারিত হইত। গ্রামবাসী নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষেরা পর্য্যন্ত তাহাতে অনুপ্রাণিত হইত।

বিত্থালয়ের উপাধি অর্জন না করিয়াও মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় তাহারা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিত। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা এবং সেবাতে সকলের জীবনই স্থগঠিত হইয়া উঠিত। ইহাকেই বলে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা। এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সচল ছিল, পারিবারিক জীবনে শান্তি এবং স্থখও ততদিন পযন্ত অব্যাহত ছিল। কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখতা কাহারও জীবনে আদর্শ ছিল না। সংসার করিতে গেলে অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায নিপতিত হইতে হইবে জানিযাও সাংসারিক দায়িত্বপালনের প্রতি আদর্শগৃহীর কোন কালেই পলায়ন-প্রবৃত্তি ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কবিবাব স্থযোগ উপস্থিত হইলে সৈনিকের চিত্তে যেরূপ উল্লাস এবং আনন্দ দেখা যায়, আয্য রীতিনীতিতে শিক্ষিত গৃহীদেরও গার্হস্থ্যধর্ম পালনের কঠোরতা জানা সত্বেও পরম আনন্দই উপস্থিত হইত। সেবকের চিত্ত সেবা করিবার ক্ষেত্র পাইলে আনন্দিতই হইয়া থাকে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বপালনের যোগ্যতা যাহাদের অর্জিত হইত, সানন্দেই তাহারা সংসারাশ্রমের কঠোর কর্তব্যকে পালন করিতে উৎসাহান্বিত হইত। কর্তব্যেই অধিকার, ফলে নহে—এই শিক্ষায় ছোটবেলা হইতেই গৃহীদের মন স্থশিক্ষিত হইয়া উঠিত। কাজেই কোন অবস্থায় গৃহাদের মনস্তাপ ভোগ করিতে হইত না।

নিভরশীল ভক্তের বোঝা স্বয়ং ভগবান্ই বহন করেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রে এইরূপ ঘটনার বিবৃতি অনেক জায়গায়ই উল্লিখিত রহিয়াছে। নিম্নে শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ হইতে সেইরূপ একটি ঘটনার কথা বর্ণিত হইল।

শ্রীমান্ অর্জ্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু।
শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমীভ্যারে বধূ॥

পণ্ডিত গম্ভীর মহা উদার চরিত।
নির্মৎসর শান্ত শিষ্ট তদ্‌গতচিত ॥
ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্বত্র উদাস।
শ্রীমদ্গীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস ॥
গীতা-উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে।
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ শ্লোক বিচারিতে ॥
মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে।
যোগক্ষেম বহিয়া যে অনন্য ভক্তেরে ॥
আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয়।
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয় ॥
লেখনীতে আঁচড়িয়া পাঠান্তর স্থাপে।
গীতা-ভাগবত দেহ সাক্ষাৎ স্বরূপে ॥
গীতাপাঠ কাটাতে অক্ষরে আঁচড়িতে।
রামকৃষ্ণ-অঙ্গ ক্ষত হয় সেই ঘাতে ॥
জানাইতে তাঁহারে করিলা কিছু ভঙ্গী।
আচম্বিতে বাত বৃষ্টি হয় উত্তরঙ্গী ॥
ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে।
পরদিন গেলা পুনঃ ভিক্ষা অভিলাষে ॥
হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম।
ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম ॥
দুজনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার।
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার ॥
যাইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা।
ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা ॥

এতেক প্রসাদ তেঁহো পাইলেন কোথা।
তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা॥
সে যা হউক তোমাদের অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পারা॥
তাঁহারা কহেন মিশ্রঠাকুর মারিল।
তেঁহো কহে অসম্ভব মনে না লইল॥
শ্রীমিশ্রঠাকুর কারু নাহি দেন পীড়া।
ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া॥
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর।
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু চোর॥
সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আহা মরি।
কেমন নির্দয় সেই দয়া নৈল হেরি॥
পুনঃ শিশু কহে মাতা সত্য যে কহিনু।
মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥
পুনঃ পুনঃ শুনি ঠাকুরাণী মনে নৈল।
তবে বল বাপু আহা কি দিয়া মারিল॥
কেনে বা মারিল হেন কুমতি হইল।
এ হেন সোনার অঙ্গে আঘাত করিল॥
তাঁহারা কহেন মোরা কিছু নাহি কহি।
সন্নিকটে কিছু মাত্র দোষগুণ এহি॥
লোহার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহার আঘাতে।
আঁচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে॥
এতশুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া।
পড়িয়া রহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া॥

শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে।
ভিক্ষা নাহি মিলে বাত বরিষণ তরে॥
আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে।
শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে॥
এহেন কুমতি তব কি লাগি হইলা।
আহা মরি দুটি শিশু মারিয়া ডারিলা॥
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা।
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পারা॥
এত শুনি বিপ্র সাধু আশ্চয্য মানিয়া।
আকাশ-পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া॥
কহে আরে কে আইল কাহারে মারিনু।
আমি ত কাহারো কভু হিংসা না করিনু॥
কোথা হৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ।
বৃথা কেনে রোষ করি করহ কলহ॥
ঠাকুরাণী কহে মহাপ্রসাদের ভার।
জান নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার॥
মিশ্র কহে আমি ত না প্রসাদ পাঠাই।
পাঠাইল প্রসাদ কেবা সে বালক বা কই॥
তবে ঠাকুরাণী পুনঃ চমকিয়া কহে।
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে॥
অপূর্ব্ব-স্বরূপ দুটী গৌর-কৃষ্ণ-বর্ণ।
অতি সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ॥
স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা।
কাঁদিতে কাঁদিতে আইল যেন পুতুল হারা॥

কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা।
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা॥
পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা।
গীতাপাঠকাটা হেতু অনুভব কৈলা॥
বুঝিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা।
কহে তবে সত্য আমি অঙ্গ আঁচড়িলা॥
ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে।
কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোরে॥
ঠাকুর কহেন আরে গীতা-ভাগবত।
জগন্নাথের নিজ দেহ হয়তো সাক্ষাৎ॥
সেই গীতাপাঠ ছাঁটি তাহে আঁচড়িল।
অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল॥
"বহাম্যহম্" পাঠে মুঞি অবজ্ঞা করিল।
তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বহি দেখাইল॥
জগন্নাথ বলরাম আইল গৃহেতে।
তুমি ধন্য দেখিলা নহে আমার ভাগ্যেতে॥
ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া।
প্রেমাবেশে হর্ষভরে তটস্থ হইয়া॥
"বহাম্যহম্" "বহাম্যহম্" লেখে পুনঃ পুনঃ।
অপরাধ ক্ষেমাইতে করয়ে স্তবন॥
অদ্যাপিহ শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্রের গীতা-টীকা।
পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে অধিকা॥
"বহাম্যহম্" "বহাম্যহম্" তিনবার হয়।
অর্জ্জুন মিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়॥

নির্ভরশীল ভক্তের জন্য ভগবান্ সবই করিতে প্রস্তুত। তবে সেই নির্ভরতা খাঁটী হওয়া চাই। সুখে-দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া নির্ভরতার পরীক্ষা দিতে হইবে। 'নির্ভর' কথাটি মুখে বলা খুবই সহজ, কিন্তু সাংসারিক জীবনে নির্ভরখুঁটা ধরিয়া অবিচলিতচিত্তে সংসার-ধর্ম পালন বড়ই কঠিন। ঠাকুর তাঁহার প্রত্যেক গৃহীভক্তকে ত্যাগে, তিতিক্ষায়, নির্ভরতায় আদর্শরূপেই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতা-শক্তি অর্থাৎ সহ্য করিবার ক্ষমতা ব্রহ্মচর্য্য হইতেই উদ্ভূত। গার্হস্থ্যাশ্রমের মূল ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যকে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করিয়া যাহারা সংসার আশ্রমে প্রবেশ করে, পদে পদে তাহাদিগকে কেবল লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হয়। অসংযমীর দাম্পত্যজীবন কোন দিনই সুখের হয় না। অসংযমীর আত্মতুষ্টি বলিয়া কোন কিছু নাই। দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহারা বিষয়-ভোগের সুখও আহরণ করিতে পারে না। সুখের জগতে সুখ আস্বাদন করিতে হইলেও সবল ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় সবলতা লাভ করে ব্রহ্মচর্য্যপালনে। শক্তির স্খলনই ব্রহ্মচর্য্যহীনতা, আর শক্তিধারণই ব্রহ্মচর্য্য। ভোগী সংসারীরও ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। সামর্থ্য-অর্জ্জনের সময়টুকুতে ব্রহ্মচর্য্যপালন না করিলে ভোগ-সামর্থ্যও লোপ পাইয়া থাকে। পরিণামে ক্লীবত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। শক্তি সঞ্চয় হইতে না হইতেই ব্যয় আরম্ভ করিলে তাহাতে পরিশেষে ক্ষয়রোগের লক্ষণই ফুটিয়া উঠে। গৃহীরও ব্রহ্মচর্য্যপালনের বিধান মহাভারতাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

অবিক্ষুব্ধচিত্তে প্রারব্ধভোগ করিতে শিক্ষা এবং অভ্যাস করাকেই ঠাকুর প্রত্যেক গৃহীর পরমধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নির্ভরশীল ভগবদ্ভক্তের সাংসারিক জীবন আরও বেশী দুঃখময়। দ্রুত কর্মভোগ ক্ষয় করিতে হইলে দুঃখের চাপ একান্ত প্রয়োজন। দুঃখে নিষ্পেষিত

হইয়া নির্ভরশীল ভক্তের অন্য একটা বড় দিক্ খুলিয়া যায়। দুঃখের চাপেই দিব্যজীবনের বিকাশ হয়। বাহিরে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও, নির্ভরশীল ভক্তের জীবন আভ্যন্তরীণ শান্তিতে ভরপুর। কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে একমাত্র নির্ভরশীল ভক্তই। "পরীক্ষায় নহে মম স্বগণ কাতর"—এই উক্তি নির্ভরশীল ভক্তকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে।

সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর লিখিয়াছেন—"সংযোগ-বিয়োগ, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, বিরহ-বিচ্ছেদ যে এখানকার অনিবার্য্য নিত্য ঘটনা। ইহা দূর হইবার নহে। কাহারও দূর হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে পাইয়াও পাণ্ডবদের ব্যবহারিক দুর্গতি দূর হয় নাই। ইহা অনিবার্য্য। দূর করিতে গেলে বহর বাড়িয়া যায় মাত্র। সাধু, শাস্ত্র, গুরুমুখে এই সত্যলাভ করিয়া ধৈয্য অবলম্বনপূর্বক প্রারব্ধভোগ করিতে শিক্ষা ও অভ্যাস করাই প্রত্যেক গৃহীর পরম ধর্ম। অবস্থানুসারে কাঁদিয়া, হাসিয়া, নাচিয়া বেতালা না হইয়া সর্বাবস্থায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। লক্ষ্য স্থির রাখিবে। বীরের ন্যায় কর্মফল ভোগ করিতে হইবে।" প্রারব্ধ কর্মভোগের চাপে পড়িয়া অনেকেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে; কিন্তু ঠাকুর তাঁহার গৃহস্থভক্তদের বীরের ন্যায় কর্মফল ভোগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বীর কোনও অবস্থায় মুহ্যমান হয় না। তাহার মনোবল সর্বাবস্থায় অক্ষুণ্ণ। হাসিমুখে দুঃখকে বরণ করার সামর্থ্য একমাত্র বীর আদর্শগৃহীরই আছে। আদর্শগৃহী ইহা মর্মে মর্মে অবগত আছে যে, প্রারব্ধভোগ শীঘ্র শেষ হইয়া গেলেই মুক্তির রাজ্যে উপনীত হওয়া যাইবে। সুতরাং ভোগ সঞ্চিত না থাকিয়া ক্ষয় হইয়া যাওয়াই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। মহাভারতের বীর

আদর্শ পুরুষ ভীষ্ম যেমন শত্রুর অসংখ্য বাণে বিদ্ধ হইয়াও অবিচলিত-চিত্তে প্রারব্ধের ভোগ ক্ষয় করিয়াছিলেন, গৃহীদেরও তেমনি সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে স্থিতপ্রজ্ঞ থাকিয়াই ভোগ ক্ষয় করার উপদেশ ঠাকুর দিয়া গিয়াছেন। নীরবে কর্মফল ভোগ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত —ভীষ্মের জীবন। মরণবাণে বিদ্ধ হইয়াও, ভীষ্মদেব শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত নানা জটিল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া অতীব সুন্দর এবং সুচিন্তিত উত্তর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত পাঠ করিলে ভীষ্মদেবের অসীম তিতিক্ষা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রত্যেক গৃহীশিষ্যকে বীরের ন্যায় কর্মফল ভোগ করিতে বলিয়াছেন। আদর্শ গৃহী হইতে হইলে অসাধারণ মনোবল এবং তিতিক্ষা-শক্তিরই প্রয়োজন।

সাধারণ শ্রেণীর মানুষ কর্তব্যের কথা ভুলিয়াই সংসারাশ্রমকে পরম উপাদেয় বস্তু বা সুখের সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করে। বাস্তব পরীক্ষার ক্ষেত্রে পড়িলে তখন অনেককেই নাকানি-চুবানি খাইতে হয়। এক নিমেষে তখন সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

গৃহীরা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হউক—ঠাকুরের উপদেশে কোন জায়গায় তাহার এতটুকু আভাস পাওয়া যায় না। তিনি সকলকে আদর্শ গৃহী হইতেই বলিয়া গিয়াছেন। এক গৃহস্থভক্তকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়া ঠাকুর লিখিয়াছেন—"তুমি এই স্ত্রী লইয়া হিন্দুর আদর্শ সংসারী হইবে। সন্ন্যাস অপেক্ষাও কঠোর ভাবে তোমাদের জীবন-যাপন করিতে হইবে, নিতান্ত দীন-হীনের ন্যায় থাকিয়া জীবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। সুখের জন্য আমি তোমার বিবাহে সম্মতি দেই নাই। তোমাদের দাম্পত্যজীবন জীবের শিক্ষণীয় হইবে, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এক মুহূর্তও এই

কথা ভুলিও না।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, সুখের জন্য বিবাহ নহে। তবে বিবাহ কি দুঃখের জন্য ? না, তাহাও নহে। কর্তব্যপালনের জন্যই বিবাহ। এই কর্তব্য পালন করিতে গেলে কেবল যে সুখের সুন্দর মুখই সন্দর্শন করিতে হইবে তাহা নহে। সুখের সঙ্গে দুঃখও আসিবে—ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সন্ন্যাস অপেক্ষাও কঠোরভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে, এই একটি কথা দ্বারা গৃহীর গার্হস্থ্যধর্ম পালন যে কত কঠিন, তাহাই ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়াছেন। গেরুয়া না পরিলেও, আদর্শ গৃহীর কর্তব্য সন্ন্যাসী অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। আজ গৃহীরা কি এই কথা মুহূর্তের জন্যও একবার ভাবিয়া দেখেন ? গৃহী পরের সেবায় নিজের জীবনকে রিক্ত করিয়া দিয়াছে—এই ত সন্ন্যাস! বিবাহের অনুমতি শ্রীশ্রীঠাকুর কাহাকেও নিছক ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য দেন নাই। বিবাহিত-জীবন হইবে সন্ন্যাসীর জীবন ; ত্যাগই সেই জীবনের লক্ষ্য। দাম্পত্য-জীবন কেবল ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য নহে। মানবীয় বৃত্তির সংযত-চর্চা বা অনুশীলন করিয়া দেবজীবন লাভই দাম্পত্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাহারা কেবল কতকগুলি সন্তান-সন্ততির পিতা-মাতা হয়, তাহাদিগকে কখনও আদর্শ গৃহী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না।

বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়েদের কি দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, পরস্পর সম্বন্ধের মূল রহস্য কি, তৎসম্পর্কেও শ্রীশ্রীঠাকুরের মূল্যবান্ উপদেশ আছে। যথা—"যদি স্ত্রীর প্রেম পাইয়া থাক, তবে মনে করিও, সেই প্রেমময়েরই একটি উৎস তোমার স্ত্রীর হৃদয়খাতে প্রবাহিত। সে প্রেমে জগৎপ্রেম শিক্ষা করিও। ছেলেমেয়েকে কোলে করিয়া ভগবানেরই সেই নির্মল সত্তা অনুভব করিও।

রক্ত-মাংসে সুখ নাই, তাহা জড় মাত্র। সেই চিদানন্দের আবেশেই তাহারা আনন্দের কারণ। তাহার অন্তর্ধানে সব শূন্য—সব জড়—পূতিগন্ধবিশিষ্ট রক্তমাংস! এই কথা ভুলিও না, পার ত সকলকে এই শিক্ষা দাও।" জাতির পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর শিক্ষা কি এবং কোন্ শিক্ষাকে সার্বজনীন করিতে হইবে—শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় মৌলিক শিক্ষাপদ্ধতি ইহাই যে, বস্তুর অন্তরালে যে দিব্য চেতনা রহিয়াছে, সেই দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ফিরাইয়া দেওয়া। অধ্যাত্ম-শিক্ষা ইহাকেই বলা যাইতে পারে।

সাংসারিক সুখ বা আনন্দকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, সুখের মূল কারণ কি তাহাই অনুসন্ধান করিতে। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের দেহ বা নশ্বর সম্বন্ধ আনন্দ বা সুখের নিদান নহে। চিদানন্দের আবেশই আনন্দের মূল কারণ। সচ্চিদানন্দের অন্তর্ধানে কাহারও কোন মূল্য নাই। পিতা-মাতা সন্তানকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার মূল তত্ত্ব কেহই জানে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসার মূল হেতু কি? কেন এই ভালবাসা, এই ভালবাসার লক্ষ্যই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তর ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকোপনিষদে বড়ই চিত্তাকর্ষী ভাষায় প্রদান করিয়াছেন। যথা—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং

ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যানস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।"—"অয়ি! পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি! জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয়া হয়। অয়ি! পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। অয়ি! বিত্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়! অয়ি! ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীতিবশতঃ ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। অয়ি! ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রীতিবশতঃ ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। অয়ি! স্বর্গাদি লোকসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ এই লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! দেবগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়। অয়ি! ভূতসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ ভূতগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। অয়ি! সর্ববস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সর্ববস্তু প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।"

প্রেমতত্ত্বের মূল কথা এই যে, পতি-পত্নী, সন্তান-সন্ততি, স্বজাতি, সমুদয় জগৎ যে আমাদের প্রিয় হয়, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র বস্তুর স্বতন্ত্র

মূল্যবশতঃ নহে, কিন্তু ইহাদের অন্তর্ভূত সর্ব্বগত আত্মার অনুরোধে। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" ভালবাসা বা প্রেমের মূল নিদান হইল—চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতি আকর্ষণ। সংযতচিত্তে এই তত্ত্বের উন্মেষ যেখানেই হইয়াছে, সেইখানেই দেখি স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধ দৈহিক স্তরকে অতিক্রম করিয়া দিব্যরাজ্যে তাহার আসন রচনা করিয়া লইয়াছে। মূল তত্ত্ব বা নিদানের প্রতি দৃষ্টি বা লক্ষ্য নাই বলিয়াই স্বর্গীয় পবিত্র সম্বন্ধ ঘৃণ্য প্রাকৃত স্তরে নামিয়া আসে। ভালবাসা যখন জীবের স্বভাব, তখন তাহা কোন কালেই রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু ঋষিদের উপদেশের তাৎপর্য্য ইহাই যে, পার্থিব ভালবাসার ভিতর দিয়া জীব অপার্থিব ভালবাসার সন্ধান লাভ করুক। ভালবাসাশূন্য হৃদয় মরুভূমির মতই শুষ্ক। ভালবাসা লইয়াই সংসার, ভালবাসাতেই জগৎ বিধৃত ; কিন্তু ভালবাসা বা আকর্ষণের মূল হেতু কি, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—জানিতে হইবে।

ঠাকুর তাঁহার গৃহীশিষ্যদের অন্তর্দৃষ্টি লইয়া সমগ্র জগৎকেই ভালবাসিতে বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভালবাসায় কোন দিন মোহ জন্মাইতে পারে না। চৈতন্যরূপী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা বা প্রেম-প্রীতি অর্পিত হইলে,' তাহা তখন অসাধারণত্বে পরিণত না হইয়াই পারে না। জগৎকে, জগতের নর-নারীকে মহাপুরুষগণও ভালবাসেন, আর সাধারণ মানবেরও ভালবাসা দেখা যায়। কিন্তু এই দুই ভালবাসাতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান। একটি সুন্দর ফুল দেখিয়া শুচিশুদ্ধহৃদয় মহাপুরুষের আসে সমাধি, আর লোলুপ, অসংযত মানব সেই ফুলটিকে দলিত-মথিত এবং তাহার মর্ম্মকোষ ছিন্ন করিয়া পরিণামে লাভ করে কেবলই অশান্তি।

সংযমের তারতম্যে ভোগেরও তারতম্য ঘটে। অন্তর্দৃষ্টি লইয়া বহির্জগতের চাকচিক্যের মোহ অতিক্রম করিতে না পারিলে কোনও বস্তুরই আসল স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বরূপ বা তত্ত্ব জানিতে হইলেই সংযমের প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংযত না হইলে কেহই কাহাকে বুঝিতে সক্ষম হয় না। গভীর ভালবাসা উপলব্ধি করিতে হইলে দাম্পত্য-জীবনে সংযম অপরিহার্য্য অঙ্গ। বিক্ষুব্ধচিত্তের ভালবাসা আর সমাহিতচিত্তের ভালবাসা এক নহে। দাম্পত্য-জীবনে যে কলহ এবং অশান্তির সৃষ্টি হয়, তাহার মূল কারণ—সংযমের অভাব। অত্যাচারেই মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অত্যাচার-উৎপীড়ন যেখানে, সেখানে শান্তিপ্রীতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সুখের আশা লইয়াই মানুষ সংসার করে, কিন্তু পরিণামে সংসারের জ্বালায় অনেকেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এমন কি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্পও কাহারও কাহারও মনে জাগিয়া উঠে। সংসার-জ্বালায় নিপীড়িত এইরূপ এক ভক্তের গৃহত্যাগের বাসনাব কথা অবগত হইয়া ঠাকুর তাহাকে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন—"বৎস! চিত্তের সাময়িক উত্তেজনার বসে হঠাৎ সংসার ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। নিজেকে সংযত ও প্রবৃত্তিকে স্ব-বশে আনিতে না পারিলে পৃথিবীর যেখানেই যাও না কেন, অভাব-অশান্তি সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণের জন্যই গৃহস্থাশ্রম।"

সাংসারিক জীবনে সর্ব্বক্ষেত্রে শুধু জয়ই ঘটে না, পরাজয়ের গ্লানিও সংসারীকে বহন করিতে হয়। কিন্তু পরাজয়ে হতাশ না হইয়া ভগবানে নির্ভর করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কৃতকার্য্যতালাভের জন্য যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। হতাশহৃদয় এক ভক্তকে ঠাকুর আশ্বাস বা

সান্ত্বনা প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন—"এ জগতে কাহারও কোন বিষয়ে হতাশ হইবার কারণ নাই। যে যতই অধঃপতনের নিম্নতম প্রদেশে নামিয়া যাউক না কেন, সে নিজের পতন বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারিলেই আবার উন্নত হইতে পারিবে। নিজের ক্ষমতা না থাকিলে বা অক্ষমতা বুঝিলে, প্রার্থনায় ভক্ত বা ভগবানের সাহায্য পাইবে। ভাল হইবার ইচ্ছা থাকিলে ভগবান্ সহায় হন। আর ইচ্ছা না থাকিলে যোগ, জপ, তপাদির অনুষ্ঠানে কিছুই ফল হয় না। অতএব যদি তোমার উঠিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে সাধ্যানুসারে চেষ্টা কর, আর প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সাহায্য চাও। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার নাম লইতে অভ্যাস কর। সকল অবস্থায় নির্ভর করিতে শিখ, ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ তাঁহাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর, তিনি হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইবেন। রাস্তা যতই দুর্গম হউক না কেন, নির্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারিবে। বৎস! প্রথম জীবনে দুই একবার পড়িয়া হতাশ হইলে চলিবে কেন? কোন বালকই দুইচারিদিন না পড়িয়া আর অত দূরে উঠিতে পারে নাই। সুতরাং যাহা হইয়া গিয়াছে তার জন্য না ভাবিয়া পিছনে না তাকাইয়া সম্মুখ দেখিয়া চলিতে শেখ। আর যেন পড়িতে না হয়। কেবল একমাত্র ভগবান্‌ই পড়েন না। তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিতে পারিলে আর পড়িবার ভয় থাকে না। ভগবান্‌কে ভালবাস. তাঁহার নাম কর—সব জুড়াইয়া যাইবে।"

প্রারব্ধ সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। সাংসারিক জীবনে এই প্রারব্ধভোগের পরপারে যে এক নিত্য আনন্দময় ধাম রহিয়াছে, তাহার কথাও মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে হইবে। আমরা সেই নিত্য আনন্দময় ধামে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনহেতুই

সংসারে প্রবেশ করি। গুণক্ষয়ান্তে আমরা আবার সেই শান্তিধামেই পৌছিব—এইরূপ মনোভাব লইয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, প্রারব্ধভোগ তখন আর বিমর্ষ-মলিন করিতে পারে না। ঠাকুর এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"কেহ প্রারব্ধভোগ খণ্ডন করিতে পারে না। কেবল একমাত্র জ্ঞান-ভক্তিতে জীবের শান্তি, নতুবা স্বামী-পুত্র, ধন-জনে কেহ সুখী হইতে পারে না। সংসারই অনিত্য উপাদানে গড়া; বিয়োগ-ব্যথা, রোগ-শোক এখানের নিত্য ঘটনা। ভগবান্‌কে সখারূপে পাইয়াও পাণ্ডবদের সাংসারিক দুর্গতি দূর হয় নাই। সুতরাং সাংসারিক সম্পদে-বিপদে অভিভূত না হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য পালন কর। কিন্তু মায়ের নাম ভুলিও না, তাঁহার চিন্তা ছাড়িও না, লক্ষ্যচ্যুত হইও না। সংসারে সুখী করিবার জন্য গুরু শিষ্য করে না; সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে শান্তিরাজ্যের পথ দেখাইয়া দেওয়াই সদ্‌গুরুর কার্য্য। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদেরও সাংসারিক মোহ দূর হইয়া মায়ের চরণে দৃষ্টি নিপতিত হউক। ভগবানের নামে-প্রেমে মজিয়া যাও, হাসিমুখে মৃত্যুকে কোল দিয়া জীবন-মরণের পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাক।"

ওপারের কথা মনে থাকিলে, এপারের প্রতি আর অত্যাসক্তি আসে না। এইজন্যই সংসার করিয়াও পরপারের কথা চিন্তা করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রতি শিষ্য-ভক্তকে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভোগাসক্ত গৃহীর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিতে হইলে পরকাল-পরলোকের চিন্তা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। ইহকালের কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হওয়াকে যেমন ঠাকুর আদর্শ বলেন নাই, তেমনি পরকাল-পরলোকসম্পর্কে অজ্ঞতাকেও তিনি

আদর্শ গৃহীর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। আদর্শ গৃহী ইহকাল-পরকালের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সমভাবে সজাগ থাকিবে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ। পরিণাম-চিন্তায় ঔদ্ধত্য, দম্ভ, অহঙ্কার আপনি কমিয়া আসে। ভারতের আদর্শ ইহকালবিমুখীনতাকেও প্রশ্রয় দেয় নাই, আবার পরকাল-পরলোক এবং ধর্মসম্পর্কে অজ্ঞতাকেও প্রশংসা করে নাই।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৃহী-সন্ন্যাসীর আদর্শ হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সম্মুখে হরি-হরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হরি-হর অভিন্ন। নির্লিপ্ত গৃহী এবং আদর্শনিষ্ঠ সন্ন্যাসী এক। ঠাকুরের উপদেশ যথা—"হর সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী—খর্পরমাত্র সম্বল; কাজেই হর ত্যাগী—বৈরাগী—সন্ন্যাসী। অপর একজন অর্থাৎ হরি মণিমুক্তাখচিত নৃত্যগীতপরিপূরিত বৈকুণ্ঠবিহারী, পার্শ্বে অনুপমা সুন্দরী, কাজেই হরি ভোগী - বিলাসী—গৃহবাসী। স্থূলতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ কোন বিভিন্নতা নাই। শিব সন্ন্যাসী সত্য—কিন্তু দেখিয়াছ কি উঁহার কোলে কে? বিশ্বমোহিনী রমণী, উনি কে? উনি জীবজগৎরূপা বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি। শিব সন্ন্যাসী হইয়া আমিত্ব ও আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়াছেন বটে; কিন্তু জগৎসংসারকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, পরার্থে স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন—তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই; কিন্তু তিনি প্রত্যেক ভূতের হিতসাধনে রত; ভূতনাথ নামে পরিচিত। তাহা হইলে শিব সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারে লিপ্ত। আর আমরা হরিকে গোকুল-বিহারীরূপে দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গোপীর প্রেমে মাতোয়ারা—রাধাপ্রেমে যেন বিহ্বল, রাধার সামান্য অবহেলাতে রাধাকুণ্ডে প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত। সকলেই জানিত, শ্রীকৃষ্ণের রাধাগতজীবন—রাধার ক্ষণকালের বিরহে বুঝি তিনি বাঁচিতেন না। কিন্তু কই? যেমন অক্রূর আসিয়া মথুরার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা রওনা হইলেন, রাধার নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনসংবাদ

পাইয়া সঙ্গিনীসহ রঙ্গিণী রাই আসিয়া পথিমধ্যে রথচক্রের নিম্নে বুক দিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'আমাদের হৃদয় রথচক্রে নিষ্পেষিত করিয়া মথুরা গমন কর।' শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমোন্মাদিনী গোপরমণীর মর্মভেদী কাতরতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মথুরা চলিয়া গেলেন। রাম-অবতারে পতিপ্রাণা জানকীকে বিনা অপরাধে কেবল রাজার কর্ত্তব্যে বনে দিলেন। তাহা হইলেই তিনি যত কেন স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-বিভবের মধ্যে থাকুন না, কখনও স্ত্রী-পুত্রের আঁচল ধরিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই; আত্মসুখে অন্ধ হইয়া তিনি জীবের দুঃখ বিস্মৃত হন নাই, আত্মস্বার্থে পরার্থ পদদলিত করেন নাই, আপন হিত করিতে জগতের হিত ভুলিয়া যান নাই। কাজেই হরি গৃহী হইলেও নির্লিপ্ত। তবেই হর সন্ন্যাসী হইয়াও লিপ্ত, আর হরি গৃহী হইয়াও নির্লিপ্ত। আবার লিপ্ত সন্ন্যাসী ও নির্লিপ্ত গৃহী একই কথা—সুতরাং হরি-হর অভেদ। এদিকে আবার গৃহীর আদর্শ হরি এবং সন্ন্যাসীর আদর্শ হর। অতএব যে গৃহী হরির আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন এবং যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই সমান—তাহাদিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। বরং হরির আদর্শে গঠিতজীবন গৃহস্থ, যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে এখনও জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর হরের আদর্শে গঠিতজীবন সন্ন্যাসী সর্বপ্রকার গৃহস্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব গৃহস্থ কিংবা সন্ন্যাসী হউন, যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করতঃ নির্লিপ্তভাবে কর্মানুষ্ঠান এবং অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিয়াও জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই গৃহী ব্যাসদেব এবং সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য একই 'আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আদর্শ গৃহমেধী এবং সন্ন্যাসীতে বাস্তবিকই কোন পার্থক্য নাই। স্বধর্মানুষ্ঠানদ্বারা গৃহস্থও সন্ন্যাসীপদবী প্রাপ্ত হইতে পারেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্মস্তে গৃহমেধীয়ো বর্ণিতঃ পাপনাশনঃ।

গৃহস্থো যেন পদবীমঞ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ ॥৭।১৫।৭৪

—"হে রাজন্! তোমার নিকট পাপনাশক গৃহমেধীর ধর্ম বর্ণন করিয়াছি, যে ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা গৃহস্থ সত্যসত্যই সন্ন্যাসীদিগের পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে।"

সংসারভয়ে ভীত হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণের পক্ষপাতী ঠাকুর কোনদিনই ছিলেন না। তবে তীব্রবৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে তিনি অতীব আদরের সহিতই গ্রহণ করিতেন। সংসারজয় না করিলে সন্ন্যাসে শান্তি পাওয়া যায় না। ঠাকুর এক গৃহস্থভক্তকে লক্ষ্য করিয়া লিখিযাছেন—"সংসারভীরু কাপুরুষের জন্য সন্ন্যাস নহে, আত্মসুখের জন্য সন্ন্যাস নহে, আপন সুখ পরকে বিলাইয়া দিবার জন্যই সন্ন্যাস। বৎস! এখনও নিজেকে সুখী করতে পার নাই, পরকে কি দিবে? 'জগদ্ধিতায় বহুজনহিতায় চ' যে মহান্ আশ্রমের ব্যবস্থা—দুঃখে বা ভয়ে সংসার ছাড়িলে কি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়? ত্যাগীর আদর্শ বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ কেহই ভয় পাইয়া সংসার ছাড়েন নাই। অধিকারী না হইলে আমি কাহাকেও সংসারত্যাগের পরামর্শ দিতে পারি না।"

সন্ন্যাস অপেক্ষা আদর্শ গৃহীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার উপদেশই ঠাকুর তাঁহার গৃহী ভক্ত-সন্তানকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কোন রকমের কাপুরুষতাকেই ঠাকুর প্রশ্রয় দেন নাই। সংসারের দায়িত্বপালনে অক্ষম কাপুরুষ ভীরুকে যেমন তিনি সন্ন্যাসের অনুমতি

প্রদান করে নাই, তেমনি আদর্শ সন্ন্যাসীরূপে গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জগদ্ধিতকর সেবামূলক কর্মেও তিনি তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন নাই। যোগ্যতা দেখিয়াই কোন্ আশ্রম কাহার পক্ষে উপযোগী হইবে তাহা বলিয়া দিতেন। কাপুরুষ, ভীরু, দুর্ব্বল যেমন আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়ার উপযুক্ত নহে, তেমনি আদর্শ গৃহী হওয়ারও উপযুক্ত অধিকারী নহে। শক্তি, সামর্থ্য এবং যোগ্যতা থাকিলে মানুষ উভয় আশ্রমের যে কোন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সেবামূলক কর্মের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়।

গীতার জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সদ্গুরুরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার গৃহস্থ শিষ্য-ভক্তগণকে 'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'— এবং নির্ভরযোগের শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গৃহীদের পক্ষে নির্ভরতার পথই শ্রেষ্ঠ এবং সুগম পন্থা। আদর্শ গৃহীরূপে সংসার করিতে হইলে নির্ভরতার পথ অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুখ দুঃখ, রোগ-শোক, সংযোগ-বিয়োগে চিত্ত অচল-অটল বা স্থির-ধীর রাখিয়া চলিতে গেলে ভগবন্নির্ভরতাই তাহার একমাত্র উপায়। অবলম্বনবিহীনের পক্ষে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর পড়িয়া স্থিরমস্তিষ্কে সংসারধর্ম প্রতিপালন অসম্ভব। এইখানেই প্রয়োজন হয় কোন না কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বা অবলম্বনের। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় হইলেন—ভগবান্। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইয়াও মানুষ মানসিক বলহারা হয় না। আশ্রয় বা অবলম্বনস্বরূপ শক্ত খুঁটা না থাকিলে দুর্ব্বলচিত্ত গৃহীর পক্ষে আদর্শ সংসার-জীবন যাপন করা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক গৃহীকে এইজন্যই ঠাকুর শ্রীগুরু-ভগবন্নির্ভরতার উপদেশ এত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সংসারাশ্রমের বিবিধ জ্বালায় উৎপীড়িত এবং

বিব্রত এক শিষ্যকে ঠাকুর উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন—"পাঁচটা প্রিয়জন লইয়া ঘর করিতে গেলে রোগ-শোক, বিরহ-বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য অধীর হইলে চলিবে কেন? তাঁহার সকল প্রকার দান মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। তিনি যাহাকে পাঠাইবেন তাহাকে যেমন হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবে, স্নেহযত্নে পালন করিবে পিতামাতার কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করিবে, আবার তাঁহার আহ্বান আসিলে তেমনি হাসিমুখে তাহাকে তাঁহার কোলে তুলিয়া দিবে। তবে না সংসার, তবে না সদ্‌গুরুর শিষ্যের পরিচয়?"

অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য জন্ম-মৃত্যু, শোক-দুঃখ, বিরহ-বেদনার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। তবে মৃত্যুর আহ্বান আসিলে হাসিমুখে যে জনক-জননী তাঁহার সন্তান-সন্ততিকে ভগবানের কোলে অবিকম্পিতচিত্তে তুলিয়া দিতে সক্ষম, তাঁহারাই অসাধারণ আদর্শ গৃহী। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আদর্শগৃহী শ্রীবাসপণ্ডিতের পারিবারিক একটি ঘটনার কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখেতে শ্রীবাস আদি সঙ্কীর্ত্তন করে॥
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাসগৃহে উঠিল ক্রন্দন॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোকবাস॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা তত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥

তোমরা ত সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যার নাম।
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে॥
যদি বা সংসারধর্ম্মে নার সম্বরিতে।
বিলম্বে কাঁদিহ যার যেই লয় চিতে॥
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয়॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥
পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণ রহিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥

পরস্পর শুনিলেন সর্ব ভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠগমন ॥
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে ॥
সর্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্বজনের অন্তর ॥
প্রভু বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ॥
পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন্ দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত ॥
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু কহ কতক্ষণ।
শুনিলেন চারি দণ্ডরজনী যখন ॥
তোমার আনন্দভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ কার্য্য করিতে সত্বর ॥
শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
গোবিন্দ গোবিন্দ প্রভু করেন স্মরণ ॥
প্রভু বলে হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে ॥

এত বলি মহ প্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগবাক্য শুনি সবে চিন্তেন অন্তর॥
নাহি জানি কি প্রমাদ করয়ে কখন।
অন্যান্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ॥
গৃহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিব সন্ন্যাস।
তবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সংকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥
মৃত শিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ॥
শিশু বলে প্রভু যেন নির্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার॥
মৃত শিশু উত্তব করয়ে প্রভুসনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব ভক্তগণে॥
শিশু বলে এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই সব॥
নির্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্বন্ধিত পুরী॥
এ দেহের নির্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি॥
কে কাহার বাপ প্রভু কে কাহার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম এবে চলিলাম অন্য পুরে॥

সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥
এত বলি নীরব হইল শিশুকায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
মৃতপুত্রমুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দসাগরে ভাসে সব ভক্তগণ॥
পুত্রশোক-দুঃখ গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে হইলা অস্থির॥

—মধ্যখণ্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

আদর্শগৃহীর পরিচয় হইল—এইরূপ চিত্তের স্থৈর্য্যে, অচল অটল মনোভাবে। অবিচলিতচিত্তে কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই আদর্শগৃহীর বিশেষ লক্ষণ। সদ্গুরুর শিষ্যেরও এইখানেই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনে ভগবানের অনুকূল কৃপাই কেবল আসিবে না, খাঁটি নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের পরীক্ষা লইবার জন্য প্রতিকূল কৃপাও আসিবে। অনুকূল কৃপাকে যেরূপ আদর্শগৃহী সাদরে সানন্দে বরণ করিয়া লইবে, প্রতিকূল কৃপাকেও ভগবৎপ্রদত্ত প্রসাদ বা দান বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। হৃদয় কতখানি কঠিন কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ভগবদনুরক্ত হইলে তবে মানুষ প্রতিকূল কৃপাকেও হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়, একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। দুঃখ দিয়া গড়া এই সংসারে সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সুখ-শান্তি একমাত্র নির্ভরতায়। তাই ঠাকুর গৃহীভক্তগণকে বারংবার নির্ভরতার উপদেশই দিয়া গিয়াছেন। এক সংসারক্লিষ্ট ভক্তকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ভগবান্‌কে নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। মানুষ চেষ্টা বা চিন্তা দ্বারা নিজের কিছুই

করিতে পারে না। সুতরাং বৃথা চিন্তা না করিয়া সুখে-দুঃখে তাঁহার চরণ চিন্তা এবং তদীয় নামের জয় উচ্চারণ করিয়া যাও। কয়দিনের সংসার? কয়দিনের দেহ? আর মঙ্গলময়ের উপর ভার দিলে তিনিই মঙ্গলব্যবস্থা করিবেন। ডাক্তারের অস্ত্র-চিকিৎসায় বাধা দিলে ক্ষত ভাল হইবে কেন? আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যই তিনি তাঁহার ভক্তকে সাংসারিক কষ্ট দিয়া থাকেন।" ভক্ত এই দুঃখকে জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণদায়ক বলিয়াই সাদরে বরণ করিয়া লন। সুখে সম্পদে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া থাকা অপেক্ষা দুঃখের আঘাতে কর্ত্তব্যে সচেতনতাই বরণীয়। যে সুখে-সম্পদে ভগবদ্বিস্মৃতি ঘটে, সেই সুখ-সম্পদকে ভক্ত অগ্রাহ্যই করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তবে এই ভাবটি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবচ্চরণে কুন্তীদেবী এই প্রার্থনাই করিয়াছেন যে—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বতত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

—প্রথম স্কন্ধ ৮।২৫

দুঃখেই মানুষের চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে। সুখে মানুষ মোহগ্রস্ত থাকে। দুঃখ, আঘাত, বেদনা বন্ধুরূপে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেই আসে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহীভক্তকে দুঃখ-কষ্টে বিচলিত না হইয়া উদ্বুদ্ধ হইতেই উপদেশ দিয়াছেন।

কয়দিনের সংসার, কয়দিনের দেহ—এই উপদেশ প্রদান করিয়া ঠাকুর গৃহস্থ-ভক্তদিগকে সংসারের প্রতি উদাসীন বা বিরাগী করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম হইল—কর্ত্তব্য কর্ম করিয়াও মনকে নির্লিপ্ত উদাসীন রাখিতে হইবে। এই-উপদেশ-

বাণীকে জীবনে রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইলে ধারাবাহিক সাধনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মনোবল একদিনে সঞ্জাত হয় না। সুদীর্ঘকাল অভ্যাসের সাধনা করিলে পর তবেই মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা লাভ করিতে পারে। ভারতীয় শিক্ষার বা ভারতীয় আদর্শের ইহাই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান সত্যদ্রষ্টা ঋষিদেরও অনুমোদিত। কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মনিষ্ঠার প্রশংসাই তাঁহারা বেশী করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

—ঈশোপনিষৎ, ২য় শ্লোক

—"এই ভাবে অর্থাৎ অনাসক্ত ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম করিয়া শতবর্ষ বাঁচিতে ইচ্ছা কর। তাহা ছাড়া কর্মপাশ হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। নিষ্কাম কর্ম কখনও মানুষকে লিপ্ততায় আবদ্ধ করে না।"

কর্ম করিয়া কর্মবন্ধনমুক্ত হইতে হইলে মনকে এই শিক্ষায়, এই ভাবেই গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে আশ্রমধর্ম যথাযথভাবে পালন করাও সম্ভব নহে। অনাসক্তচিত্তে সংসারধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই প্রাচীন যুগে গার্হস্থ্যধর্মের পরও গৃহী বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণেরও সামর্থ্য রাখিতেন। আধুনিক যুগের ভোগাসক্ত মানবের মন এক আশ্রমের অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের আস্বাদন আজীবন সম্ভোগ করিয়াও কিছুতেই শান্ত-তৃপ্ত হয় না। ইহার কারণ প্রবল ভোগাসক্তি। ভোগদ্বারা কখনই ভোগতৃষ্ণা দূর হয় না। মনুসংহিতাতে আছে—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ২।৯৪

—"কাম্যবিষয় উপভোগে কামনার শান্তি হয় না, পরন্তু ঘৃতাহুতিযোগে অগ্নি যেমন আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বিষয়োপভোগে কামনারও তদ্রূপ বৃদ্ধি হয়।" কু বাসনা চরিতার্থ করিয়া তাহা প্রশমিত করিবার ইচ্ছা এবং ঘৃত ঢালিয়া অগ্নিনির্বাপণচেষ্টা একই রূপ। অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, ভোগ না করিলে কি নিবৃত্তি আসে? কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ভোগের দ্বারা কখনও ভোগনিবৃত্তি হয় না। সম্রাট্ যযাতি আজীবন ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া পুনঃ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই। তাঁহারই মুখের শেষ সিদ্ধান্ত-উক্তি যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥ ৯।১৯।১৩

—"হে ভদ্রে! পৃথিবীতে ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী যত আছে, তৎসমুদায়েও কামহত পুরুষের মনস্তৃপ্তি হইতে পারে না।"

নিবৃত্তির উপায় কেবল ভোগ নহে—সংযত ভোগ। কাজেই এইখানে আসে বিধিনিষেধের প্রশ্ন।

এই জগৎ মিথ্যা, মায়া বলার নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, ভোগাসক্ত মানবের প্রাণে চৈতন্যের সঞ্চার করা। ত্যাগ-বৈরাগ্যের অর্থাৎ মোহমুদ্গরের বাণীই যে ভোগাসক্ত মানবের প্রাণে চৈতন্যসঞ্চারের একমাত্র অমোঘ উপায়! কেবল মাত্র ভোগকে ভারত কোনদিনই পরমপুরুষার্থ বা জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। কথকতায়, গানে, কীর্ত্তনে, বক্তৃতায়, ত্যাগ-বৈরাগ্যের বাণী প্রচারিত হওয়ায় অতি শৈশব হইতেই মানব-মন আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন গঠনের

প্রেরণা পাইত। ভারতের শিক্ষা মানুষকে কর্মবিমুখ হইতেও শিক্ষা দেয় নাই, আবার কর্মকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেও উদ্বুদ্ধ করে নাই। কর্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন্মুক্তির আস্বাদনও লাভ করিতে হইবে—ইহাই ভারতের আদর্শবাণী। পাশ্চাত্যের ধার-করা আদর্শ ভারতীয় সামাজিক জীবনের অভ্যুত্থানে কোন দিন সাহায্য করিবে না। ভারতকে ভারতের সনাতন ভাবধারা অবলম্বন করিয়াই জাগ্রত-উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। ইহাই ভারতের নিয়তি।

সপ্তম অধ্যায়

সাংসারিক-জীবনে মানুষ মানুষকেই নিমিত্ত ভাবিয়া পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দোষ অন্য কাহারও নহে। মানুষ নিজ নিজ কর্মফলই ভোগ করিয়া থাকে। নিজকৃত কর্মের জন্য অপরকে দায়ী করা অজ্ঞানতা মাত্র। এই স্থলে রত্নাকর দস্যুর কাহিনীটি মনে পড়িয়া গেল। কৃত্তিবাস-রামায়ণের আদিকাণ্ডে তাহার অপূর্ব বর্ণনা রহিয়াছে। যথা—

ব্রহ্মা বলিলেন, পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ-পাতকের কে হইবে ভাগী॥
দস্যু বলে, আমি যত ল'য়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারি জন॥
যাহা কিছু বেচি কিনি, খাই চারি জনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে॥
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা বলিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে॥
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়ে।
আপনি করিলে তাহা আপনারি দায়ে॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয়॥
নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি॥
হরিষে-বিষাদে মুনি লাগিল ভাবিতে।
বুঝিলাম এই যুক্তি কর পলাইতে॥

ব্রহ্মা বলে, সত্য করি, না পলাব আমি।
মাতা পিতা পত্নী সুধাইয়া এস তুমি॥
অতঃপর যায় মুনি, ফিরি ফিরি চায়।
ভাবে, বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়॥
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥
মানুষ মারিয়া আনি যত ধন আমি।
আমার পাপের ভাগী বট কিনা তুমি॥
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন॥
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ, কে কহে তোমারে।
পুত্রকৃত পাপ-ভাগ লাগিবে পিতারে॥
অজ্ঞান বালক, তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা॥
যখন বালক ছিলে, পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি পিতা হৈলে তুমি॥
যখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন॥
যত পাপ করিয়াছি আপনি সংসারে।
সে-সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে॥
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্রতুল্য আমি।
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ॥

শুনিয়া বাপের বাক্য মাথা হেঁট করে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল মায়ের গোচরে॥
সত্য করি আমারে গো কহিবে আপনি।
আমার কি পাপ ভাগ লবেন জননী॥
জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে মাতার॥
দশমাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র, না লাগে আমায়॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কৈল হেঁট মাথা।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা॥
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে, সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি॥
বিধাতা করিলা মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী।
অন্য পাপ নিতে পারি এ পাপ তেয়াগি॥
যখন করেছ তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্বদা করিবে মম রক্ষণ পোষণ॥
আর যত পাপ-পুণ্যভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এইমাত্র জানি, তুমি পালিবে আমায়॥
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে॥

ডুবিনু পাপেতে মোর কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল মুনি স্মরিয়া দুষ্কৃতি॥
লোহার মুদ্গর মুনি মাথায় মারিয়া।
ভুমির উপর পড়ে অচেতন হৈয়া॥
উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে॥
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া॥
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে॥

নিজের কর্মফল নিজেকেই ভুগিতে হইবে—ইহাই অমোঘ বিধান। সুখ-দুঃখের মূল হেতু আপন কর্ম। "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা"—কাজেই পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করা বৃথা। ঠাকুর এক শোকসন্তপ্ত শিষ্যকে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন—"এ জগতে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। কর্মসূত্রের সঙ্গে সংযোগ না থাকিলে সাপে-বাঘেও ক্ষতি করিতে পারে না। তোমার কন্যা-সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান করিলাম, তাহাতে জানিতে পারিলাম কেহ তাহার অনিষ্ট করে নাই, স্বাভাবিক কর্মফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; কাহারও রোধ করিবার শক্তি ছিল না। বৃথা চিন্তা করিয়া অনর্থক মানসিক কষ্ট ভোগ করিও না।" গৃহস্থ-জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত উপদেশ-বাণী স্মরণ করিয়া চলিলে, এইরূপ ঘটনায় মনে আর কোন দুঃখ-অশান্তি আসিতেই পারে না। কর্মসূত্রের সঙ্গে সংযোগ না থাকিলে বাস্তবিকই সাপে-বাঘেও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সুখ-দুঃখ যাবতীয় ভোগ কর্মফলেই আসে। গৃহীর মনে সর্বদাই

এই ভাবটি জাগ্রত থাকিলে, তখন আর হিংসা-দ্বেষ, দুঃখ-তাপ ইত্যাদির জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। সাংসারিক অশান্তির মূল কারণই অজ্ঞানতা—দৃষ্টির সংকীর্ণতা। জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই মানুষের মাঝে আসে তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি দৈবীগুণ। কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা স্থাপন করিতে হইবে—তবেই শান্তি মিলিবে। সাংসারিক জীবনে আমরা একে অন্যকে নানাবিষয়ে দোষারোপ করিয়া থাকি। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে আসল কারণ বা রহস্য তখন নিজের চক্ষেই ধরা পড়ে।

সংসারধর্ম যে শ্রেষ্ঠ, সকল আশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্যাশ্রমই জ্যেষ্ঠ, এই উপলব্ধি একমাত্র জ্ঞানীরই আছে—অজ্ঞানীর নহে। সংসারাশ্রমকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে,—ভোগী, অজ্ঞানী, সংসারী-গৃহস্থ তাহার মর্ম অবগত নহে। জ্ঞানী-সংসারীই সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। জ্ঞানীর সংসার আর অজ্ঞানীর সংসারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর মধ্যে প্রভেদ কোথায়, তৎসম্পর্কে ঠাকুর এক গৃহস্থ ভক্তকে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন—"বাবা! আমরা এ সংসারে খাটিতে আসিয়াছি, সকলকেই কাজ করিতে হইবে। যে যত বড়, তাহার কার্য্যভার তত গুরুতর। সংসারী—পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রের সেবা করিয়া ভগবানের সমীপে আপন কার্য্যতৎপরতার প্রমাণ দিতেছে, সেইজন্য সংসারধর্ম শ্রেষ্ঠ। বিনা সাধনেও ভগবৎকর্ম তাঁহারা সম্পাদন করিতেছেন। কিন্তু যাহার জ্ঞান আবরিত হইয়াছে, ভোগে মুগ্ধ হইয়া আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, সংসার তাহার বন্ধন। সে স্ত্রী-পুত্র আপন ভোগসুখের দ্রব্য ভাবিয়া 'আমার' মনে করিয়া বিপথে পড়িয়া কর্মফল সঞ্চয় করিতেছে।

আর জ্ঞানী স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনকে ভগবদ্দত্ত দায়িত্ব জ্ঞানে প্রাণ দিয়া তাহাদের সেবা করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করিতেছে। ভগবান্ সেই সকল নিষ্কামীকে বুকে তুলিয়া লইতেছেন। জ্ঞানীর কোন বোঝা কমিলে দুঃখের বদলে আনন্দের লহর তুলিয়া মাকে জানাইতেছে—'কালী সব ঘুচালি লেঠা'।" জ্ঞানী সংসার করে অনাসক্তচিত্তে, আর অজ্ঞানী সংসার করে ভোগাসক্তচিত্তে। একজনের চিত্ত সংসার করিয়াও নির্বিকার, আর একজনের চিত্ত সর্বদাই বিকারগ্রস্ত। জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে এই জায়গায়ই বিশেষ পার্থক্য।

গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বী প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখে প্রায়ই এই কথাটি শুনিতে পাওয়া যায় যে, অধিক বয়স পাওয়া পুণ্যেরই ফল, কিন্তু এই পুণ্যের মূল তাৎপর্য্যের কথা তাঁহারা ভাবিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না। ঠাকুর এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—"বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনিত্যতা-অসারতা বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ আসক্তিশূন্য হয়েন, তাই দীর্ঘজীবন পুণ্যের ফল বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। নতুবা ভোগের জন্য জীবনের সার্থকতা নহে।" অধিক বয়স পাওয়া পুণ্যেরই ফল ইহার অর্থ এই নয় যে, জীবনের শেষমুহূর্ত কিংবা শেষনিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া যাইতে পারিব। ভোগে বিতৃষ্ণা আসিলেই অধিক বয়স পাওয়াকে পুণ্যের ফল বলা যাইতে পারে। অধিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভোগাকাঙ্ক্ষাও অধিক হইলে, তাহাকে পুণ্যের ফল না বলিয়া পাপেরই ফল বলা উচিত। সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে যদি চিত্তে বৈরাগ্যের ভাবই উদিত না হয়, তবে অধিক বয়স লাভ করার কোনই সার্থকতা নাই। বিধিমত গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিলে প্রকৃতির নিয়মেই চিত্তে বৈরাগ্য, উদাসীনতা, নশ্বরত্ববোধ জাগ্রত হইবেই হইবে। অধিক বয়স পাইলে, বিচিত্র মিষ্ট-তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া মানুষ ভাল-মন্দ,

খাঁটি ভেজালের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে পারে—এইজন্যই অধিক বয়স পাওয়াকে পুণ্যের ফল বলা হইয়াছে। মূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া না চলিলে কেবল অধিক বয়স পাওয়াকে পুণ্যের ফল বলিয়া মনে করিলে প্রকাণ্ড ভুল করা হইবে। আদর্শগৃহীর পরিণত জীবনে ত্যাগ-বৈরাগ্য, ভগবদনুরক্তি আপনি ফুটিয়া ওঠে। সময় কর্ত্তনের জন্য তাঁহাদিগকে তাস-পাশা-দাবার আশ্রয় লইতে হয় না। শেষ বয়সের কর্ত্তব্য হইল অনাসক্ত-ভাবে গৃহে অবস্থান করিয়া ভগবদ্‌গুণমাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করা। যদি তাহা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বিধিমত গার্হস্থ্যধর্মের নিয়ম পালন করা হয় নাই। সংসারের ভিতর দিয়াই ভগবান্‌কে লাভ করার উপায় স্বয়ং ভগবান্‌ই করিয়া রাখিয়াছেন। যথাযথভাবে সংসারধর্ম পালন করিয়া গেলে পরিণত বয়সে সংসার যে অসার, সংসার যে মিথ্যা—এই জ্ঞানের উন্মেষ না হইয়াই পারিবে না। সংসার কি বস্তু সংসারাবর্তে না পড়িলে তাহার পাকা জ্ঞান লাভ হয় না। এইজন্যই সংসারধর্ম পালনের ব্যবস্থা।

গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বীকে জোর করিয়া সংসার ছাড়িতে ঠাকুর বারংবার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সংসার ছাড়া খুবই সহজ, কিন্তু সংসারাসক্তি ছাড়া বড় কঠিন। জোর করিয়া সংসারত্যাগের কোনই সার্থকতা নাই। সংসারী এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন— "জোর করিয়া সংসার ছাড়িয়া অনেকেই আবার বমিভোজনকারীর ন্যায় পুনঃ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কাজেই মনের জোর, প্রাণের বল—শ্রীভগবানের প্রেরণা না বুঝিয়া সংসার ছাড়া অপেক্ষা সংসারে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াও সংসাররসে কর্মবীজ পুষ্ট করাই কর্ত্তব্য। সাময়িক ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনাকে

ঠাকুর কোন সময়েই প্রশ্রয় দেন নাই। বরঞ্চ সংসারক্ষেত্রে পুরুষকার অবলম্বনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াও প্রত্যেক গৃহী তাহার কর্ত্তব্য কর্ম করিয়া চলুক—ইহাই ছিল ঠাকুরের সার্বভৌম উপদেশ।

কর্মক্ষেত্রে সংসারীদের পক্ষে পুরুষকারই একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু পুরুষকার কাহাকে বলে, তাহার জ্ঞান হয়ত অনেকেরই নাই। ঠাকুর পুরুষকারের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর। ঠাকুরের উপদেশানুসারে পুরুষকারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংসার করিলে মান-অভিমান-গর্বে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনও আশঙ্কাই আর থাকে না। পুরুষকারের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া ঠাকুর এক গৃহস্থ-ভক্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন। যথা—

"আমি বৈদিক সন্ন্যাসী হইলেও ঈশ্বরবিশ্বাসী, কর্মবাদী নহি। তাহার ইচ্ছাই কর্মের প্রেরক বলিয়া জানিয়াছি। সুতরাং তিনি যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার বিধানে যাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আর কাহারও শক্তি নাই যে, পুরুষকারপ্রভাবে তার ব্যতিক্রম করে। পুরুষকার আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীব কাজ করিয়া অহংপ্রভাবে কর্তৃত্বটা আপন ঘাড়ে চাপাইয়া লয়। ইতিহাস, পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও চক্ষের উপর প্রতিমুহূর্তে মানবের শক্তি, যত্ন, চেষ্টা চুলোয় যাইতে দেখিতেছি, আর তোমরা গৃহী, পুরুষকারের বড়াই লইয়া বিড়ম্বিত ও প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছিত হইতেছ। এ সংসারে জীবের সর্বতোভাবে দূরে থাক্—কোন এক বিষয়েও পূর্ণ সুখের আশা করা মহা ভুল। শোক-দুঃখ, বিরহ-বিচ্ছেদ দিয়া জগৎ গঠিত, তবে যে জীব বিদ্যুচ্চকিতবৎ এক একবার সুখের অনুভব করে, সেটা তারই অন্তরস্থ চৈতন্যের বিকাশ মাত্র। নতুবা এ জগতে তাহা নাই, যাহা নাই, তাহার যে আশা করে, সে ঘোর মূর্খ।

"মৃত্যু দিয়া যাহা গঠিত—মৃত্যুই যাহার পরিণতি, তদ্দ্বারা সুখের সম্ভাবনা কোথায়? কৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণ স্মৃতিপথে আসিলে পুরুষকার অবসাদগ্রস্ত হয় না কি? সীতা, শৈব্যা, চিন্তার কথা চিন্তা করিলে সুখের কথা মুখে আনিতে লজ্জা করে না কি? কাঁদিয়া এ জগতে আসিয়াছি, কাঁদিতে হইবে, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইব। যাহাকে যে বোঝা চাপাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা বহিতেই হইবে। তবে পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কৈ? কেবল বর্তমান, ভূত-ভবিষ্যৎ নাই। সম্মুখে যাহা পাও করিয়া যাও, সম্মুখে যাহা দেখ আমার ভাব, যে মরে তাহাকে মরিতে দাও, যে থাকে তাহাকে বুকে জড়াইয়া রাখ, আমার সংসার এইরূপ—সুখ-দুঃখ নিত্য সঙ্গী।"

পুরুষকারের উপদেশ দিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই আবার তাহার নিগূঢ়ার্থ গৃহীদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন। ঠাকুর-কথিত পুরুষকারের অর্থ বুঝিলে, তাহার প্রয়োগে মানুষ কোনদিন গর্বিত, উদ্ধত বা দুর্বিনীত হইয়া উঠে না। কর্ম করিয়া, কর্তব্য সাধন করিয়াও পূর্ণ উদাসীনভাবে সংসারে বিরাজ করিতে হইবে। ঠাকুর এইরূপ আদর্শ বীর সংসারীরই অজস্র প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সংসার করিয়া, সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া প্রত্যেক গৃহী নির্লিপ্ততার পথে আত্মজ্ঞান লাভ করুক এবং চিরশান্তির পথে প্রধাবিত হউক—ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। গৃহীভক্তদের এইভাবে গঠন করিয়া তুলিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর গৃহীদের সংসারধর্ম পালন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, ভোগপঙ্কে ডুবিবার জন্য নহে। সংসার করিয়াই গৃহী করিবে আত্মজ্ঞান লাভ, যেমন ঋষিযুগের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা করিতেন। পুরুষকারপ্রয়োগে কোন গৃহীই যেন গর্বিত-উদ্ধত হইয়া না উঠে, এইজন্য ঠাকুর পুরুষকারের প্রকৃত মর্ম বিশ্লেষণ করিয়া

বুঝাইয়া গিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে গৃহীর পুরুষকার অবলম্বন করিতেই হইবে, কিন্তু পুরুষকার বা আত্মশক্তিকেই সর্বেসর্বা মনে করিলে যে প্রকাণ্ড ভুল করা হইবে, তৎসম্পর্কেও ঠাকুর সতর্কবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। সর্বদা গৃহীদের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে—"তাঁহার ইচ্ছাই কর্মের প্রেরক।" ভগবানের ইচ্ছারই জয়গান করিয়া কর্মক্ষেত্রে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে কর্তব্যসাধন করিয়া যাইতে হইবে। কেবল পুরুষকারই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, ব্যর্থতায় তাহারা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়ে; কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছার প্রাধান্যের কথা যাঁহারা অবগত আছেন, সফলতা-বিফলতায়, সুখে-দুঃখে তাঁহাদের চিত্ত সর্বদা নির্বিকারভাবে অবস্থান করে। সম্পূর্ণভাবে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াও মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হইবার নহে। তাঁহার ইচ্ছা যেখানে মানবীয় পুরুষকারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, সেইখানেই কর্মের সার্থকতা। নতুবা কেবল পুরুষকারদ্বারা কোনদিনই মানুষ বিধিনির্দিষ্ট বিধানের ব্যতিক্রম সাধন করিতে পারে না। শ্রীগুরু-ভগবৎকৃপা এবং পুরুষকার—এই দুইটি সঙ্গী লইয়া আদর্শগৃহীকে কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যসাধন-নিরত হইতে হইবে। আত্মচেষ্টা এবং গুরুকৃপা—দৈনন্দিন জীবন-যাপনে এই দুইটিই গৃহীর পক্ষে অপরিহার্য্য অবলম্বন। নিছক আত্মচেষ্টা বা পুরুষকার দম্ভ-অহঙ্কারই সৃষ্টি করে, কিন্তু গুরুকৃপা সেই অহঙ্কারের উপর সমর্পণের ভাব আনিয়া জীবনে এক অপূর্ব মাধুর্য্যরসেরই সঞ্চার করে। পুরুষকারের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভগবৎকৃপা-উপলব্ধিই ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ। পূর্বে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাদের পুরুষকার কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহেই সার্থকতা লাভ করিত না, রাজা অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে অনেক রাজাধিরাজই পুরুষকারকে সার্থক করিয়াছিলেন—দেবতার মন্দির-প্রতিষ্ঠায়, দেব-বিগ্রহের চিরন্তন সেবায় এবং প্রজা-

সাধারণের কল্যাণে। অনিয়ন্ত্রিত পুরুষকার জগতে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অশান্তির দাবানলই সৃষ্টি করে, ভারতবর্ষের আদর্শ তাহা নহে। এইজন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর ভগবৎ-ইচ্ছাকে পুরুষকারের ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন।

— — —

অষ্টম অধ্যায়

চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম বলিয়া যজ্ঞ, দান ও তপঃরূপ কর্ম কোনমতেই ত্যাগ করিতে নাই—ইহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্তি।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যামেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

- গীতা ১৮।৫ শ্লোক

—যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম ত্যাজ্য নহে, তাহা কর্তব্যই, যেহেতু এই সকল কর্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকারক।

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম। গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বী গৃহীর ধন-সম্পত্তি উপার্জনের পথে বহুবিধ অন্যায়, দোষ বা পাপ সঞ্চিত হয়, সর্ববিধ দোষ দানধর্মদ্বারা পরিশোধিত হইয়া থাকে। এইজন্যই গৃহীর পক্ষে দানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রত্যেক গৃহীকেই দান বিষয়ে অকুন্ঠিতচিত্ত হইতে হইবে—ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। সকল ধর্মেই দানের কথা উল্লিখিত আছে। সাংসারিক আয়ের কিয়দংশ সৎকার্য্যে দানের প্রথা সকল ধর্মাবলম্বিদের মাঝেই প্রচলিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার গৃহী শিষ্যভক্তগণকে দানসম্পর্কে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অর্থই গৃহীদের উপার্জিত সম্পদ্। এই অর্থই গৃহীদের পক্ষে অনর্থের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়, যদি তাহা সদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হয়। গৃহীর মূলধন অর্থের প্রতি আসক্তিতে মানুষ পশুপর্য্যায়ে অবতরণ করে। অর্থের প্রতি অত্যাসক্তি নিন্দনীয়, কিন্তু দান করিয়া ফতুর বা ভিখারী হইতেও শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেন নাই। অর্থের অসদ্ব্যবহারেই মানুষের অধঃপতন, আর

সদ্ব্যবহারে হয় পরম উন্নতি। অর্থ জিনিসটি খারাপ নহে, আর অর্থ ছাড়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করাও অসম্ভব। যত অনর্থের সৃষ্টি হয় প্রয়োগের বা ব্যবহারের তারতম্যে। অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শিষ্য-ভক্তগণকে অবশ্যপালনীয় নিয়ম-পঞ্চকের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাই নিয়ম-পঞ্চকের মূল উদ্দেশ্য দান-ধর্মে গৃহীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। আদর্শ গৃহী ব্যতীত দানে সকলের প্রবৃত্তি হয় না। প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও অনেক গৃহী দানধর্মে কৃপণতা করেন। এই কার্পণ্য গৃহীর পক্ষে বড়ই খারাপ। কৃপণতায় মানুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। সঙ্কীর্ণ চিত্তে ধর্মপথে উন্নতিলাভ করা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহীশিষ্যদিগকে—মুষ্টিভিক্ষা-সংরক্ষণ, মাসিকপত্র "আর্য্যদর্পণ গ্রহণ, অক্ষয়তৃতীয়া ও জন্মোৎসবে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান এবং সঙ্ঘে যোগদান—এই নিয়ম-পঞ্চকের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভোগাসক্ত গৃহীকে ক্রমশঃ ত্যাগের পথে উন্নীত করাই হইল এই সব উপদেশের তাৎপর্য্য। আসক্তচিত্ত গৃহীকে ত্যাগধর্মে উন্নীত করিতে হইলে বাধ্যবাধকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্যই ঠাকুর প্রত্যেক গৃহীকে এই নিয়ম-পঞ্চক* পালনে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন —"মঠাশ্রমের জন্য সর্বাগ্রে মুষ্টিভিক্ষা সংরক্ষণ করিয়া যে-সব গৃহী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করে, তাহারা যজ্ঞাবশেষ অমৃতভোজনের ফল লাভ করিয়া থাকে।" সাত্ত্বিক অন্নভোজনের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গৃহস্থগণের মধ্যে এইরূপ নিয়ম আছে যে, তাঁহারা খাদ্যের অগ্রভাগ ভিক্ষুদের সম্প্রদান না করিয়া নিজেরা কখনই অন্ন গ্রহণ

---

* হালিসহর দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'নিয়ম-পঞ্চক' দ্রষ্টব্য।

করেন না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অর্থাৎ ভিক্ষুদের সর্বাগ্রে অন্ন পরিবেশন করিয়া তবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গৃহস্থগণ প্রসাদরূপ অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন না করিয়া, সং উদ্দেশ্যে অন্নদান না করিয়া যে-সব গৃহী অন্নভোজন করে, তাহারা রাক্ষস। রাক্ষস একমাত্র নিজের উদর পরিপূরণ ভিন্ন অন্য কিছু জানে না। অধঃপতনকারী এই রাক্ষসীভাব হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সকল শিষ্য-ভক্তকেই সাবধান থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মুষ্টিভিক্ষা-সংরক্ষণের উপকারিতা সম্পর্কে শিষ্য-ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"মুষ্টিভিক্ষা সংরক্ষণ করিতে গিয়া প্রথমেই আমার আদেশের কথা মনে হইবে। শ্রীগুরুর আদেশ-পালনের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মানস-নেত্রে শ্রীগুরুর মূর্তিকেও দেখিতে পাইবে। মঠাশ্রমের জন্য মুষ্টিভিক্ষা রাখিতে গিয়া তোমাদের ঠাকুরপ্রতিষ্ঠিত মঠাশ্রমগুলির কথাও স্মৃতিপথে উদিত হইবে। তোমাদের এই মুষ্টিভিক্ষা মঠাশ্রমে শ্রীগুরু-সেবার কার্য্যেই লাগিবে। গুরুপ্রসাদ ভক্ষণে তোমাদের ত্যাগী-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ভাইগণ এবং অতিথিবৃন্দ পরিপালিত হইবে। সুতরাং তোমাদের এই ক্ষুদ্র দানে কত মহৎ কার্য্য সাধিত হয়, তাহা তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ।" নিয়ম-পঞ্চকের অন্যান্য আদেশ-পালনেও যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভোগাসক্ত গৃহীদের এইভাবে সহজসাধ্য ত্যাগের পথে উন্নীত করাই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের মূল উদ্দেশ্য। ত্যাগের পথে উন্নত হইয়া প্রত্যেক গৃহী ক্রমশঃ মনুষ্য জীবনলাভের চরম সার্থকতা সম্পাদন করুক—ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা।

"সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে"—কলিযুগে সংঘশক্তি ব্যতীত টিকিয়া থাকিবার উপায় নাই। সারস্বত সংঘান্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গৃহীকে

শ্রীশ্রীঠাকুর সংঘবদ্ধ হইয়া চলিবার বিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সংঘশক্তি সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই ঠাকুর শতমুখে গুরুবাদী শিখদের কথা উল্লেখ করিতেন। সংঘই শিখতন্ত্রের বিশেষত্ব। শিখ অর্থ সংঘবদ্ধ হিন্দু। তাই শিখজাতি এত শক্তিশালী —তাজা। শিখদের বিক্রমে মোগলসাম্রাজ্য উড়িয়া গিয়াছিল, পাঠানরা ঘরের বাহির হইতে পারে নাই। সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলেই শিখজাতির মধ্যে এইরূপ অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। সমাজের শক্তিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পরস্পরকে বিনষ্ট করে। তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া একই পথে চালিত করার নামই—সংহতি। একই কেন্দ্রীয় শক্তির আদেশ প্রতিপালন করিবার যে শিক্ষা তাহার নাম সংঘবন্ধন। গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিয়া গিয়াছেন—

সংঘ মেরে রূপ হৈ খাস।
সংঘ মহুঁ করুঁ নিবাস॥
গুরু সংঘ সংঘ গুরু।
আবতে হুয়ী ঐ সা বিধি স্বরু॥

—গীতগোবিন্দ

শিখ সংঘতেই গুরুর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সঙ্ঘের সেবা ছাড়া শিখের পক্ষে আর কোন উচ্চতর কর্ত্তব্য নাই। ঠাকুরও এইভাবে তাঁহার প্রত্যেক গৃহীশিষ্যকেই সপ্তাহে একবার সংঘে মিলিত হইবার উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যেখানে অন্ততঃপক্ষে তিন জন শিষ্য আছে, সেখানেই একটি সংঘ প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সংঘসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গৃহীদের লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত উপদেশবাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহীরই উপদেশবাণীগুলি স্মৃতিপথে উজ্জ্বল রাখিয়া সাংসারিক জীবনযাপন করা কর্ত্তব্য।

"আমার নিয়ম হচ্ছে, যেখানে অন্ততঃ তিন জন ভক্ত থাকবে, সেখানে এক একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ যত সহজে হয়, একা একা তা হওয়া অসম্ভব। 'সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে'—কলিযুগে সংঘশক্তি প্রবল। এক লক্ষ্য বা ইষ্টসিদ্ধির কারণ সকলের প্রাণে সমভাবে আকুলতা জাগলে সংঘের সৃষ্টি হয়, আর তার শক্তিও হয় অমোঘ। মনে রেখো, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য এক, তোমরা একই গুরুর শিষ্য—তোমাদের সাধনাও এক। তোমরা মনে করো এক পরিবারের ভাই-ভগ্নী এবং একই পিতার সন্তান তোমরা। এতে তোমাদের অনৈক্য, মতদ্বৈধ, ক্ষুদ্র অশান্তি—সব দূরে যাবে—তোমরা আনন্দের প্লাবনে ভাসবে। প্রাণের নিবিড় আকর্ষণে একত্র হতে পারলে, জগতে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। তোমরা সপ্তাহে একটি বিশিষ্ট দিনে একত্র হবে। প্রত্যেক অধিবেশনে ঠাকুরের আসন স্থাপন করে, তাঁকে গুরুজ্ঞানে প্রণাম, আরতি, পূজা, স্তোত্রপাঠ, কীর্তন-বন্দনা ক'রে তারপর ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করতে হবে। ভগবদ্-বিষয়ে আলোচনা, মঠাশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের উপায়চিন্তন সংঘের অবশ্য কর্তব্য। আশ্রমগুলি গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কি সত্য নিহিত আছে, তা তোমরা আলোচনা করবে। জেনে রেখো, বড়লোকের মোটা রকমের এককালীন দান দিয়ে মঠাশ্রমের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। আশ্রমের উদ্দেশ্য লোক তৈরি করা। একজন ধনী যদি একটি আশ্রম তৈরি ক'রে দেয় ও তার ব্যয়নির্বাহের জন্য বিপুল অর্থ দান করে, তাতে বিশেষ কিছু উপকার হয় না, কারণ হয়ত তার এক কোটি টাকার সম্পত্তি আছে—দশ বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি আশ্রম তৈরি করে দিলে তাতে তার বিশেষ কিছু ত্যাগ-

স্বীকার হয় না। অন্যেরও তাতে কিছু উন্নতি হয় না। শুধু হাতে দশজন মিলে যদি একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান ক'রে তিলে তিলে তাকে গড়ে তুলা যায়, তবে সেই দশজন হয়ত দশহাজার লোকের নিকট ভিক্ষার্থে যায়, সেই দশহাজার লোককে আশ্রমের উদ্দেশ্য বুঝায়। তারাও আশ্রম-মঠের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা বুঝ্‌তে পেরে ত্যাগস্বীকার কর্‌তে উদ্বুদ্ধ হয়। এইভাবে দশহাজার লোক উন্নত হয়। তোমরা আশ্রমের জন্য ভিক্ষা কর, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা আশ্রমেব জন্য ভিক্ষা করছ কেন? আশ্রমের জন্য ভিক্ষা ক'রে লাভ কি? তোমবা বলো—'সেবাসহায়ে চিত্তশুদ্ধিই আমাদের উদ্দেশ্য।' তোমবা যাবা গৃহী, তারা এইভাবে এইসব ত্যাগী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী-কর্মীদের সাহায্য কর, গৃহে থেকে নিঃস্বার্থতা শিক্ষা কর। আমি বলছি গৃহীদের এই একমাত্র পথ—নান্যঃ পন্থা।

"বড়লোকের মোটা দান দিয়েই যদি আশ্রম মঠ গড়ে তোলা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, তবে অতি অল্প সময়েই আমি শত শত আশ্রম-মঠ গড়ে তুল্‌তে পারতাম। যোগৈশ্বর্য্য দিয়ে কোন ধনীকে আকর্ষণ ক'রে তাকে দিয়ে সব করিয়ে নিতে পার্‌তাম, আব এইরূপ ধনী অনেক সময় স্বেচ্ছায় অর্থ ও সম্পত্তি দিতেও চেয়েছে, কিন্তু আমি তাতে রাজী হই নি। কারণ ওতে ফল স্থায়ী হয় না এবং জগতেরও উপকার হয় না। দু'দিন জল্ জল্ ক'রে পরে নিভে যায়। আর এক কথা, ওতে জগতের কর্মধারা জোর ক'রে প্রতিরোধ করায় সুফল হয় না। আমি চাই তোমাদের ধীরে ধীরে, তিলে তিলে গড়ে নিতে—ছোট থেকে বড় করতে। জগতে যা কিছু বড়, সবই ছোট হতে বড় হয় এবং তা-ই টিকে যায়। তোমরা নিজেরা অভাবী হও, যে গ্রামে তিনজন গুরুভাই আছ, তাদের বাড়ীতে

দৃষ্টিভিক্ষার প্রবর্তন কর। একস্থানে মাঝে মাঝে একত্রিত হও—এতেই কাজ হবে। এমন একদিন আসবে যখন বড় বড় লোক তোমাদের আশ্রম-মঠ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হবে। সত্যের আদর চিরদিনই সমান।

'সঙ্ঘে একত্রিত হয়ে তোমরা ভাব-বিনিময় এবং আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনসম্পর্কে আলোচনা করবে। ঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যে-রকম সংযম, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত উপবেশন, কথোপকথন ও ব্যবহার কর, সঙ্ঘেও তাই করবে। মনে করবে ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ রয়েছেন এবং তোমাদের কার্য্যকলাপ সব প্রত্যক্ষ করছেন। সঙ্ঘে একজন প্রেসিডেণ্ট এবং একজন সেক্রেটারী থাকবে। প্রতি বৈঠকে পরবর্তী বৈঠকের স্থান এবং কাল নির্বাচিত হবে। তোমরা যদি ঠিক ঠিক সঙ্ঘের অধিবেশন করতে পার, তাহলে অচিরেই তার ফল লাভ করবে। সুষ্ঠুভাবে সঙ্ঘাধিবেশন করলে গুরুকৃপার প্লাবন না এসেই পারবে না। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সঙ্ঘ সাফল্যমণ্ডিত হোক।

"যখনই গুরুভাই-ভগ্নী একত্র হবে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করবে। সাধনপথে কে কতদূর অগ্রসর হচ্ছ, কি বাধা, কি অনুভূতি, কি আনন্দ পাচ্ছ, কি পরিবর্তন লক্ষ্য করছ—এসব বিষয় আলাপ-আলোচনা করবে। এতে একে অলক্ষ্যে অন্যের সাধনপথে সহায়ক হবে, নিজেদের ভুল-ত্রুটী-দোষের দিকে নজর পড়বে। পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় অধ্যাত্ম-রাজ্যের বন্ধুর সিঁড়িগুলি অনায়াসে পার হয়ে যাবে।

"আর আমি চাই—তোমরা আদর্শ গৃহী হও! শুধু সন্ন্যাসী হয়ে বনে গেলেই ভগবান্ লাভ হয় না। গৃহে থেকে আদর্শ গৃহী হয়ে কর্মসাধন করলেও ভগবান্ লাভ হয়। আমি সেই কথাই প্রচার

করতে চাই। তোমরা শরীরে, মনে, ভাবে, কাজে, চিন্তায় সৎ হও, বলিষ্ঠ হও, গরিষ্ঠ হও, সত্যকে আশ্রয় ক'রে চল—এক সত্যই তোমাদের সব দিতে পারে। সংসারে সব থাকবে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নী, বিষয়-আশয়, বাড়ী-ঘর, অর্থ, নাম-যশ , কিন্তু তোমরা থাকবে নির্লিপ্ত। তোমরা ভগবানের দাস হয়ে, সব তাঁরই জেনে সুষ্ঠুভাবে তাঁরই কাজ ক'রে যাবে। বাইরে এ সব তোমার বলবে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে জানবে এরা তোমার কেউ নয়—সব ভগবানের। এই ভাবই তোমাদের কর্মবন্ধন হতে মুক্ত করবে। এমন মধুর ব্যবহার এবং অমায়িক আচরণ তোমরা দেখাবে যেন সকলেরই আদরের এবং ভালবাসার পাত্র হতে পার। স্ত্রী মনে করবে এরূপ স্বামী আর হয় না, পুত্র-কন্যা মনে করবে এমন পিতা কারো মিলে না, ভাই মনে করবে এমন দাদা কারো থাকে না, পিতা-মাতা মনে করবে এমন পুত্র কারো জন্মে না, বন্ধু মনে করবে এমন বন্ধু কারো হয় না, জমিদার মনে করবে এমন প্রজা আর নাই, প্রজা মনে করবে এমন জমিদার আর নাই। সংসারে যার যে-টুকু পাওনা তাকে সেটুকু কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিবে, অথচ স্বীয় লক্ষ্যে অটুট থাকবে—এই হচ্ছে আদর্শ গৃহস্থের লক্ষণ।

"সংক্ষেপে আমি সঙ্ঘ, ভাববিনিময় এবং আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন-সম্পর্কে আভাস দিলাম। তোমরা আগে নিজ নিজ পরিবারে আমার আদর্শকে রূপ দাও, পরিবারের আদর্শ তখন গ্রামে, গ্রামের আদর্শ দেশে, দেশের আদর্শ মহাদেশে, শেষে সমগ্র জগতে তা ছড়িয়ে পড়বে। আমার আদর্শকে রূপ দেওয়াই তোমাদের সাধনা,—মুক্তি-মোক্ষের জন্য তোমাদের চিন্তা নাই, তোমরা আমার কাজ ক'রে যাও—অন্তিমে আমি তোমাদের সকল ভার, সকল বোঝা বহন করব।"

প্রত্যেক গৃহী উপরোক্ত উপদেশ-বাণী শিরোধার্য্য করিয়া আদর্শ গৃহীর কর্তব্য আচরণ করিয়া সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন —শ্রীগুরু-চরণে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। সমাজে আদর্শ গৃহীর অভাব হওয়াতেই সকল দিকে অমঙ্গলের বাতাস বহিতেছে। শ্রীগুরু ভগবৎকৃপায় মুষ্টিমেয় গৃহী ভক্তদের প্রাণেও যদি আদর্শ প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা জাগিয়া উঠে, অচিরে তাহার ব্যাপক ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। সম্যকভাবে গৃহস্থজীবন যাপনে মানুষ আধ্যাত্মিক পথের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে—সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরেরও এই অভিমত ছিল। আদর্শ গৃহস্থদ্বারাই জাতির পুনরভ্যুত্থান হইবে, সদগুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত এই আশ্বাসবাণী এখনও কানে কানে ঝঙ্কার দিয়া ফিরিতেছে।

আলোচ্য প্রসঙ্গের পরিপূরক হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ-বাণীর ছন্দোরূপ মদীয় সতীর্থ শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত "মিলন-বাণী" ১ম খণ্ড হইতে আদর্শ গৃহী শীর্ষক কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আদর্শ গৃহস্থ যদি হতে চাও সবে।
ঠাকুরের উপদেশ মেনে নাও তবে॥
প্রতি গৃহে সংস্থাপিয়া গুরুর আসন।
সকাল সন্ধ্যায় কর পূজন-বন্দন॥
শুচি শুদ্ধ থাক সদা অন্তরে বাহিরে।
সর্বদা প্রচেষ্টা কর সাম্যাবস্থা তরে॥
ব্যবহারে হও সবে কুসুমকোমল।
কর্তব্য সাধনে হও অচল অটল॥

সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু বিরহ-মিলন।
যাহাই আসুক কর সানন্দে বরণ॥
সাধ্যমত জীবসেবা কর সযতনে।
অতিথিসৎকার কর নারায়ণ-জ্ঞানে॥
সকলের সাথে কর মধুর ব্যবহার।
স্নেহ প্রীতি দিয়া বাঁধ অন্তর সবার॥
পিতা যেন মনে করে হেন ছেলে নাই।
ছেলে ভাবে হেন পিতা নাহি কোন ঠাঁই॥
দাদা ভাবে নাহি ভবে কারো হেন ভাই।
ভাই ভাবে হেন দাদা কোনখানে নাই॥
পত্নী ভাবে পতি মোর জগতের আলো।
বন্ধু ভাবে বন্ধু মোর সব চেয়ে ভালো॥
প্রভু ভাবে হেন ভৃত্য কোনো দেশে নাই।
ভৃত্য ভাবে প্রভু মোর চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রতিবেশী ভাবে হেন প্রতিবেশী কোথা?
দেশবাসী ভাবে এই-ই মানুষ সর্বথা॥
রাজা ভাবে হেন প্রজা রাজ্যমাঝে নাই।
প্রজা ভাবে হেন রাজা বলিহারি যাই॥
এই ভাবে যার যাহা প্রাপ্য তাহা দিয়া।
থাক বীর অহর্নিশ আনন্দে মাতিয়া॥
বাহিরে দেখাবে সবে মায়া-ব্যবহার।
অন্তরে বুঝিবে খাঁটী কেহ নহে কা'র॥
দু'দিনের তরে হেথা বাঁধিয়াছ বাসা।
আহ্বান আসিলে যেতে হবে যে সহসা॥

আসক্তি থাকে না যেন হেথা কারো প্রতি।
থাকে যেন সর্বদা তাঁহাতেই রতি ॥
দিবানিশি শ্রীগুরুর গুণগান গাহি।
কর্তব্য সাধন কর হে আদর্শ গৃহি ॥

নবম অধ্যায়

নারী-জীবনের পূর্ণ সফলতা—মাতৃত্বে। কিন্তু গভীব পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্যের হাওয়া লাগিয়া সমাজের কুললক্ষ্মীগণ এখন মাতৃত্বকে অভিশাপের বস্তু বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। বিজ্ঞানের কল্যাণে গর্ভনিরোধের যে ক্ষতিকর উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এখন কেহই সন্তান-পালনের দায়িত্ব গ্রহণে আর ইচ্ছুক নহেন। প্রাচীন যুগে ব্রতনিয়ম পালনে, সংযম-তপস্যায় মানুষের চিত্তে আপনি নিবৃত্তির ভাব জাগিয়া উঠিত, এইজন্য তাহাদিগকে আব কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে নিরোধের পথ আশ্রয় করিতে হইত না। ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা আমরণ বাখিয়া, সন্তানপালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের এই যে সর্বনাশা কুপ্রথা—তাহাতে সমাজের গতি কোন্ দিকে চলিয়াছে মুখে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও সকলেই তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। বিবাহের অর্থই হইল—স্ত্রী ও অপত্য-পালনের ভাব লইবার প্রতিশ্রুতি। যাবজ্জীবন তাহাদিগকে যত্ন ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি বিবাহের দ্বারাই রক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এটর্নী কর্তৃক লিখিত "নারী (পাশ্চাত্যসমাজে ও হিন্দুসমাজে) পুস্তকখানা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যুক্তি-বিচার এবং প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের কল্যাণকর প্রথা এবং পাশ্চাত্যের সমাজধ্বংসকারী কু-প্রথার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন। বিবাহসম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—"যাবৎ কোন পুরুষ প্রতিশ্রুতি না দেয় অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ না করে, তাবৎ তাহার সহিত কাম-উপভোগে

অসহযোগিতা করাতেই (Non-co-operation) পুরুষদিগকে স্ত্রী ও সন্তান পালনের ভার লইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে কাম-উপভোগে অসহযোগিতা করাই—সতীত্বের প্রধান অঙ্গ। বিবাহ ব্যতিরেকে নারীদিগের কাম-উপভোগ করার ফলে যখন বিবাহসংখ্যাই কমিয়া যায়, নারীদিগের অশেষ দুর্গতি হয়, অথবা অপর নারীর গৃহদাহ হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সতীত্বই নারীদিগের দুর্গতিমোচনের প্রধান উপায়, তাহাই তাহাদিগের প্রধান ধর্ম, ঠিক যেমন সৈন্যদিগের প্রধান ধর্মই—নিয়ম ও আজ্ঞা প্রতিপালন করা। তজ্জন্যই হিন্দুরা সতীত্বের এত অধিক গৌরব করিয়াছিলেন—তাহা নারীদিগের মঙ্গলের জন্যই, পুরুষদিগের সুবিধার জন্য নয়।

"আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পরার্থপরতার প্রথম প্রকাশ হইয়াছে —মাতৃত্বে। পরার্থপরতার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঘনীভূত প্রকাশই ভালবাসা নামে অভিহিত। তাহাই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ, তাহাই জীবনকে মধুময় করে—তাহাতেই জীবনে তৃপ্তি পাওয়া যায়—পরের জন্য কষ্টস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি দেয়; ভালবাসার অভাবে অশেষ ভোগসুখের অধিকারী ক্রোড়পতিরাও পাশ্চাত্যে আত্মহত্যা করে। সুতরাং যাহাতে সকল লোকই ভালবাসা পায়, সেরূপ বিধান থাকা বিধেয়। স্ত্রীজাতিতেই প্রথম ভালবাসার প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং নারীরাই অধিক ভালবাসাপ্রবণ, তাহারা এত অধিক ভালবাসার প্রয়াসিনী যে, কবি "বায়রন্" ভালবাসাই নারীর জীবন বলিয়াছেন। সুতরাং যে সমাজে নারীরা যাহাতে ভালবাসা পায় ও ভালবাসিতে পারে তাহার বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে, সেই সমাজই প্রকৃত নারীশুভানুধ্যায়ী ও হিতকারী।

"ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ; তাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায় মাতার ভালবাসায়, স্ত্রী ও স্বামীর ভালবাসায়, পিতার ও সন্তানের ভালবাসায়। জীবজগতে ভালবাসার প্রথম প্রকাশ হইয়াছে—মাতাতে। যে সকল জীব কাম-উপভোগে যথেচ্ছাচারী, তাহাদিগের স্ত্রী ও পুংজন্তুর প্রায় কোন ভালবাসা দেখা যায় না—পুংজন্তুরও শাবকদিগের প্রতি কোন ভালবাসা দেখা যায় না, শাবকদিগের পিতৃমাতৃ-জন্তুর প্রতি কোন ভালবাসা দেখা যায় না—কিন্তু মনুষ্যের সন্তানদিগের মাতা ও পিতার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা দেখা যায়। সন্তানদিগের ভালবাসায় মাতাপিতার জীবনে কি সুধা বর্ষণ করে, তাহা যাহাদিগের সন্তান হয় নাই তাহারা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং তাহা পাওয়ারও সমাজের বিধান থাকা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

"অপত্যপালন হইতে সহ্যগুণের ও কষ্টসহিষ্ণুতার বিকাশ হয়। অপত্যদিগের ভাবী দুঃখকষ্ট নিবারণ করার জন্যই পিতা-মাতারা ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিতে শিখে। তাহার জন্য কষ্টস্বীকার করে—পক্ষীরা নীড় বাঁধে—লোকে সঞ্চয়শীল হয়—সতর্কতারও বৃদ্ধি হয়। সেইজন্যই দেখা যায়, অবিবাহিতরা সচরাচর মিতব্যয়ী হয় না—তাহারা হঠকারী হয়। অবিবাহিতরা খালি জাহাজের মত অল্প তুফানে বিপর্য্যস্ত হয়—জাহাজের পক্ষে ভারের (Ballast) মতন স্ত্রী বা স্বামীর অপত্যের একান্ত আবশ্যক। বিবাহের পর—অপত্য জন্মাইবার পর, লোক শুধু নিজের জন্য কার্য্য করে না—নিজের স্ত্রী বা স্বামী ও অপত্যদিগের সকলের শুভাশুভ দেখিয়া কার্য্য করে অর্থাৎ আমিত্বের প্রসার হয়—আমি যেন শুধু আমি থাকি না—স্ত্রী বা স্বামী, অপত্য ও আমি সকলকে জড়াইয়া যেন এক বড় আমি হই।

"বেদান্তমতে এই আমিত্বের প্রসার যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়, যখন আমার ইচ্ছা, চিন্তা বা কার্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হয়, তখনই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'তত্ত্বমসি' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সম্যক্ উপলব্ধি হয়—তাহা স্থায়িভাবে হওয়াই মুক্তি। আমাদিগের উন্নতির চরম লক্ষ্যই সেই উপলব্ধিতে, তখনই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়—পরমানন্দ-উপভোগ হয়। এই আমিত্বের প্রসারই উন্নতির মাপকাঠি। আমরা যখন স্বামী বা স্ত্রী অপত্যদিগের প্রগাঢ় ভালবাসার ফলে আমার পৃথক্ ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া তাহার সহিত একীভূত হই, তখনই আমরা জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হই। ইহাই আমিত্বের প্রসারের সুখ—সমাধি-অবস্থায় সকলের সহিত একীভূত হওয়ার সুখের স্বল্প আভাস মাত্র।

"বিবাহই এই আমিত্ব-প্রসারের প্রধান ও সহজ উপায়। এই প্রসারপ্রাপ্তি হিন্দুর জীবনের প্রধান লক্ষ্য—তাহাই প্রকৃত উন্নতি বলিয়া গণ্য। প্রকৃতির ধারা পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রসারপ্রাপ্তি বিবাহের দ্বারা সহজে হয়। সেইজন্য হিন্দুমতে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার। বিবাহ আদিকাল হইতে আছে বলিয়া মনুষ্যসমাজে পরার্থপরতার সহজ বিকাশ হইতে পাইয়াছে—মনুষ্যসমাজ এত উন্নত হইয়াছে।

"আমাদিগের দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শই ভিন্নরূপ—ইহা শান্ত, স্নিগ্ধ, ধীর, গভীর, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ সহানুভূতিযুক্ত। ইহাতে কর্ত্তব্যজ্ঞান কখনও শিথিল হয় না, বরং দৃঢ়ীভূত হয়—সুখের সময় সংযম—ইহা অন্তঃসলিলা প্রবাহের মত অন্তরে প্রবাহিত হইয়া হৃদয় ও মনকে সরস ও সতেজ করে, কোন দুঃখ-কষ্ট-দৈন্য জীবনকে শুষ্ক-কঠিন করিতে পারে না—দুঃখের সময় ইহার পূর্ণপ্রকাশ। আমরা বাল্যকালে

বিবাহিত হইয়া দুজনে একত্রে বর্দ্ধিত হই—আমাদিগের ভালবাসা ডাবের জলের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে উদ্ভূত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। এইজন্যই কবিগুরু বাল্মীকি রাম ও সীতার প্রেম-উপভোগের কোন বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু যখন রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে বনবাসের আজ্ঞা পাইলেন এবং সেই পিতৃ-আজ্ঞা ও রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন সীতা তাহাতে কোন দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, প্রতিবাদও করেন নাই, প্রায় ভীমরতিগ্রস্ত স্ত্রৈণ দশরথের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই, রাজপিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বলেন নাই। রামচন্দ্রের পক্ষে তখন সবলে রাজসিংহাসন অধিকার করা অতি সহজ ছিল—তাহার জন্য রামচন্দ্রকে প্ররোচিত করেন নাই। বহুদাসদাসীপরিবৃতা নানাপ্রকার বিলাসিতায় ও ভোগসুখে অভ্যস্তা সীতা রামচন্দ্রের সেই দুঃসময়ে সকলের—রামচন্দ্রেরও—বনবাসের অশেষ বিভীষিকা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বনবাসের অশেষ কষ্ট অকুণ্ঠিতচিত্তে বরণ করিয়া রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইলেন। এইরূপ স্বার্থশূন্য আত্মহারা ভালবাসাই আমাদিগের আদর্শ।

"এ দেশের নারীরা ঠিক পুরুষের সহচরী ছিলেন না—হইতেও চাহেন নাই। স্ত্রীরা সহধর্ম্মিণী—অর্থাৎ কি সংসার-ধর্ম্মে, কি তার পারলৌকিক ধর্ম্মে সহযোগিনী ছিলেন—তাঁহারা পুরুষদিগের অবসরকালে আমোদ-প্রমোদ, গল্প-গুজবে সচরাচর মিশিতেন না, তাহাতে সাহচর্য্য করিতেন না।"

ভারতবর্ষের নারীরা যথার্থ সহধর্ম্মিণীই ছিলেন। স্বামীর সুখেই ছিল তাঁহাদের সুখ। তৎসুখসুখিত্বম্"—ইহাই ছিল সতী-নারীর জীবনের একমাত্র কাম্য। এই আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়াই সীতা বনবাসের যাবতীয় দুঃখকে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

বাল্মীকি-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাসগমনে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সীতা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের নারী-মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য। নিম্নে সীতা-কথিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম ; যথা—

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥ ২৭।৬

—"নারীর ইহকালে বা পরকালে সর্ব্বদা পতিই গতি ; কোনকালেই পিতা, পুত্র, আত্মা, মাতা, সখীজন—কেহই তাহাদিগের আশ্রয়স্থান নহে।

যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্॥ ২৭।৭

—"রঘুনন্দন! যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে যাও, তবে আমিও কুশ-কণ্টকসকল মর্দ্দন করতঃ তোমার আগে আগে যাইব।"

প্রাসাদাগ্রৈর্ব্বিমানৈর্ব্বা বৈহায়সগতেন বা।
সর্ব্বাবস্থাগতা ভর্ত্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে॥ ২৭।৯

—"স্বামী সদবস্থ বা দুরবস্থ হউন, তাঁহার পদতলে থাকাই নারীর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখজনক বস্তুসমুদায় এবং অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি অপেক্ষাও সমধিক সুখজনক।"

অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্।
নাস্মি সম্প্রতিবক্তব্যা বর্ত্তিতব্যং যথা ময়া॥ ২৭।১০

—"স্বামীর প্রতি আমার যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা মাতা-পিতা আমাকে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, এক্ষণে তোমায় আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না।"

ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ।
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া মম নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে॥ ২৭।২১

—"রঘুনন্দন! আমি এইরূপে তোমার সহিত শত বা সহস্র বৎসরকাল বনে বাস করিতেও কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিব না, কিন্তু তোমা ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার বাঞ্ছিত হইবে না। নরব্যাঘ্র! তোমার সঙ্গরহিত হইয়া স্বর্গেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তথাপি তাহাতে আমার অভিরুচি হইবে না।"

যে ত্বয়া কীর্ত্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা॥ ২৯।২

—"রঘুনন্দন! তুমি বনবাস বিষয়ে যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিলে, আমার প্রতি স্নেহ থাকা প্রযুক্ত, সেই সমস্ত দোষই আমার পক্ষে গুণবৎ হইবে, ইহা তুমি জানিও।"

পতিহীনা তু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্।
কামমেবংবিধং রাম ত্বয়া মম নিদর্শিতম্॥ ২৯।৭

—"প্রভো! তুমি আমাকে তোমার বিরহ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে উপদেশ দিলে, কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী পতিবিহীনা হইয়া জীবনধারণ করিতে পারেন না।"

শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিষ্যামি বিকল্মষা।
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্ত্তা হি মম দৈবতম্॥
প্রেত্যভাবে হি কল্যাণঃ সঙ্গমো মে সদা ত্বয়া।
শ্রুতির্হি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্॥
ইহলোক চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্ম্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা॥ ২৯।১৬-১৮

—"বিশুদ্ধাত্মন্ স্বামিন্! তুমিই আমার দেবতা; সুতরাং প্রণয়-প্রযুক্ত তোমার অনুগমন করিয়াই আমি নিষ্পাপা হইব এবং পরলোকেও তোমার সহিত সুখজনক সমাগম লাভ করিব; যেহেতু, মহামতে! আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা-মাতা

প্রভৃতি প্রতিপালকবর্গকর্ত্তৃক স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে যে স্ত্রী যে পুরুষে প্রদত্তা হন, সেই স্ত্রী ইহলোকে যেমন সেই পুরুষেরই থাকেন, সেইরূপ পরলোকেও তাঁহারই থাকেন।"

এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সুবৃত্তাং হি পতিব্রতাম্।
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা॥
ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখদুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখদুঃখিনীম্॥ ২৯।১৯-২০

—"কাকুৎস্থ! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; তুমি কেন আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার করিতেছ না? স্বামিন্! আমার চরিত্রে কিছুমাত্র দোষ নাই—আমি তোমাকে ভজনা করতঃ তোমারই সুখে সুখ ও তোমারই দুঃখে দুঃখবোধ করিয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম পালন করিতেছি, সুতরাং আমাকে সমভিব্যাহারে লওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্॥
ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং প্রেক্ষিতাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী॥ ৩০।৬-৭

—"নিষ্পাপ রঘুনন্দন! তুমি ইহা জানিও যে, যেরূপ সাবিত্রী বীর্য্যসম্পন্ন দ্যুমৎসেন-নন্দন সত্যবানের বশবর্ত্তিনী ছিলেন, আমিও তদ্রূপ তোমার বশবর্ত্তিনী; আমি কুলনাশিনী কামিনীর ন্যায় মনেও অপর পুরুষকে সন্দর্শন করি না; অতএব আমি তোমা ব্যতিরেকে এখানে থাকিতে পারিব না; আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত যাইব।"

স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বারণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ॥ ৩০।১০

—"স্বামিন্! তোমার সহিতই আমার তপোনুষ্ঠান বা স্বর্গে কি অরণ্যে বাস করা উচিত, অতএব আমাকে সঙ্গে না লইয়া তোমার বনগমন বিধেয় নহে।"

কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥ ৩০।১২

—"তোমার সহিত যাইবার সময় পথের কুশ কাশ, শর, ঈষিকা, কণ্টক, লতা ও বৃক্ষসকল আমার পক্ষে তুলা ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ হইবে।"

শাদ্বলেষু যদা শিশ্যে বনান্তে বনগোচরা।
কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ॥ ৩০।১৪

—"স্বামিন্! তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণ-শয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাস্তরণে শোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক সুখজনক হইতে পারে?"

যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ॥ ৩০।১৮

—তোমার সমীপে বাস করাই আমার স্বর্গধাম এবং তোমা ব্যতিরেকে বাস করা আমাব নরকবাস। আমার এরূপ দৃঢ় প্রণয় জানিয়া তুমি আমার সহিত বনগমন কর।"

সতী-সাধ্বী পতিব্রতা নারী সীতার মুখ হইতে যে বাণীগুলি নির্গত হইয়াছে—ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ নারার উক্তি। নারী-জীবনের সার্থকতা এই অতুলনীয় ত্যাগে। স্বামীর সঙ্গে স্ফুর্ত্তি করিতে যাওয়া পতিব্রতা নারীর কাম্য নহে। পতিব্রতার নিকট পাতিব্রত্যধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্মই যথাযথভাবে পালন করিতে হইলে চাই ত্যাগ—আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন। পতিব্রতা রমণীগণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম কি—

এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে পর পর কয়েকটি শ্লোকে সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। যথা—

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণম্॥ ৭।১১।২৫

—পতির সেবা, পতির অনুকূলতা, পতির পিতা-মাতা প্রভৃতি স্বজনগণের অনুবর্ত্তিতা এবং সর্ব্বদা পতির নিয়মধারণ, এই চারিটি পতিব্রতা স্ত্রীলোকের লক্ষণ ও ধর্ম্ম।

সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্ত্তনৈঃ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা॥ ৭।১১।২৬

—সাধ্বী স্ত্রী গৃহের সম্মার্জ্জন, উপলেপন ও সাজসজ্জায় গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিবেন, স্বয়ং অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতা হইবেন, প্রত্যহ গৃহসামগ্রীগুলি ঘর্ষণমার্জ্জনাদির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখিবেন।

কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্ণা কালে কালে ভজেৎ পতিম্॥ ।১১।২৭

—এই সকলের দ্বারা এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্য ও প্রিয়বাক্য এবং প্রেমের দ্বারা সর্ব্বদা পতির ভজনা করিবেন।

সন্তুষ্টাহলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥ ৭।১১।২৮

—পতিব্রতা রমণী যথালাভে সন্তুষ্টা, লোভশূন্যা, আলস্যশূন্যা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয় ও সত্যভাষিণী, সাবধানা, পবিত্রা ও পতির প্রতি প্রীতিসম্পন্না হইয়া অপতিত পতির ভজনা করিবেন। আর পতি মহাপাতকী হইয়া পতিত হইলে তাহার শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে॥ ৭।১১।২৯

—হে রাজন্। যে রমণী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইয়া শ্রীহরিজ্ঞানে পতির ভজনা করেন, তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় হরিস্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

আদর্শ গৃহস্থের সংসারে চাই এইরূপ আদর্শ নারীর অভ্যুদয়। দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আদর্শ সংসার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সাধনাতেই সুগঠিত হইয়া উঠে, এই জন্যই আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্ত্তব্য সমান। কাহারও ঔদাসীন্য বা অবহেলা থাকিলে আদর্শ সংসারের অনবদ্য রূপ ফুটিয়া উঠে না। গৃহস্থ জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর এইজন্যই স্বামী স্ত্রী উভয়ের আদর্শ এবং কর্ত্তব্যসম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

পতিব্রতা নারীর নিকট পতিই যে একমাত্র পরম দেবতা, কশ্যপ তদীয় পত্নী দিতিকেও এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।
মানসঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ॥
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্॥
তস্মাৎ পতিব্রতা নার্য্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে।
যজন্তেঽনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্॥

—৬।১৮।৩৩-৩৫

—"নারীদিগকে পতিই পরমদেবতা—ইহা শাস্ত্রসম্মত। সর্ব্বভূতের হৃদয়বাসী সেই শ্রীপতি ভগবান্ বাসুদেবই নামরূপ পার্থক্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত বিবিধ দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুরুষদিগের নিকট এবং পতি-রূপধারী হইয়া স্ত্রীলোকের নিকট পূজিত হন। অতএব হে সুমধ্যমে!

মঙ্গলার্থিনী পতিব্রতা নারীগণ, পতিকে আত্মা এবং ঈশ্বর বোধে পূজা করেন।"

কশ্যপ দিতিতে লক্ষ্য করিয়া বলিযাছিলেন—"তুমি আমার নিকট পুত্রকামী হইয়া আসিযাছ। আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব, কিন্তু ইন্দ্রহন্তা পুত্র লাভ করিতে হইলে একবৎসরকাল তোমাকে পুংসবন-ব্রত অস্খলিতভাবে ধারণ করিতে হইবে।"

প্রত্যুত্তরে দিতি বলিযাছিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রত ধারণ করিব, আপনি আমাকে ঐ ব্রতের কার্য্যসকল এবং এই ব্রতকালে যাহা নিষিদ্ধ এবং ব্রতকে নষ্ট করে না, সেই সকল বিধি-নিষেধ বলিয়া দিন।"

পুংসবন-ব্রতে ৩১টি নিষেধ আছে। সেই নিষেধগুলি, যথা—

ন হিংস্যাদ্ভূতজাতানি ন শপেন্নানৃতং বদেৎ।
ন চ্ছিন্দ্যান্নখরোমাণি ন স্পৃশেদ্ যদমঙ্গলম্ ॥
নাপ্সু স্নায়ান্ন কুপ্যেত ন সংভাষেত দুর্জ্জনৈঃ।
ন বসীতাধৌতবাসঃ স্রজঞ্চ বিধৃতাং ক্বচিৎ ॥
নোচ্ছিষ্টং চণ্ডিকান্নঞ্চ সামিষং বৃষলাহৃতম্।
ভুঞ্জীতোদক্যয়া দৃষ্টং পিবেন্নাঞ্জলিনা ত্বপঃ ॥
নোচ্ছিষ্টাস্পৃষ্টসলিলা সন্ধ্যায়াং মুক্তমূর্দ্ধজা।
অনর্চ্চিতা সংযতবাক্ নাসংবীতা বহিশ্চরেৎ ॥
না ধৌতপাদা প্রয়তা নার্দ্রপাদা উদক্‌শিরাঃ।
শয়ীত নাপবাঙ্‌নান্যৈর্ন নগ্না ন চ সন্ধ্যয়োঃ ॥
ধৌতবাসাঃ শুচির্নিত্যং সর্ব্বমঙ্গলসংযুতা।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্ গোবিপ্রান্ শ্রিয়মচ্যুতম্ ॥

স্ত্রিয়ো বীরবতীশ্চার্চ্চেৎ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ।
পতিঞ্চার্চ্চ্যোপতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতঞ্চ তম্‌॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৮।৪৭ ৫৩ শ্লোক

—"ব্রতস্থ হইয়া কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, কাহারও প্রতি আক্রোশ করিয়া শাপ দিবে না, মিথ্যাবাক্য কহিবে না, নখ ও রোম ছেদন করিবে না, অমঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করিবে না, জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্নান করিবে না, ক্রুদ্ধ হইবে না, দুর্জ্জনের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অধৌত বসন পরিধান করিবে না, একবার যে মালা ধারণ করা হইয়াছে তাহা পুনরায় ধারণ করিবে না, উচ্ছিষ্টান্ন, পিপীলিকা-দূষিত অন্ন, আমিষযুক্ত অন্ন, শূদ্রানীত অন্ন, অথবা রজস্বলাদৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না, অঙ্গুলিদ্বারা জলপান করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন না করিয়া, সন্ধ্যাকালে কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া, বিনা ভূষণে, বাক্যসংযম না করিয়া অথবা অনাবৃতদেহা হইয়া বহির্দ্দেশে বিচরণ করিবে না। পাদপ্রক্ষালন না করিয়া, অপবিত্র অবস্থায়, চরণদ্বয় আর্দ্র থাকিতে, উত্তরশিরা হইয়া, পশ্চিমশিরা হইয়া, অন্যের সহিত, উলঙ্গ হইয়া অথবা উভয় সন্ধ্যাতে শয়ন করিবে না। ধৌত বসন পরিধান করিবে, শুচি ও সকল মঙ্গলসংযুক্ত হইয়া প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে গো, বিপ্র এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিবে; স্ত্রীদিগকে গন্ধমাল্য বসনভূষণাদি উপহার দিয়া পূজা করিবে, পতির অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহাকে আপনার গর্ভস্থ মনে করিবে।"

দৈববিড়ম্বনাবশে দিতি অস্খলিতভাবে পুংসবন-ব্রত পালনের নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। একদিন সন্ধ্যাকালে উচ্ছিষ্টা ব্রতক্লিষ্টা দিতি আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না করিয়াই নিদ্রিতা হইয়া

পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র এই ব্রতচ্ছিদ্র পাইয়া দিতির উদরমধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভকে সাতখণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিযাছিলেন।

ব্রতাবলম্বন করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে তাহা প্রতিপালন করিতে না পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, বরঞ্চ পণ্ড হইয়া থাকে। এইজন্যই ব্রতপালনে অটুট নিষ্ঠা এবং সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে পুরুষের কর্ত্তব্য লইয়াই আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে নারীর কর্ত্তব্য ও আদর্শ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ লইয়া আলোচনা করিব।

মেয়েদের উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুব সর্ব্বোপরি যে ভাবটির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নহে—মাতৃত্বের সাধনা। এক কথায় মেয়েদের আদর্শ-জননী হওয়ার জন্যই তিনি প্রাণের আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন। আদর্শ-সমাজে আদর্শ-জননীরই একান্ত প্রয়োজন। মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন নারীই পবিত্র সেবার সম্পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে রূপ দিতে সমর্থ হয় না। মা-ই সমাজের কল্যাণ-পথপ্রদর্শিকা, মা-ই জগদ্ধাত্রী। নারীকে মা হইতে হইবে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্ম্ম-উপদেশ। মা হওয়া অভিশাপের ফল নহে - ভগবৎপ্রসাদেই নারী মাতৃত্বের পবিত্র আসন অলঙ্কৃত করেন। আজকাল ত প্রগতির ঠেলায় মাতৃত্বের সাধনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং বিতৃষ্ণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহই আর মা হইতে ইচ্ছুক নহে। এই অনিচ্ছার মূলে যদি পবিত্র ত্যাগ-বৈরাগ্য-সংযমের ভাব থাকিত, তবে ত কথাই ছিল না; কিন্তু দায়িত্ববহনের ভয়েই যে প্রাণে জাগে অনিচ্ছা! পূর্ব্বে ত্যাগব্রতধারিণী ব্রহ্মবাদিনী নারী যে সমাজে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু সেই সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। সমাজের অধিকাংশ নারী পবিত্র পাতিব্রত্য-ধর্ম্মই গ্রহণ করিতেন। আসলে

নারীদেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে মা হওয়ার স্পৃহা সঙ্গোপিত আছে। স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বাভাবিক উপায়ে চাপা দিতে গিয়া সমাজে আজ কি বীভৎস কাণ্ড চলিয়াছে, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না।

সদ্‌গুরু মহাপুরুষগণ সমাজের যথার্থ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। পরিণামদর্শী প্রত্যেক মহাপুরুষই নারীজাতিকে উচ্চ আদর্শ এবং লক্ষ্যের দিকে মনঃসংযোগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সমাজের দুর্দ্দশা দূরীকরণের জন্য নারীদের মাতৃত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইতে বলিয়াছেন। উপমাস্থলে প্রায়ই তিনি ব্রহ্মবাদিনী নারীদের কথা—যথা—গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলা, চুড়ালা, সুলভা, মদালসা ও অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌ প্রভৃতির কথা বলিতেন। নারী-জীবন মাতৃত্বের সাধনাতেই সাফল্যমণ্ডিত। নারী যখন ক্রমপরিণতির ফলে মাতৃত্বের আসন অধিকার করে, তখনই তাহার মাঝে জাগে—প্রকৃত দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি দৈবী গুণ। মা কথাটি পবিত্রতামণ্ডিত। আদর্শ-জননী হওয়ার সৌভাগ্য বহুজন্মের সুকৃতির ফলেই লাভ হইয়া থাকে। মাতৃত্বে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত নারী-জীবনের রিক্ততা অন্য কিছুতেই পূর্ণ হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া প্রথমেই যে আশীর্ব্বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তিনি বলিয়াছেন—"মা গো! মাতৃত্বে হৃদয় পূর্ণ কর। রমণীত্ব শয়তানের উচ্ছিষ্ট। সুতরাং জননীত্ব ব্যতীত ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি কাহারও নয়নগোচর হয় না। তিনি সর্ব্বত্র, কিন্তু ভক্তের উপযুক্ত অবস্থা না হইলে সম্মুখে আসেন না। আশীর্ব্বাদ করি তোমাতে মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। —মাতৃসত্তায় তুমি চিরদিনের তরে বিলীন হও।"

অন্য এক স্থলে এক মেয়েভক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন —"মায়ের নামে বিভোর হইয়া মাতৃত্বের বিকাশ করিয়া 'দুঃখহারা' নামের সার্থকতা কর। আমি যে মেয়ের মধ্যে মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রাণ হইলাম।" শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েদের জগজ্জননীমূর্ত্তিতেই দেখিতে চাহিতেন। জগজ্জননীত্ব লাভ করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনা কোন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা নহে। ঘরে বসিয়াই সতীনারী সে সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারে। গৃহস্থধর্ম পালন করিয়াই নারী আদর্শ-জননীত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয়। রামায়ণ-মহাভারতে আমরা এইরূপ অনেক আদর্শ-জননীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাই। নিষ্ঠা-সহকারে আদর্শ-জননীর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া গেলে—এই সংসারে থাকিয়াই সমাজের নারী একদিন জগজ্জননীর আসন অধিকারেও সমর্থা হইয়া থাকে। মাতৃত্ববিমুখী নারীদের আচরণ দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণে কি গভীর যন্ত্রণা অনুভব করিতেন, অনেক সময় তাহার অভিব্যক্তি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। মায়ের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর যে আশা পোষণ করিতেন, তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে প্রাণে বড়ই বেদনা পাইতেন। একটি মেয়েভক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বেদনাহতচিত্তে লিখিয়াছিলেন—"আমি তোমাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি, আশাও ছিল তোমার মধ্যে মায়ের দর্শন করিয়া গুরুগিরির সার্থকতা করিব। কিন্তু আমি মায়ের আসনে এ পর্য্যন্ত এক স্বার্থপর ক্ষুদ্র রমণীকে দেখিয়া আসিতেছি, এ দুঃখ কি কেহ বুঝিবে? মায়ের স্বভাবে আত্মাহুতি দাও, মা তোমার সারা হৃদয় জুড়িয়া আবির্ভূত হইবেন। তখন সব শৃঙ্খলা হইবে, চারিদিকে সামঞ্জস্য দেখিবে। বুদ্ধির বিক্ষিপ্ত অবস্থা গিয়া স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আসিবে, লঘীয়সী রমণীত্বস্থলে গরীয়সী জননীত্ব ফুটিয়া উঠিবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ভাবধারার সমর্থন পাই শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, এটর্ণি-লিখিত 'নারী' গ্রন্থে। তিনি লিখিয়াছেন—"হিন্দুসমাজ-বিধানকর্ত্তারা নারীদিগকে মাতা বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের মাতৃভাব কিরূপে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ও তাহা সমাজের ও নারীদিগের পক্ষে কত মঙ্গলজনক করিতে পারিয়াছিলেন ও তাহাতে গৃহ কত সুখশান্তিদায়ী হইতে পারিয়াছিল, তাহা এখন দেখাইতেছি।

"মাতৃভাবই পরার্থপর—পরের জন্য, প্রথমে সন্তানের জন্য নিজের কষ্টস্বীকার করা, ত্যাগ করা। দাম্পত্যপ্রেমেরও প্রধান অঙ্গই পরার্থ-পরতা—পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকার করা। সন্তানের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইলে, অপরের জন্য কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করা সহজ হয়। সুতরাং মাতৃভাব উদ্দীপিত হইলে দাম্পত্যপ্রেমও অধিক হইতে পারে।

"গৃহের সুখশান্তি নির্ভর করে নারীর মাতৃত্বের অঙ্গীভূত ত্যাগ-শীলতায়, পরার্থপরতায়—সন্তানেরও স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্য, তাহাদিগের সুখ-স্বচ্ছন্দ স্থাপনের জন্য, কষ্ট নিবারণের জন্য, নিজের কষ্ট স্বীকার করায়, তাহাতে সুখবোধ করায়—অর্থোপার্জ্জনাদি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের কার্য্য তাহার বিরোধী হওয়ায় সেরূপ কার্য্য করায় গৃহসুখ শান্তিদায়ী করিবার শক্তি নারীদিগের ক্ষীণ হইয়া যায়। সেই জন্যই Ellen Key বলিয়াছেন, নারীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র ও কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হওয়া আবশ্যক। নারীরা অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম করিতে নামার কুফল দেখিয়া হিট্‌লার ও মুসোলিনী জার্মানি ও ইটালীতে তাঁহাদিগের গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্ত্রীর মাতৃভাব যে দাম্পত্য-জীবনের প্রধান অঙ্গ, তাহা কোথাও দেখান হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু সখা-সখীভাবে বিবাহিত জীবন অধিককাল সুখ-শান্তিদায়ী থাকে

না—স্ত্রীর মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবা ও যত্নপরায়ণতা, ক্ষমা, ত্যাগশীলতা, সহগুণের একান্ত আবশ্যক, তাহার অভাবে দাম্পত্যজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—দাম্পত্যপ্রেম অল্পদিনেই কর্পূরের মত উবিয়া যায়। স্থায়ী দাম্পত্য-প্রেমের প্রধান অঙ্গই—স্ত্রীর মাতৃভাব।"

মেয়েদের মাঝে মাকে খুঁজিতে গিয়া অনেক জায়গাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হতাশ হইয়াছেন অর্থাৎ ক্ষুদ্র নারীত্বের ভাব ছাড়াইয়া আদর্শ জননীত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত নারী খুব কমই মিলিয়াছে। এইজন্যই তাঁহার এরূপ গভীর দুঃখ এবং আক্ষেপের উক্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মর্মবেদনার বাণী—নারী-সমাজকে কি একটুও আঘাত দিবে না? শ্রীশ্রীঠাকুরচরণাশ্রিতা নারীশিষ্যাদের প্রাণ কি এখনও উদ্বুদ্ধ হইবে না? আদর্শভ্রষ্টা নারীজাতিকে মাতৃত্বের সাধনায় কি ভাবে অগ্রসর হইতে হয়, সেই পথ-প্রদর্শিকারূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের মেয়েভক্তগণ কি অগ্রসর হইবেন না? আদর্শ-জননী হইতে না পারিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের এই গভীর দুঃখ অন্য কিছুতেই ঘুচিবে না। তাই বলি, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের আবেদনে মায়েরা সাড়া দিন। ক্ষুদ্র রমণীর ভাব পরিহার করিয়া মায়েরা জগজ্জননীত্বের সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন।

উদ্বুদ্ধপ্রাণা এক মেয়েভক্তকে জগজ্জননী হওয়ার সহজ সরল পথের ইঙ্গিত দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"আমি যে তোকে আমার আনন্দময়ী মা-রূপে চাই। জগজ্জননীরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিতা দেখিতে চাই। তোর সাকার মূর্তিতে আমার বিশ্বরূপা নিরাকারা মাকে দেখিয়া আমার গুরুগিরির সার্থকতা করি। রমণীহৃদয় কামগন্ধশূন্য মায়ের ন্যায় পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হইলেই সেই হৃদয়ে জগজ্জননীর আবেশ হইয়া থাকে। মা, স্ত্রী ও মেয়ে এক মহামায়ারই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ, আর জননীত্বে রমণী জীবনের পূর্ণত্ব, এ কথা ভুলিও না।

"মায়ের জাতি তোরা, রমণীত্ব ভুলিয়া জননীত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিতা হও। নিজের মধ্যে আত্মস্বরূপে সে জগজ্জননী দয়াময়ী প্রেমময়ীকে উপলব্ধি কর। জগতের সমস্ত নর-নারীকে ছেলে-মেয়ে জ্ঞানে পবিত্রভাবে দেখ, সকলের সুখ-দুঃখ নিজ হৃদয়ে অনুভব কর। মায়ের ন্যায় জগতের মঙ্গল ইচ্ছা তোর প্রাণে জাগিয়া উঠুক। পাপী, তাপী, কামুক, লম্পট যেন তোর মুখপানে চাহিয়া মাতৃশক্তিতে আবিষ্ট হইয়া যায়—পবিত্র ভাবে তোর চরণে লুটিয়া পড়ে।

"মা! এই সংসার ভোগবিলাসের স্থান নহে—এ যে কর্মক্ষেত্র! কর্মপ্রভাবে পরকালের যবনিকা উত্তোলন করিতে হইবে; ভোগে তাহা আরও জমাট বাঁধিয়া পথ রোধ করিবে। তাই বলি, নিজের দেহ-প্রাণ ভুলিয়া পর-সেবায় আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া যাও। বাসনা-কামনাই বন্ধনের কারণ; এক ভগবচ্চরণারবিন্দ ছাড়া আর কোন বাসনা-কামনা হৃদয়ে স্থান দিও না। কয়দিনের সংসার—কতক্ষণের সুখ-দুঃখ? এ সংসারে খাটিতে আসিয়াছি, খাটিয়া যাইব, অভাব দিয়া গড়া জগতে পূর্ণ সুখ-শান্তির আশা বিড়ম্বনা। এখানে একধারে হাসি, একধারে কান্না; একধারে জীবন, অন্যধারে মৃত্যু, একদিকে সংযোগ, অন্যদিকে বিয়োগ, একধারে মিলন, অন্যধারে বিরহ, তবে নিরবচ্ছিন্ন, অনবদ্য সুখ-শান্তি কোথায়? সেই চিদানন্দময় ভগবানের চরণে। সুতরাং কোন অবস্থায় সে চরণ হইতে যেন লক্ষ্যচ্যুত না হও।"

সতীর তেজে যেমন দিব্যসৃষ্টি হয়, তেমনি কলুষ-কালিমাও ভস্মীভূত হইয়া থাকে। সতী-নারীর অব্যর্থ তেজে দেবশক্তিরও গতিরোধ হইয়া থাকে। সতীনারীর জগতে অসাধ্য বলিয়া কিছুই নাই। লখীন্দর-বেহুলা, সাবিত্রী-সত্যবানের কথা না জানে, ভারতবর্ষে এমন লোক আছে কি? সতীর তেজের নিকট মৃত্যু-অধিপতি যমরাজ পর্য্যন্ত কম্পিত-

কলেবর। সতী-নারীর সতীত্বের তেজে মৃত পতিও জীবন লাভ করে। ভারতবর্ষে এমন বহু পতিব্রতা-নারী ছিলেন, যাঁহারা সতীত্বের তেজে জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কামুক-লম্পটও সতীত্বের তেজের নিকট পরাভূত। দুষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াও কত লম্পট যে সতী-নারীর পায়ে শেষটায় লুটাইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই ভারতে। আজ নারীর সেই সতীত্বের তেজ কোথায়? বাক্‌সিদ্ধা সতী-নারী এখন দেখা যায় কি? চারিত্রিক বলে যে অসাধারণ তেজের বিকাশ হইত নারী-জীবনে, আজ বিজ্ঞানের উন্নতিতে সেই তেজের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় কি? চারিত্রিক বল, সতীত্বের মহিমা বিস্মৃত হইয়া আমরা যতই নারীদের উন্নতির পথে ঠেলিয়া লইয়া যাই না কেন, তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে পণ্ডিত যামিনীকান্ত সাহিত্যভূষণপ্রণীত "ললনা-মঙ্গল গীতামৃত বা শ্রীকৃষ্ণ-উত্তরা-সংবাদ" হইতে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য বিষয়টিকে সুপরিস্ফুট করিতেছি।

কুলবধূর ধর্ম্মাচরণযোগ

উত্তরা—

কুমারী তোমারে ভাবি যাপিল জীবন্।
যৌবনে সে স্বামীগৃহে করিল গমন॥
পিতৃগৃহে ছিল বালা কিঞ্চিৎ স্বাধীনা।
পতিগৃহে নববধূ সবার অধীনা॥
শাশুড়ী ননদ পতি চালায় আদেশে।
কেমনে তোমার সেবা করিবে সে দেশে

শ্রীকৃষ্ণ—

সেইত পরীক্ষা তার হবে উত্তরিতে।
হস্তে কবি গৃহকর্ম ভাবিতে সে চিতে ॥
আমারি প্রতীক পতি ভাবিয়ে দেখিবে।
তাঁহার আদেশে মম আদেশ মানিবে ॥
করিবে আলস্য ত্যজি সকলের সেবা।
তাহাই আমার সেবা অন্য আছে কেবা ॥
দেখিবে খুলিয়ে সতী জ্ঞানের নয়ন।
সর্বরূপে বিরাজিত আমি নারায়ণ ॥
কোন্‌'রূপে আমি নহি ? কোথা আমি নাই ?
সে মোরে যেথায় ভাবে সেথা মোর ঠাঁই ॥
সর্বদেবে আমি দেব, আমি দেহে দেহী।
সর্বকণ্ঠ হতে একা আমি কথা কহি ॥
ভাল-মন্দ সব কথা লইবে শুনিয়ে।
আমারি স্নেহের কথা বুঝিবে ভাবিয়ে ॥
কাহাকেও কটু কথা কভু না বলিবে।
অন্তরে ক্রোধের মোটে স্থান নাহি দিবে ॥
গুরুজন যে আদেশ কবিবে যখন।
সদা আনন্দিত চিতে করিবে পালন ॥
গৃহহিত চিন্তা করি দেখিলে অন্যায়।
জানাবে প্রাণের কথা করিয়ে বিনয় ॥
তাতে যদি নাহি হয় কোন প্রতিকার।
যা বলিবে তা করিবে কি দোষ তাহার ॥

নিয়তির গতি কেহ রোধিতে না পারে।
হয় না কোনই ফল বৃথা দুঃখ ক'রে ॥
প্রাণের বেদনা যত জানাবে আমায়।
যা বলিবে শুনিব তা করিও প্রত্যয় ॥
লোকেরে বলিলে কিন্তু লোকে মন্দ ক'বে।
আমারে কহিলে আর অন্যে না শুনিবে ॥
আমিই করিব ত্বরা কষ্টের বিধান।
সত্য সত্য এ প্রতিজ্ঞা নাহি হবে আন ॥
পতির সহধর্মিণী নারী পতি মনে।
পালিবে গার্হস্থ্যধর্ম সদা সযতনে ॥
গার্হস্থ্য ধর্মের মর্ম বেদে সংহিতায়।
গুরু যা শিখাবে তাহা সাধিবে নিশ্চয় ॥
লোকাচার দেশাচার উপেক্ষা না করি।
সাধিবে সমাজ-হিত স্বধর্ম আচরি ॥
অতিথি-সৎকার আর লোক-উপচার।
গৃহীরা এ নীতি মনে রাখে অনিবার ॥
ক্ষুধাতুরে দিবে অন্ন তৃষাতুরে জল।
আর্তের সহায় হবে দীনের সম্বল ॥
অনাথে যে বন্ধু বলে থাকি তার সাথ।
অনাথের জগন্নাথ কোথা অন্য নাথ ॥
এ ভবে দরিদ্ররূপে ভ্রমে নারায়ণ।
দরিদ্রে করিলে সেবা তিনি তুষ্ট হন ॥
যে হয় ত্রিতাপদগ্ধ জীবের সহায়।
অচিরে ত্রিতাপমুক্ত আমি করি তায় ॥

পিতা জগন্নাথ তাঁর গৃহ এ সংসার।
ভাবিবে কেহ না পর সবে আপনার ॥
গার্হস্থ্যেও ব্রহ্মচর্য্য পালন নিয়ম।
পালিবে তা যথাশক্তি আচরি সংযম ॥
দেশ কাল পাত্র ভেদে যথা যে আচার।
পালন করিবে সদা ভুলি ব্যভিচার ॥
রাজনীতি ধর্মনীতি সামাজিক নীতি।
আমি মূল তাই জানি দিবে শ্রদ্ধা প্রীতি ॥

উত্তরা—

পতি যদি ভাগ্যদোষে ধর্ম না আচরে।
সতী কি করিবে প্রভো বল দয়া করে ॥

শ্রীকৃষ্ণ—

পতি যদি কর্মদোষে ধর্ম না করয়।
সুপথে আনিতে তারে চেষ্টা যেন রয় ॥
ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করি শুনাবে পতিরে।
ভগবৎস্তুতিগাথা গাবে ধীরে ধীরে ॥
ভক্তের জীবনী-কথা বলিবে সতত।
নিত্যানিত্যবোধ তারে দিবে সাধ্যমত ॥
মধুর ভাবেতে তারে পারিলে ডুবাতে।
সুখের বিষয় আর কি আছে তা হ'তে ॥
পবিত্র প্রণয়-রসে মজিয়ে দু'জনে।
জীবন করিবে ধন্য আমার সাধনে ॥
তবে যদি পতি নাহি শুনে কোন কথা।
প্রতিকূল হয়ে তারে নাহি দিবে ব্যথা ॥

যথাশক্তি নিজ কার্য্য করিবে সাধন।
তার ফলে কোন কালে ফিরে যাবে মন॥

উত্তরা—

পতি যদি অন্য দেবে করে উপাসনা।
কি করিবে সতী তাহা জানিতে বাসনা॥

শ্রীকৃষ্ণ--

পতি যদি অন্য দেবে করে উপাসন।
তাহাতে না হয় যেন বিচলিত মন॥
সাহায্য করিবে তারে সে দেব-সাধনে।
সুফল ফলিবে তাতে রাখিবে স্মরণে॥
আমি বিষ্ণু আমি শক্তি বলি বার বার।
আমি গণপতি শিব আদিত্য আবার॥
সকলেতে আমি এক, আমাতে সকল।
সর্বত্র জানিলে মোরে আনন্দ কেবল॥

উত্তরা—

পতির চরিত্র যদি কলঙ্কিত হয়।
না জানি কেমনে সতী সেবিবে তাহায়॥

শ্রীকৃষ্ণ—

পতির চরিত্রে যদি শত দোষ রয়।
কেমনে করিবে সতী উপেক্ষা তাহায়॥
এ সংসারে তিন কর্ম জন্ম মৃত্যু বিয়ে।
লোকে বলে হয় সদা বিধাতারে দিয়ে॥
হয় বটে সর্বকর্ম মানে বা না মানে।
এই তিনে অনেকেই সন্দেহ না আনে॥

তাই যদি হয়, তবে যাহা হোক পতি।
পত্নী যেন তারে সদা সেবে যথারীতি॥
তবে পতিপরিত্যক্তা হ'লে কোন সতী।
অনন্যগতির গতি আমি বিশ্বপতি॥
যে যথায় থাকিবার হয় উপযুক্ত।
প্রকৃতি তাহারে তথা করিবে নিযুক্ত॥
বিধাতার শুভ দান করিলে গ্রহণ।
ব্যথা দিয়ে দিতে পারে অমূল্য রতন॥
পতি করে অত্যাচার কিম্বা সমাদর।
সতী যেন ভক্তিভাবে ভজে নিরন্তর॥
তবে ধৈর্য্য ক্ষমা ভুলি হইলে চঞ্চল।
নিশ্চয় জানিবে তাতে হবে না সুফল॥
সীতা সাবিত্রীর ভাবে ভরিয়ে অন্তর।
ভবের কর্তব্যপথে হবে অগ্রসর॥
তাদের আদর্শে লক্ষ্য রাখি অনুক্ষণ।
সতীধর্ম পাতিব্রত্য করিবে পালন॥
পতি-অনুগামী হ'য়ে হইবে চলিতে।
ভুলিবে না সর্ব কর্ম আমা নিবেদিতে॥
যে নারী একান্ত মনে কেঁদে কেঁদে বলে।
প্রভো মোর পতি যেন ভাল হয়ে চলে॥
সতীর বাসনা সতি পূর্ণ করি আমি।
সতীগুণে পতি হয় সত্য-অনুগামী॥
নিত্য মম প্রেমে শুধু প্রমত্তা যে হবে।
তার যাহা বেদবিধি সেই জানে ভবে॥

উত্তরা—

রোগ-শোক-দুঃখ প্রভো আছে ত সংসারে।
দিয়ে তুমি পুত্র-কন্যা কত লও কেড়ে॥
সে শোকে কেমনে সতী ধরিবে জীবন।
কি সান্ত্বনা দিবে প্রাণে ত্রিতাপবারণ॥

শ্রীকৃষ্ণ—

পুত্র কন্যা যাহা কোলে যখনই লভিবে।
জানি মোর স্নেহাশীষ যতনে তোষিবে॥
আমি দিয়ে কভু তাহা করিলে হরণ।
সতী তায় করিবে না অশ্রুবিসর্জন॥
চলচ্চিত্রে কত আসে কত চলে যায়।
মমত্ব স্থাপন তাতে যুক্তিযুক্ত নয়॥
আমা হতে আসে জীব আমাতেই পশে।
ইহা জানি সদা কাল কাটাবে হরষে॥
আমিত্ব মমত্ব সতি হইয়ে বিস্মৃত।
আমার স্মরণ লভি হইবে অমৃত॥
করিবে কর্তব্যবোধে আসে যেই কর্ম।
ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিবে এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম॥
কর্মে আছে অধিকার ফলে কিন্তু নয়।
সাধিবে নির্লিপ্ত ভাবে কর্মসমুদয়॥
আমাতে একান্তভাবে যেবা রাখে মন।
জানি না তাহার দুঃখ অশান্তি কেমন॥
সম্পদে বিপদে সে যে সমচিত্ত রয়।
আমাতে সে পায় নিত্য শান্তির নিলয়॥

মন সুখে চিরসুখী যে মোর অধীন।
দুঃখে শোকে তার মুখ হয় না মলিন॥
পাবে না ত্রিতাপ তারে করিতে বিরস।
আমার স্মৃতিতে লভে অমৃত পরশ॥

উত্তরা—

কে বা গুরু কে বা বন্ধু বল এই ভবে।
কে বা ভক্ত, নারী তারে কেমনে চিনিবে॥
কাহার চরণতল করিয়ে আশ্রয়।
শুনিবে তোমার কথা বল দয়াময়॥

শ্রীকৃষ্ণ—

যে জানে আমার তত্ত্ব সেই গুরু ভবে।
যে শুনায় মম কথা সেই বন্ধু হবে॥
যার সঙ্গ লাভে হয় আমাকে স্মরণ।
সেই ভক্ত জানি তার বন্দিবে চরণ॥
বাহিরের বেশে ভক্ত নাহি যায় জানা।
অনেক কপটাচারী করে প্রতারণা॥
তাই বলিতেছি আমি ভক্তের লক্ষণ।
সহজে টলে না যাতে সরলার মন॥
আমার যে ভক্ত তার ভোগলিপ্সা নাই।
আমা পেয়ে পরিতৃপ্ত আর কিবা চাই॥
কি যেন পেয়েছে প্রাণে অমূল্য রতন।
তাহার দেখিবে সদা প্রসন্ন বদন॥
কপর্দ্দকশূন্য হলেও না হয় দুর্ব্বল।
সাম্রাজ্য দিলেও সে যে হয় না চঞ্চল॥

মধুর বচনে তার প্রাণ উঠে ভ'বে।
অন্তবের তম গ্লানি দূরে যায় স'বে॥
সকলের দেখে লাভ আপনি ঠকিয়ে।
দুঃখে সে সকলি সহে সহিষ্ণু হইয়ে॥
বিনম্র হইয়ে রাখে সকলেব মান।
চাই চাই রব নাই তুচ্ছ অর্থ মান॥
প্রভুত্ব গুরুত্ব নাহি করে অভিলাষ।
আপনারে জানে ঠিক নিত্য গুরুদাস॥
ধন হবে পুত্র হবে বোগ যাবে বলে।
করে না সে লোক জড় কভু কোন ছলে॥
উপস্থিত কর্ম করে নাহি চাহে ফল।
প্রাণান্তেও নাহি সাধে কারো অমঙ্গল॥
ভীত নাহি হয় কভু কৃতান্তে হেরিয়ে।
শিশুর কাছেও স্নেহে পড়ে সে গলিয়ে॥
বিভূতিব সহ তার বিনয় মিশ্রণ।
মধুর চরিত্র হেন ভবে অতুলন॥
আপদ-পর্বতভাবে সে নহে চঞ্চল।
প্রীতিপুষ্পভরে হয় নত অবিরল॥
দুষ্টেরে শাসিতে সে যে ঘোর বজ্রানল।
শিষ্টেরে তোষিতে হয় কুসুমকোমল॥
বিষাক্ত বিদ্বেষবাক্যে বিদ্ধ সে যে নয়।
ভক্তির অস্ফুট স্বরে সদা মুগ্ধ হয়॥
জীবে দয়া জীবসেবা করে যথাশক্তি।
কথায় কথায় ভাব, উথলায় ভক্তি॥

পাগল আমার প্রেমে আনন্দে বিহ্বল।
শুনিলে আমার কথা আঁখি ছল ছল॥
সকল সময়ে মম প্রসঙ্গ উঠায়।
বলিতে লাগিলে কেহ নিজে থেমে যায়॥
শিষ্য হতে ভালবাসে গুরু নাহি হয়।
চাহিলে চরণধূলি পড়ে সে লুটায়॥
পেলে পুনঃ অন্তরঙ্গ আপনা বিকায়।
তালে তালে পা ফেলিয়ে কার্য্য সেরে যায়॥
করিলেও স্তুতিবাদ স্ফীতি নাহি তার।
নিন্দাবাদে নাহি ক্ষোভ সে যে নির্বিকার॥
ভক্ত বৈরাগ্যের মূর্তি করিলে দর্শন।
অন্তরে ত্যাগের ভাব আসে অনুক্ষণ॥
ভয় তারে জিজ্ঞাসিতে বৈষয়িক কথা।
পাছে হয় অপরাধ প্রাণে পেলে ব্যথা॥
ধর্মকথা তার কাছে কেহ জিজ্ঞাসিলে।
যা করেছে উপলব্ধি সত্য তাহা বলে॥
বুঝাতে চাহে না নিজে উচ্চ কত জ্ঞানে।
হিসাব সে দেখায় না কি কি শাস্ত্র জানে॥
বসায়ে রাখে না কবি কাজের ছলনা।
নিকটে আসিলে কোন রূপসী ললনা॥
কোথা সে করিছে পান অপরূপ সুধা।
মিটিয়ে গিয়েছে যেন তার সব ক্ষুধা॥
আমা পানে দিয়ে আঁখি থাকে সংগোপনে।
আর কোন রূপ নাহি ভাল লাগে মনে॥

ব্রজবালাদের ভক্তি দেখ চিন্তা করি।
একরূপে দিল আঁখি অন্য সবে ছাড়ি॥
আমি সে ভক্তের প্রাণ, ভক্ত মম প্রাণ।
ভক্ত সে অনন্যচিত্ত, আমি ধ্যান-জ্ঞান॥
এরূপ লক্ষণযুক্ত দেখিবে যাহারে।
শুনিবে আমার কথা বসি তার ধারে॥
সেই ভক্ত সেই সাধু ক্ষণসঙ্গ তার।
তরী হয় তরিবারে ভব-পারাবার॥

উত্তরা—

এ সব লক্ষণ প্রভো কোথা একাধারে।
সাধুসঙ্গ দেখি এবে দুর্লভ সংসারে॥

শ্রীকৃষ্ণ—

সত্যই দুর্লভ বৎসে! সাধুসঙ্গ ভবে।
থাকিলে প্রাণের টান আপনি মিলিবে॥
প্রকৃত আমার ভক্ত যেই জন হয়।
ও সকল গুণ তার একাধারে রয়॥
তবে উহা করিয়াছে আয়ত্ত যে যত।
জানিবে সে মম তত্ত্বে অগ্রসর তত॥
বিস্তারে যে বাক্যজাল আর ইন্দ্রজাল।
আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে কেবল॥
ত্যাগীবেশ থাকিলেও ভণ্ড সেই জন।
জানিতে পারিলে সঙ্গ করিবে বর্জন॥
দৃষ্টিতে জানিয়ে দুষ্ট নিকটে যে যায়।
আপনার মাথা সে যে আপনিই খায়॥

উত্তরা—

বুঝিলাম প্রভো তব ভক্তের লক্ষণ।
ছলিতে নারিবে আর প্রবঞ্চকগণ ॥
কিন্তু মনে হয় দেব একটি সংশয়।
বুঝিলাম সে বিপদে নারী নিরুপায় ॥
কি আছে সঙ্কোচ লজ্জা তব কাছে আর।
সকলি অন্তরে থাকি দেখ অনিবার ॥
মন কারো বাধ্য নয় বড়ই দুর্জ্জয়।
অবাধে সে করে গতি যথা ইচ্ছা হয় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু সুসঙ্গ-নন্দনে।
চলে যেতে পারে মন কুসঙ্গ-কাননে ॥
এই আছে ভক্তসঙ্গে শীতল বাতাসে।
গিয়ে সে নরককুণ্ডে ডুব দিয়ে আসে ॥
সাধনার পথে আছে বিঘ্ন অগণন।
রিপুভয় সঙ্গদোষ দুষ্ট প্রলোভন ॥
অনুচিত ভোগলিপ্সা জাগে যদি মনে।
কি করিবে সতী নারী বল সেই ক্ষণে ॥

শ্রীকৃষ্ণ—

শুভেচ্ছা রাখিবে সদা জাগরূক মনে।
উন্নত আদর্শ সদা রাখিবে স্মরণে ॥
তাহ'লে অবশ্য তুমি থাকিবে চেতন।
কুপথে গেলেও মন বুঝিবে তখন ॥
অনুচিত ভোগলিপ্সা যদি মনে মনে।
তাহাতেও আছে পাপ এড়াবে কেমনে ॥

দৈহিক পাপের তরে সমাজ-শাসন।
কিম্বা রাজপুরুষের ঘোর নিপীড়ন॥
মানসিক পাপ কেহ দেখিতে পাবে না।
তাই ভবে কেহ আর শাসন করে না॥
আপন শাসন সেথা করিবে আপনি।
পাপ বুঝে প্রায়শ্চিত্ত করিবে অমনি॥
আত্মাই আত্মার শত্রু জানিবে নিশ্চয়।
আত্মাই আত্মার মিত্র অন্য কেহ নয়॥
আত্মাই পাপ ক'রে আত্মায় শাসিবে।
তা না হ'লে আত্মক্ষতি কাহারে দোষিবে
ইষ্টমন্ত্রজপসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট যা নিত্য।
পাপ বুঝে বাড়াবে তা, তাই প্রায়শ্চিত্ত॥
দ্বিগুণ ত্রিগুণ কোথা কিম্বা ততোধিক।
বিচার আপন হাতে যা বুঝিবে ঠিক॥
বুঝিতে পারিলে পাপ খুবই গুরুতর।
অনশনব্রত করি শোধিবে অন্তর॥
তবে যদি গৃহকর্মে কায়ক্লেশ হয়।
অনশনব্রত তার যুক্তিযুক্ত নয়॥
অবসর মত সতি বসিয়ে আসনে।
শ্বাস রোধি রবে মগ্ন ইষ্টমন্ত্রধ্যানে॥
তাঁর কাছে মনোব্যথা জানাবে কাঁদিয়ে।
থাকিবে পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়ে॥
পাষাণীরে পাদস্পর্শে আমি মুক্ত করি।
সান্ত্বনা লভিবে প্রাণে অহল্যারে স্মরি॥

সন্তোষ পরশে হয় অসতীও সতী।
সত্য না সেবিলে পরে সতী নয় সতী॥
দণ্ডে দণ্ড রেখে সতি কাটাবে সময়।
যাবৎ যৌবনকাল গত নাহি হয়॥
আমি শ্রেষ্ঠ পরমেষ্ট কভু না ভুলিবে।
জীবনের সফলতা আমাতে লভিবে॥

নারীসৌভাগ্যবর্গযোগ

শ্রীকৃষ্ণ—

স্নেহময়ি! পরদুঃখে গলিল পরাণ।
সাধিবে জীবন ভরি ভবের কল্যাণ॥
নিজ দুঃখ ভুলি পরদুঃখে নিমগন।
নারীর দুঃখের অশ্রু করিবে মোচন॥
সেবা-ধর্মে চিরধন্য নারীর জীবন।
কি দেখ নারীর তুমি দুঃখের কারণ॥
সৃষ্টির অর্দ্ধাঙ্গ হয় নারী সে প্রকৃতি।
নারী বিনা পুরুষের কি আছে শকতি
পুরুষ নির্গুণ কোনো কর্ম নাহি করে।
প্রকৃতি চালায় সদা স্কন্ধে ল'য়ে তারে॥
বিশ্বের রূপলাবণ্য দেখ মনোহারী।
অর্দ্ধেক পুরুষ দিল অর্দ্ধেক সে নারী॥
স্বর্ণ রৌপ্য জড় ধাতু কোথা রূপ তার।
পরশি নারীর অঙ্গ হল অলঙ্কার॥

পুরুষ পরুষ দীন হৃদয়-বিহীন।
নারী ধনী তাই তারে দিল প্রেম-ঋণ ॥
শ্রেষ্ঠ যত ধর্ম কর্ম দেখ লক্ষ্য করি।
পুরুষ করেনি একা নারী সহচরী ॥
অর্জ্জুন অরাতিসৈন্য বধিছে সমরে।
সুভদ্রা আহত সৈন্যে সেবা যত্ন করে ॥
একের করিতে কর্ম শকতি ফুরায়।
পশ্চাতে থাকিয়া অন্য সামর্থ্য যোগায় ॥
একের নৈরাশ্যে যবে অবসন্ন মন।
অন্যের সান্ত্বনা দেয় নবীন-জীবন ॥
একা মোর কোন খেলা মনে নাহি আসে।
মায়া যদি ভালবেসে না দাঁড়ায় পাশে ॥
কোথাও দেখি না হীন নারীর গৌরব।
সাবিত্রী রাণী ভবানী এঁরা নারী সব ॥
দয়া প্রীতি ক্ষান্তি কান্তি কমনীয় সৃষ্টি।
সরলতা কোমলতা নারী তুষ্টি পুষ্টি ॥
ধীরতা স্থিরতা পুনঃ উগ্রচণ্ডা নারী।
দক্ষিণেতে বরাভয় বামে তরবারি ॥
কঠোরা বজ্র হ'তেও নারী ভবে সতি।
কোমলা কুসুম হ'তেও নারী যে মহতী ॥
দেহমধ্যে দ্বি-সপ্ততি সহস্র যে নাড়ী।
জড়িয়ে রয়েছে জীবে তারাও ত নারী ॥
নাড়ীতে দক্ষিণে-বামে মধ্যে আগুলিয়ে।
কেমনে সে নারীতত্ত্ব থাকিবে ভুলিয়ে ॥

জীবের সঙ্গিনী নারী জীবনে মরণে।
রাখি সে নারীর মান ধরিয়ে চরণে ॥
আর জানে নাড়ী-মর্ম যোগী মৃত্যুঞ্জয়।
নারীপদে জানি মোক্ষ বক্ষে তুলি লয় ॥

উত্তরা—

নারীগুণ ভাল প্রভো করিলে বর্ণন।
তোমা সম নারীজ্ঞানী আছে কে তেমন ॥
ভবব্যাধি-মোচনেব তুমি বৈদ্যরাজ।
তব সন্নিধানে মোব আছে কিবা লাজ ॥
তুমি অন্তর্যামী দেব কি তব অজানা।
তথাপি আমার মুখে শুনিতে বাসনা ॥
নারী-জীবনের দুঃখ বলিব তোমায।
যা লয় তোমার মনে করিবে উপায ॥
নারীর জীবনে হায বিষম বন্ধন।
পুরুষের অনুগতা নারী অনুক্ষণ ॥
পিতার অধীনে নারী শৈশবে বালিকা।
যৌবনে সে পরাধীনা পতির সেবিকা ॥
বৃদ্ধকালে নারী পুত্র-কন্যার অধীন।
নারী চির পরাধীনা কবে সে স্বাধীন ॥
অধীন জীবনে হায় নাহি কোন সুখ।
সতত শঙ্কিত রহে চেয়ে পরমুখ ॥
পরের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে না পারে।
নিরবধি ভোগে জ্বালা অন্তরে অন্তরে ॥

যোগায়ে পরের মন পারে কত কাল।
যে দিন পারে না হায় সে দিন জঞ্জাল॥
চির অধীনতা-পাশে নারীরে বাঁধিয়ে।
কি সুখে রেখেছ ভবে দেখ না ভাবিয়ে॥
কাহার সেবায় ভবে কোন ক্রটী হয়।
নারী রাখে মনে মনে সর্বদা সে ভয়॥
যে চলে স্বাধীনভাবে না রাখে আতঙ্ক।
রটে তার-চারিদিকে কত না কলঙ্ক॥
কোন নারী গৃহহিত সাধে প্রাণপণে।
ভাগ্যদোষে তাহা কারো নাহি লাগে মনে॥
কত রঙ্গে করে বেশ কত ঢঙ্গে চায়।
ভাবে যদি প্রাণনাথ রাখে রাঙ্গা পায়॥
তবে ভাগ্যে হলে পতি মনের মতন।
হয়ত অকালে কাল করয়ে হরণ॥
কোন নারী নাহি পায় মনোরম বর।
না হয় মনের মিল দুঃখ ঘোরতব॥
কোন নারী নাহি জানে বিলাসপ্রিয়তা।
বিলাসী পতির ভয়ে করে বিলাসিতা॥
বিলাসিনী কোন নারী চাহে বেশ-ভূষা।
পতি দীন অর্থ বিনা নাহি মিটে আশা॥
কত স্থানে কত দুঃখ পায় নারীগণ।
সব কথা অবক্তব্য না যায় বর্ণন॥
কোন নারী ভালবাসে সত্য সদাচার।
পতি তার দুশ্চরিত্র করে ব্যভিচার॥

কোন নারী পতিসেবা করে অনিবার।
পতি সাধু, বলে তারে নরকের দ্বার॥
যতিগণ ঘৃণা করে কামিনী-কাঞ্চন।
সাধনার অন্তরায় ভাবে এ দুজন॥
কাঞ্চন বিহনে কিন্তু প্রাণ রাখা দায়।
কামিনী না হ'লে সাধু থাকিত কোথায়
নারীনিন্দা শুনি প্রভো ঘৃণা করে হায়।
আর যেন নারী হয়ে আসি না ধরায়॥
কাহার সাধন-বিঘ্ন হয় হেথা আসি।
তোমার চরণে রব হ'যে চিরদাসী॥

শ্রীকৃষ্ণ—

ছি ছি সতি! নাহি শোভে তব হেন উক্তি।
নারীরূপে অবতীর্ণা ভবে মহাশক্তি॥
নারী না আসিলে ভবে আসিবে না কেহ।
কোথা পাবে ভালবাসা কোথা পাবে স্নেহ॥
নারীপ্রেমে করে জীব জনম গ্রহণ।
নারী স্নেহ-স্তন্য দানে করয়ে পালন॥
নারীশক্তি মায়ারূপে ভুলায় সংসার।
নারীরূপা মোহনিদ্রা করিছে সংহার॥
সতীনারীতত্ত্ব আমি কি পারি বর্ণিতে।
রাখিতে সতীর মান আসি অবনীতে॥
যেখানে সতীর অশ্রু নারী-নির্য্যাতন।
সেই স্থানে ধ্বংসলীলা করি সংঘটন॥

সতীর কারণে এই কুরুক্ষেত্র রণ।
কুরুকুলসহ ধ্বংস হবে দুর্য্যোধন॥
সতী-নারী জান সতি অনলের প্রায়।
দুষ্টমতি পরশিলে পুড়ে ভস্ম হয়॥
রক্ষকুলে দশানন প্রমাণ পড়িয়ে।
সবংশে নির্ব্বংশ হ'ল সতীরে হরিয়ে॥
দ্রৌপদীরে পরশিল দুষ্ট দুঃশাসন।
তাহাই ত' কুরুকুল ধ্বংসের কারণ॥
নারীগণ যেথা সুখে যাপিছে জীবন।
আনন্দে করিছে নৃত্য সেথা দেবগণ॥
যে সমাজে সতী'পরে হয় অত্যাচার।
সে সমাজ সেই দেশ জাগিবে না আর॥
স্বভাবে অবলা নারী তারে নির্য্যাতন।
রক্ষা নাই আছে দণ্ড বিধির শাসন॥
নারীদের অধীনতা গৌরব কেবল।
পুরুষের মত তারা নহে উচ্ছৃঙ্খল॥
নারীর বন্ধন আছে তাই সে সংযত।
পুরুষ ঘুরিয়ে শেষে হয় এসে নত॥
উভয়ে স্বাধীন হলে বিশৃঙ্খল হ'ত।
লোকালয় পশ্বালয়ে হত পরিণত॥
সেবিকা বলিয়ে নারী শুধু দাসী নয়।
নারী পাত্রী-ধাত্রী-সখী-মন্ত্রিণী নিশ্চয়॥
নারী যে অমান্য করে গর্বেতে মাতিয়ে।
প্রজ্বলিত অনলে সে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে॥

নারী সে সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মবিঘ্ন নয়।
তারে উপেক্ষিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি হয়॥
সর্ব্ব কর্ম্মে নারী হয় নরের সঙ্গিনী।
নারী বিনা অঙ্গহানি, নারী অর্দ্ধাঙ্গিনী॥
দুই মিলে এক পূর্ণ অর্দ্ধনারীশ্বর।
এক পাশে নারী তার, অন্য পাশে নর॥
কেবা শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট তাহা নাহি জানি।
একের দুইটি অঙ্গ তাই সবে মানি॥
পরস্পর এ মিলন আদিকাল হ'তে।
একেরে চাপিয়া অন্য পারে কি জাগিতে॥
নারীর অবমাননা হয়েছে বলিয়ে।
এই বিপ্লবের বহ্নি উঠেছে জ্বলিয়ে॥
মাতা ভগ্নি সখী জায়া তনয়া রূপেতে।
সন্তানে বিশ্বজননী আছে স্নেহ দিতে॥
তাহা না দেখিয়ে দেখে যে শুধু কামিনী।
কামের খেলনা ভাবে ভোগবিলাসিনী॥
পশুর অধম সেই ভীষণ নারকী।
অচিরাৎ অধঃপাতে যায় সে পাতকী॥
সাধনার অনুকূল নারীর জীবন।
মোর কাছে নারীনিন্দা ক'রো না কখন॥
করিতে পতির সেবা ভাল জানে সতী।
কিরূপে সেবিলে প্রীত হবে বিশ্বপতি॥
করিতে করিতে যত্নে এই পতিসেবা।
স্বতঃই হৃদয়ে জাগে বিশ্বপতি কেবা॥

এইখানে সেই শিক্ষা শিখ নিশিদিন।
আপনারে কভু আর ভাবিও না হীন॥
কত সুধীজন পড়ি নাবার চরণে।
শিখেছে সাধনতত্ত্ব পরম যতনে॥
মজাতে পতির মন সতী ভাল জানে।
বিশ্বপতি বাধ্য হন ঠিক সে সন্ধানে॥

দশম অধ্যায়

আমাদের শাস্ত্র, আমাদের অভিভাবকগণ ছোটবেলা হইতেই মেয়েদের মনে এই সংস্কার প্রবেশ করাইয়া দিতেন যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই জীবন্ত দেবতা—ভগবান্। এই সংস্কারপুষ্ট মন লইয়া মেয়েরা যখন সংসারধর্মে প্রবেশ করিতেন, তখন পারিবারিক শান্তি থাকিত অব্যাহত। স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি লইয়া তাকাইবার ক্ষমতাই যেন আজ হারাইয়া বসিয়াছে। এই স্বামীর ভিতরই যে জগৎস্বামী রহিয়াছেন, এই বিশ্বাসে আর নারীর মন এখন আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে না। না হইলেও, এই স্বামীর ভিতরেই যে জগৎস্বামীর অনুসন্ধান করিতে হইবে—শাস্ত্র এবং গুরুর এই উপদেশ ব্যর্থ হইবার নয়। স্বামীর ভিতর দিয়াই জগৎস্বামীর সেবা করিয়া মেয়েদের জগজ্জননীত্ব লাভ করিতে হইবে। জগজ্জননীত্ব লাভের ইহাই একমাত্র সহজ সরল অব্যর্থ পন্থা। নিছক স্বামীসেবাদ্বারা নারী জননীত্ব লাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে। স্বামীর ভিতর জগৎস্বামীর সেবা করিয়া নারী হয় জগজ্জননীত্ব লাভের অধিকারিণী। ভাবের তারতম্যে ফলেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে স্বামীই একমাত্র স্ত্রীলোকের গুরু। অকপট নিষ্ঠাসহকারে স্বামীসেবাদ্বারা নারী সর্ববিদ্যা এবং ধনের অধিকারিণী হইতে পারে। যোগ না করিয়াও যোগবিভূতি একমাত্র স্বামীসেবাদ্বারাই কি করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি কাহিনী মহাভারতের বনপর্ব্বের চতুরধিকদ্বিশততম (২০৪) অধ্যায় হইতে নিম্নে বর্ণিত হইল।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কশ্চিদ্দ্বিজাতিপ্রবরো বেদাধ্যায়ী তপোধনঃ।
তপস্বী ধর্ম্মশীলশ্চ কৌশিকো নাম ভারত ॥ ১
সাঙ্গোপনিষদো বেদানধীতে দ্বিজসত্তমঃ।
স বৃক্ষমূলে কস্মিংশ্চিদ্ বেদানুচ্চারয়ন্ স্থিতঃ ॥ ২
উপরিষ্টাচ্চ বৃক্ষস্য বলাকা সংন্যলীয়ত।
তয়া পুরীষমুৎসৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য তদোপরি ॥ ৩
তামবেক্ষ্য ততঃ ক্রুদ্ধঃ সমপধ্যায়ত দ্বিজঃ।
ভৃশং ক্রোধাভিভূতেন বলাকা সা নিরীক্ষিতা ॥ ৪
অপধ্যাতা চ বিপ্রেণ ন্যপতদ্ধরণীতলে।
বলাকাং পতিতাং দৃষ্ট্বা গতসত্ত্বামচেতনাম্ ॥ ৫
কারুণ্যাদভিসন্তপ্তঃ পর্য্যশোচত তাং দ্বিজঃ।
অকার্য্যং কৃতবানস্মি রোষরাগবলাৎকৃতঃ ॥ ৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা বহুশো বিদ্বান্ গ্রামং ভৈক্ষায় সংশ্রিতঃ।
গ্রামে শুচীনি প্রচরন্ কুলানি ভরতর্ষভ ॥ ৭
প্রবিষ্টস্তৎ কুলং যত্র পূর্ব্বং চরিতবাংস্তু সঃ।
দেহীতি যাচমানোঽসৌ তিষ্ঠেত্যুক্তঃ স্ত্রিয়া ততঃ ॥ ৮
শৌচন্তু যাবৎ কুরুতে ভাজনস্য কুটুম্বিনী।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ ক্ষুধাসংপীড়িতো ভৃশম্ ॥ ৯
ভর্ত্তা প্রবিষ্টঃ সহসা তস্যা ভরতসত্তম।
সা তু দৃষ্ট্বা পতিং সাধ্বী ব্রাহ্মণং ব্যবহায় তম্ ॥ ১০
পাদ্যমাচমনীয়ং বৈ দদৌ ভর্ত্তুস্তথাসনম্।
প্রহ্বা পর্য্যচরচ্চাপিভর্ত্তারমসিতেক্ষণা ॥ ১১

দৈবতঞ্চ পতিং মেনে ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নান্যচিন্তাভ্যগাৎ পতিম্ ॥ ১৩
তং সর্ব্বভাবোপগতা পতিশুশ্রূষণে রতা।
সাধ্বাচারা শুচির্দক্ষা কুটুম্বস্য হিতৈষিণী ॥ ১৪
ভর্ত্তুশ্চাপি হিতং যত্তৎ সততং সানুবর্ত্ততে।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং শ্বশ্রূশ্বশুরযোস্তথ ॥ ১৫
শুশ্রূষণপরা নিত্যং সততং সংযতেন্দ্রিয়া।
সা ব্রাহ্মণং তদা দৃষ্ট্বা সংস্থিতং ভৈক্ষ্যকাঙ্ক্ষিণম্ ॥ ১৬
কুর্ব্বতী পতিশুশ্রূষাং সস্মারাথ শুভেক্ষণা।
ব্রীড়িতা সা ভবেৎ সাধ্বী তদা ভরতসত্তম।
ভিক্ষামাদায বিপ্রায নির্জ্জগাম যশস্বিনা ॥ ১৭

ব্রাহ্মণ উবাচ—

কিমিদং ভবতি ত্বং মাং তিষ্ঠেত্যুক্তা বরাঙ্গনে।
উপরোধং কৃতবতী ন বিসর্জ্জিতবত্যসি ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ব্রাহ্মণং ক্রোধসন্তপ্তং জ্বলন্তমিব তেজসা।
দৃষ্ট্বা সাধ্বী মনুয্যেন্দ্র সান্ত্বপূর্ব্বং বচোঽব্রবীৎ ॥ ১৯

স্ত্রী উবাচ –

ক্ষন্তুমর্হসি মে বিদ্বন্ ভর্ত্তা মে দৈবতং মহৎ।
স চাপি ক্ষুধিতঃ শ্রান্তঃ প্রাপ্তঃ শুশ্রূষিতো ময়া ॥ ২০

ব্রাহ্মণ উবাচ—

ব্রাহ্মণা ন গরীয়াংসো গরীয়াংস্তে পতিঃ কৃতঃ।
গৃহস্থধর্ম্মে বর্ত্তন্তী ব্রাহ্মণানবমন্যসে ॥ ২১

ইন্দ্রোঽপ্যেষাং প্রণমতে কিং পুনর্মানবো ভুবি।
অবলিপ্তে ন জানীষে বৃদ্ধানাং ন শ্রুতং ত্বয়া।
ব্রাহ্মণা হ্যগ্নিসদৃশা দহেয়ুঃ পৃথিবীমপি ॥ ২২

স্ত্রী উবাচ —

নাহং বলাকা বিপ্রর্ষে ত্যজ ক্রোধং তপোধনং ॥ ২৩
অনয়া ক্রুদ্ধয়া দৃষ্ট্যা ক্রুদ্ধঃ কিং মাং করিষ্যসি।
নাবজানাম্যহং বিপ্রান্ দেবৈস্তুল্যান্ মনস্বিনঃ ॥ ২৪
অপরাধমিমং বিপ্র ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ।
জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাম্ ॥ ২৫
অপেযঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো হি লবণোদকঃ।
তথৈব দীপ্ততপসাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। ২৬
যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি।
ব্রাহ্মণানাং পরিভবাদ্বাতাপিঃ সুদুরাত্মবান্ ॥ ২৭
অগস্ত্যমৃষিমাসাদ্য জীর্ণঃ ক্রূরো মহাসুরঃ।
বহুপ্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৮
ক্রোধঃ সুবিপুলো ব্রহ্মন্ প্রসাদশ্চ মহাত্মনাম্।
অস্মিংস্ত্বতিক্রমে ব্রহ্মন্ ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ ॥ ২৯
পতিশুশ্রূষয়া ধর্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ।
দৈবতেষ্বপি সর্বেষু ভর্ত্তা মে দৈবতং পরম্ ॥ ৩০
অবিশেষেণ তস্যাহং কুর্য্যাং ধর্মং দ্বিজোত্তম।
শুশ্রূষায়াঃ ফলং পশ্য পত্যুর্ব্রাহ্মণ যাদৃশম্ ॥ ৩১
বলাকা হি ত্বয়া দগ্ধা রোষাত্তদ্বিদিতং ময়া।
ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম ॥ ৩২

যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ॥ ৩৩
হিংসিতশ্চ ন হিংসতে তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ॥ ৩৪
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ॥ ৩৫
সর্বধর্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়ীত বা॥ ৩৬
দত্যাদ্বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
ব্রহ্মচারী বদান্যো যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গবঃ॥ ৩৭
বহুধা দৃশ্যতে ধর্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম।
ভবানপিচ ধর্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়নিবতঃ শুচিঃ॥ ৪২
ন তু তত্ত্বেন ভগবন্ ধর্ম্মং বেৎসীতি মে মতিঃ।
যদি বিপ্র ন জানীষে ধর্ম্মং পরমকং দ্বিজ॥ ৪৩
ধর্মব্যাধং ততঃ পৃচ্ছ গত্বা তু মিথিলাপুরীম্।
মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪৪
মিথিলায়াং বসেদ্ব্যাধঃ স তে ধর্মান্ প্রবক্ষ্যতি।
তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রং তে যথাকামং দ্বিজোত্তম॥ ৪৫
অত্যুক্তমপি মে সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত।
স্ত্রিয়ো হ্যবধ্যাঃ সবেষাং যে ধর্মমভিবিন্দতে॥ ৪৬

ব্রাহ্মণ উবাচ—

প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে গতঃ ক্রোধশ্চ শোভনে।
উপালম্ভস্ত্বয়াত্যুক্তো মম নিঃশ্রেয়সং পরম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি শোভনে॥ ৪৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তয়া বিসৃষ্টো নির্গম্য স্বমেব ভবনং যযৌ।

বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানং কৌশিকো দ্বিজসত্তমঃ॥ ৪৮

—"মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাঙ্গোপনিষৎ বেদ অধ্যয়ন করিতেন। একদা ঐ বিপ্র এক বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক বলাকা (বক) ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণ বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া কারুণ্যবস-পরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং আমি রোষবশীভূত হইয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

"তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক বলাকানিধননিমিত্ত এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পূর্বপরিচিত এক গৃহস্থভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।' গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিলে ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ্য দ্বারা অতি বিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ধর্মনন্দন! ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার

উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্যমনে কায়মনো-বাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচারসম্পন্ন, শুচি, দক্ষ ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযতচিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কালযাপন করিতেন। পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতকরতঃ কহিলেন, 'হে বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদায় করিলে না কেন?'

"পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে বিদ্বান্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি, তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না, কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক। তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর, উহা অতি অনুচিত। হে গর্ব্বিতে! মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ শ্রবণ কর নাই। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ, উঁহারা মনে করিলে অনায়াসেই সমুদয় বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে সমর্থ হন।' পতিব্রতা কহিলেন, 'হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আমি বলাকা নহি,

আপনি ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমার কি করিবেন? আমি কদাচ দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করি না। এক্ষণে আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ব্রাহ্মণগণের তেজ ও মাহাত্ম্যের বিষয় বিলক্ষণরূপ অবগত আছি। ব্রাহ্মণের ক্রোধপ্রভাবেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। আর আমি কঠোরতপা মুনিগণেরও প্রভাব জ্ঞাত আছি, তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। দেখুন! দুরাত্মা বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে পরাভব করিয়াই মহর্ষি অগস্ত্যকর্তৃক জীর্ণ হইয়াছে।

'হে বিপ্র! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ প্রভাব শ্রুত হইয়াছি, তাহাদের যেমন ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। হে ব্রাহ্মণ! আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মতে পতিশুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম এবং ভর্ত্তা সমুদায় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান, আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখুন, আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।

'হে বিপ্রেন্দ্র! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম শত্রু। যিনি ক্রোধ-মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্যবাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম-পরায়ণ স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন, যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্বধর্মে রত হন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণ সদা সত্যবাক্য কহিয়া থাকেন, তাঁহাদের মন কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না।

বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম ; অতএব সতত ব্রাহ্মণের কুশল চিন্তা করিবে। প্রাচীনেরা কহেন যে, শাশ্বত ধর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়, উহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শ্রুতিই তাহার প্রমাণ ; ফলতঃ ধর্ম নানাপ্রকার, কিন্তু অতি সূক্ষ্মপদার্থ। আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্মজ্ঞ, কিন্তু বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর্ম জানেন না।

'হে ভগবান্! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্মের মর্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গমনপূর্বক ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে, সে আপনার নিকট ধর্ম কীর্তন করিবে। আপনি তথায় গমন করুন। হে ব্রাহ্মণ! অবলাগণ ধার্মিকদের অবধ্য, অতএব আপনি আমার এই রমণীস্বভাবসুলভ বাচালতাদোষ মার্জনা করুন।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে। তোমার তিরস্কারবাক্য আমার সাতিশয় হিতকর হইল, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি চলিলাম।'

"তপোধন কৌশিক এইরূপে সেই পতিব্রতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।"

পাতিব্রত্যধর্মপালনে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার গৃহস্থ-ভক্তগণকে এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিখুঁত ভাবে, শাস্ত্রের একটি উপদেশ ঠিক ঠিক ভাবে পালন করিলে তাহাদ্বারাই মানবজীবন কৃতার্থ হইতে পারে। সতী-নারীর পক্ষে স্বামীসেবাই ভগবানের সেবা। এই স্বামীসেবাদ্বারা পতিব্রতা নারী যে জ্ঞানলাভ করেন

তাঁহার নিকট বড় বড় যোগী-তপস্বীও মাথা নত করিতে বাধ্য হন। পূর্ব্ববর্ণিত পতিব্রতা নারীর উপাখ্যান হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার এক মেয়েভক্তকে লিখিয়াছেন—"বৎসে! স্বামীই স্ত্রীলোকের গুরু। কায়মনপ্রাণে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন ও তাহার সেবাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। একমাত্র গুরুব্রহ্মজ্ঞানে স্বামীপ্রেমের অধীন থাকিতে পারিলেই নারীজন্ম সার্থক। তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর, আপনি সে স্বামীর কর্ত্তব্যে মনোযোগী হইবে। তোমার মনের আঁধার দূর করা, শিক্ষাদান করা, অধ্যাত্মপথ দেখাইয়া দেওয়া, সমোর্দ্ধপ্রেমমাধুর্য্যে* ডুবাইয়া রাখা স্বামীর কর্ত্তব্য। তুমি কখনও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশা পোষণ করিও না। তাহাকে ছাড়িয়া কোন চিন্তা করিও না। তোমার আমিত্ব স্বামীর আমিত্বে আহুতি দেও। দুই ভুলিয়া দুজনে গুরুতে মিশিয়া যাও। তাহা হইলে, কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত বাণীতে একটি গুহ্য ভাবসাধন-রহস্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। প্রাচীন ঋষিযুগে এই সাধনার ধারাই গৃহে গৃহে বিরাজিত ছিল। স্ত্রী হইবে স্বামী-অভিমুখী, আর স্বামী হইবে ইষ্ট বা গুরু-অভিমুখী। স্বামীকে স্ত্রৈণ হইলে চলিবে না। স্ত্রী স্বামীতে আত্মাহুতি দিবে, আর স্বামী দিবে গুরুতে আত্মাহুতি। তাহা হইলে পরিণামে উভয়েই ইষ্টে লীন হইয়া যাইবে। গৃহস্থধর্মে ইহাই সহজ-সরল ঋষিপ্রদর্শিত ভাবসাধন-পন্থা। ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ঋষিযুগের এই সাধন-প্রণালীর কথাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যে গৃহস্থপরিবারে ইষ্ট বা গুরুর স্থান নাই, সেই পরিবার কখনও আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে স্বামী উন্মাদের

* মৎপ্রণীত "প্রেমসেবোদয় গতি" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে। এইরূপ মাত্রাধিক মনোরঞ্জনের ফলে স্ত্রী ক্রমশঃ নারীজীবনের সুমহান্ আদর্শ ভুলিয়া যাইতেছে। নারীর অন্তরের সেবাবৃত্তি স্ত্রৈণ পুরুষের কাছে কোনদিন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ইষ্টনিষ্ঠ পুরুষ বা স্বামীকে সেবা করিয়াই আদর্শ-নারীর প্রাণে আসে সম্যক্ পরিতৃপ্তি। পুরুষকে নারী হইলে চলিবে না। নারী নারীর সেবা করিতে চায় না। চায় পুরুষেরই সেবা করিতে। পৌরুষবর্জ্জিত পুরুষ যে নারীরই সমতুল্য! কাজেই নারীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আদর্শভ্রষ্ট পুরুষের মধ্যে থাকিবে কেমন করিয়া? নারীকে উন্মাদিনী সাজায় কে? পুরুষত্ব বিহীন পুরুষ। যে যাহার নিকট হইতে যাহা চায়, সে যদি তাহার নিকট হইতে তাহা না পায়—তবেই জাগে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ। আজ সমাজের অবস্থা এইরূপই দাড়াইয়াছে। নারীকে প্রশান্ত ও তৃপ্ত রাখিতে হইলে পুরুষের মাঝে যে বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন, তাহারই সম্পূর্ণ অভাব হইয়া পড়িয়াছে। সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, এই আসল দিক্‌টির প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়া না আসিলে কোন পরিকল্পনা সমাজকে ভারতীয় সুস্থ সবল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। স্বামীই সতী-নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা অবলম্বন। সংযমশিক্ষার ফলে যে নর-নারীর প্রাণে দিব্যভাবের উন্মেষ হইয়াছে—তাহাদের আর অন্য পৃথক্ সাধনার প্রয়োজন করে না। এক মেয়েভক্তকে এই পথে সাধনার ইঙ্গিত দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিয়াছেন—"তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। যদি তোমার চিত্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে, মানবমণ্ডলীকে দেবতার ন্যায় চক্ষে দেখিতে শিখিয়া থাক, মানবীয় বিকার দূর হইয়া থাকে, তবে অক্লেশে স্বামীকে ইষ্টদেবীর স্বরূপ মনে করিয়া সেবাপূজা করিতে পার, কোন

বাধা নাই। স্বামীই ত নারীর ইষ্টদেবতা। পাশবিক ভাব অন্তর্হিত হইলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা ভাবের সাধনা। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি না হয়। তোমার স্বামীকে ইষ্টদেবীর স্বরূপ মনে করিয়া বাহ্যপূজাও করিতে পার। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। মন ঠিক থাকিলেই হইল।'

পাশ্চাত্য শিক্ষার ঢেউ আসিয়া প্রবলভাবেই এখন গৃহস্থ পরিবারকে নাড়া-চাড়া দিতেছে। বিচ্ছেদের কথা সতী-নারী কোন দিন কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। আর আজকাল স্ত্রী কথায় কথায় স্বামীকে বিচ্ছেদের—মামলার ভয় দেখায়। কি শোচনীয় অধঃপতনই না ঘটিয়াছে! যে হিন্দুনারী জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, কোন অবস্থায় স্বামী ছাড়া অন্য কিছু জানিত না, আজ সেই হিন্দু-নারীর মনে প্রগতির বাতাসে বিচ্ছেদের কল্পনাও স্থান পায়। স্বামীর ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া এক মেয়েভক্ত অন্যত্র থাকিবার ইচ্ছা জানাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনুমতি চাহিলে প্রত্যুত্তরে ঠাকুর যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"মঠে আসিয়া তোমার পত্র প্রাপ্তে অবগত হইলাম। দুঃখে-কষ্টে, সম্পদে-বিপদে স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকাই নারীর পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ। তাহাতেও যদি বিঘ্ন হয়, দূরে থাকলেও যদি স্বামী সুখী হন, তবে যে তাহা পারে—সে ধন্যা। কারণ স্বামীর জন্য স্বামীত্যাগ প্রকৃত সতী ব্যতীত অন্যে সম্ভবে না। আর নিজ সুখে নিরাশ হইয়া সরিয়া পড়া ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক, স্বার্থপরতার নামান্তর। তুমি ত তত ছোট নহ।

"বৎসে! স্বামী যদি বিরক্ত না হন, তবে শত জ্বালা সহিয়াও তাহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবাই মহত্ত্ব। নিজের বাসনা-কামনা,

জন্য হিন্দুরমণীর আত্মত্যাগ চিরকাল মানব-জাতিকে বিস্ময়ে—শ্রদ্ধায় অভিভূত করিয়া রাখিবে।

স্বার্থত্যাগের আর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীদেবী। কাত্যায়নীর চরিত্র অর্থাৎ প্রবল ভোগাসক্তি আজকাল ঘরে ঘরেই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। "সংসারের ভোগ-সুখ দিয়া কি হইবে, যাহাতে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, সেই সম্পর্কেই উপদেশ প্রদান করুন"—ইহাই ছিল স্বামীর প্রতি মৈত্রেয়ীদেবীর প্রাণের আবেদন বা প্রার্থনা। সংসারে অধিকাংশ নারীর লক্ষ্য টাকা-কড়ি এবং ভোগ-সুখেই নিবদ্ধ। অন্ধ মানব বুঝে না যে, প্রকৃত সুখ টাকাকড়িতে নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বাসনা-কামনায় অন্ধ এক মেয়ে ভক্ত-শিষ্যকে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন—"যদি টাকাকড়ি, স্বামী-পুত্র হইলেই সুখ হইত, তাহা হইলে জগতে আর নারীজাতি দুঃখী থাকিত না। অতএব আনন্দস্বরূপ ভগবান্ ব্যতীত কেহই সুখী হইতে পারে না। বাগানের অধিকাংশ ফুল বিলাসীর গলার মালা হয়, অল্পসংখ্যক ফুল দেবপদে অর্পিত হয়। বিলাসিনীগণের কলঙ্কিত প্রাণ কোনও দিন ভগবান্ গ্রহণ করেন না। তুই যে কীট-অক্ষতা পবিত্র কুসুম! তাই আমি তোকে ভগবানের পদে অঞ্জলি দিয়াছি। তোর চিন্তা কি—দুঃখ কি?

পার্থিব বস্তুর আসক্তিতে অন্ধ হইয়া যাহাতে গৃহস্থ পরিবারের নারীগণ উচ্চ আদর্শ হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েদের প্রায়ই উপদেশ দিয়া উদ্বুদ্ধ করিতেন। পরিবারে অনেক মেয়ে এখানের কথা ওখানে প্রচার করিয়া অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি করে। নারীদের ভিতর যাহাতে এইসব ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাবের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের আসল তাৎপর্য্য কি, অনেকেই হয়ত সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মেয়ে ভক্তশিষ্যকে এ বিষয়েও প্রতিনিয়ত উপদেশ প্রদান করিতেন। আসল লক্ষ্য ভুলিয়া কেবল গতানুগতিক ভালবাসায় কাহারও যে চিত্তের উৎকর্ষ হয় না—শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই শিষ্য-ভক্তদের এই সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"সধবা নারী স্বামীর মধ্যে ভগবান্‌কে এবং বিধবা নারী ভগবানের মধ্যে স্বামীকে চিন্তা করিবে—ইহাই আমার অভিমত। নতুবা ধর্ম্ম বা ভগবান্ না বুঝিয়া মৃত স্বামীর চিন্তায় কাহারও কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না।" সদ্‌গুরুপ্রদত্ত এই শিক্ষায় যে নারীর চরিত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, কি সধবা কি বিধবা তাহাদের মাঝে লক্ষ্য করিবার মত একটা বৈশিষ্ট্য আপনিই ফুটিয়া ওঠে। অনেক স্ত্রীলোককে দেখি স্বামীর মৃত্যুর পর একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া শেষে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। দুই তিন দিন হয়ত স্বামীর ফটোতে খুব ভাব-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া শেষে সব ভুলিয়া যান। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই এই অবস্থা ঘটে। শ্রীশ্রীঠাকুর সধবা-বিধবার প্রতি যে সাধনার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, সেই পথে চলিলে শোকগ্রস্তা নারীর জীবনেও আসে উন্নত ধরণের এক পরম সার্থকতা। ভাব আরোপ না করিয়া নিছক মৃত স্বামীর চিন্তায় প্রাণে শান্তি আসা অপেক্ষা অশান্তিই বাড়ে শুধু।

উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যেমন তাঁহার ব্রহ্মবাদিনী পত্নীকে উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাহার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে, পত্নীর জন্য কেহ পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাহার জন্যই লোকে পত্নীকে ভালবাসে; কেহই সেই সেই বস্তুর জন্য সেই সেই বস্তুকে ভালবাসে না,

আত্মার জন্যই সেই সেই বস্তুকে ভালবাসে।” শ্রীশ্রীঠাকুরও পতি-পত্নী ভালবাসার মর্ম্মনিহিত এই অধ্যাত্ম সত্যটি তাঁহার সকল মেয়েভক্তদের বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এই তত্ত্বটিকে মূলে রাখি শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার এক মেয়েভক্তকে লিখিয়াছেন—“ভগবান্ অপেক্ষা আপনার কেহ নাই। তাঁহার মত স্নেহ, দয়া কাহারও নাই। তাঁহার মত কেহ ভালবাসে না। পিতামাতার স্নেহ, স্বামীর প্রেম একমাত্র তাহারই স্নেহ-প্রেমের কণা। সুতরাং তাঁহাকে ভুলিয়া পার্থিবভাবে মুগ্ধ হইও না। স্বামী-পুত্রের সেবাও তাহার সেবা জ্ঞান করিবে। কাহাকেও হিংসা নিন্দা-ঘৃণা করিও না। সবই যে তাঁহার বিকাশ! তিনি সকলের সকল—সকলের সব, একথা বিশ্বাস করিও। তবেই একদিন তাঁর প্রেমের অধিকারিণী হইয়া নারীজন্ম সার্থক করিতে পারিবে।”

নারীজন্ম সার্থক করার যে অমূল্য কল্যাণকর উপদেশ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা সধবা-বিধবা নারীমাত্রকেই একবার তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। জাগতিক স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা যে সেই অগাধ ভালবাসার মূর্ত্তি ভগবানেরই স্নেহ-প্রেমের কণা, এই কথাটি স্মরণ থাকিলে এই প্রাকৃত সংসার-রাজ্যও ভগবানের দিব্যরাজ্যে পরিণত হয়। ভালবাসার কাঙ্গাল জীব প্রীতি-ভালবাসার কণা লাভ করিয়া মূল ভালবাসার প্রস্রবণ—ভগবান্‌কেই ভুলিয়া যায়। ইন্দ্রিয়পরবশ জীবকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধান করিতে এইজন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই জগতের যাহা কিছু সবই অপূর্ণ, আভাস, কণা বা ছায়ামাত্র। মূল বস্তু অতীন্দ্রিয়রাজ্যে। পূর্ণের সন্ধান দিবার জন্যই অপূর্ণ জগতে পূর্ণ ভগবান্ আভাসরূপে ধরা দিয়াছেন। আভাসে মজিয়া গেলে পূর্ণের সন্ধান কোন দিন মিলিবে না। সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর এইজন্যই গার্হস্থ্য-জীবনযাপনে আসল ভাবটি

যেন বিসর্জ্জিত না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের অনুপূরক হিসাবে শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত "**মাতৃবন্দনা**' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। কবিতাটি বিগত ১৩৫৮ সালের ১০ই চৈত্র তারিখে আদ্রা (মানভূম) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মাতৃ-সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল।

আদ্রাবাসিনী প্রবাসিনী যত সভায় মিলিত মায়ের দল।
জগন্মাতার অংশ তোমরা বন্দি সবার চরণতল॥
তোমাদেরই এক দীন সন্তান প্রাণের আকুল আবেগভরে।
সম্মুখে আজি দাঁড়ায়েছে মাতঃ গুটি দুই কথা বলার তরে॥
শক্তি দাও গো শক্তিময়ীরা কহিতে মধুর সত্যবাক্।
স্মৃতির ফলকে আজিকার কথা চির অক্ষয় হইয়া থাক্॥
কৌশল্যারূপিণী তোমরাই মাগো শ্রীরামচন্দ্রে দিয়েছ কোল।
যশোদার রূপে কৃষ্ণের মুখে দিয়েছ নবনী মথিয়া ঘোল॥
মায়াদেবীরূপে তোমরাই দেছ বুদ্ধে জনম মায়ের জাতি।
শঙ্করমুখে দিয়েছ স্তন্য তাই তো বিশ্বজয়িনী খ্যাতি॥
শচীদেবীরূপে তোমরাই মাগো নিমাইএ আনিলে ধরার 'পরে।
শ্রীরামকৃষ্ণে তোমরাই মাগো অঙ্কে টানিলে স্নেহের ভরে॥
শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দ তোমাদেরই মাগো আঁচল-ধরা।
নানক কবীর গুরুগোবিন্দে আনিয়া ধন্য করেছ ধরা॥
বিজয়কৃষ্ণ নিগমানন্দ তোমাদেরই মহা তপের ফল।
এনেছ গান্ধী সুভাষে তোমরা সাধন করিয়া প্রতিটি পল॥

তো'দেরই আঁচল-পূর্ব্ব-দিশায় উদিয়াছে মধু নবীন রবি।
উদিয়াছে কত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ঋষি বঙ্কিম কান্তকবি ॥
কত বীর ধীরে দিয়েছ জনম অবতার মহাপুরুষবরে।
নরনারায়ণ তো'দের অঙ্কে এসেছে কত না শ্রদ্ধাভরে ॥
কুমারী উমার রূপ ধরি' কত করেছ জননী কঠোর তপ।
ভোলানাথে বর পাইবার তরে দিবানিশি কত করেছ জপ ॥
শিবসোহাগিনী তোমরা জননী সিদ্ধি আনিলে ধরার 'পরে'
শৌর্য্য বীর্য্য বিত্তৈশ্বর্য্য জনম লভিল তো'দের ঘরে ॥
গণপতি আর দেবসেনাপতি শ্রী ও বাণীর জনমদাত্রী।
তোমরাই যে গো জগৎপূজ্যা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী ॥
ক্ষুদ্র নহ ত তোমরা কখনো স্বরূপে তোমরা বিদ্যাময়ী।
বিদ্যার সাজে সাজাও বিশ্বে নাশি অবিদ্যা জননি অয়ি ॥
মদালসারূপে শিশুসন্তানে দিয়েছ তোমরা স্বরূপজ্ঞান।
দোলনা দোলায়ে বলেছ তাহারে নিরঞ্জন তুমি ভাগ্যবান্ ॥
অম্ভৃণ ঋষির কন্যা তোমরা বাগ্‌দেবীরূপে রচেছ ঋক্।
দেবীসূক্তের রচনাকারিণী বলিয়া ঘোষিছে দশটি দিক্ ॥
গার্গী মৈত্রেয়ী সুলভা তোমরা লীলাবতী খনা বিদূষী যত।
তোমরা লয়েছ বিশ্বজগতে বিশ্বসেবার মহান্ ব্রত ॥
তোমাদেরই কাছে শিখি যে আমরা হেথায় প্রথম মধুর বুলি'
তোমাদেরই স্নেহে দুঃখ-বেদন ব্যথার দহন সকল ভুলি ॥
তোমরাই দাও বক্ষে মোদের স্নেহ-ভক্তির বিমল ধারা।
চক্ষে দাও গো জ্ঞানের দীপ্তি শক্তি টুটিতে মোহের কারা ॥
তোমরাই দাও সাধন জীবনে নবীন প্রেরণা নবীন বল।
শ্রীরামকৃষ্ণ-নিগমানন্দ-জীবন যে দেখি তাহারই ফল ॥

ভৈরবীরূপে দিলে প্রবাহিয়া জীবন তাঁদের নূতন খাতে।
তন্ত্র জ্ঞান ও প্রেমের সিদ্ধি প্রদান করিলে আপন হাতে॥
সেই মা তোমরা জেগে উঠ পুনঃ জাগাও আবার পতিত দেশ।
দেবসন্তানে জনম প্রদানি ঘুচাও কলুষ-কালিমা দ্বেষ॥
মর্ম্মে মর্ম্মে জানি তোমরাই বিশ্বমাতার সরূপ ছায়া।
বিশ্বের সেবা করিছ জননী হইয়া কন্যা মাতা ও জায়া॥
জননীরূপেতে স্নেহধারা দাও কন্যারূপেতে ভক্তি ঢালো।
জায়ারূপে প্রতি পতি-মন্দিরে প্রেমের স্নিগ্ধ প্রদীপ জালো॥
বিদ্যারূপিণী তোমরাই মাগো বিশ্বের কর কালিমা দূর।
অবিদ্যারূপেতে কখনও বা পুনঃ বাজাও হেথায় বেসুরা সুর॥
বিদ্যারূপেতে জেগে উঠ দেবি! সেই রূপই তব দেখিতে চাই।
আমাদের যত কলুষ-কালিমা নিঃশেষে কর পোড়ায়ে ছাই॥
কুমারীরূপিণী হে দেবি আমার পবিত্রতাব মূর্ত্ত কায়া।
তপস্যার ফলে যোগ্য পতিরে লভি হও তাঁর প্রিয়া ও জায়া॥
স্বামীসেবা কর সধবা জননী—তার মাঝে দেখ বিশ্বরাজে।
গোপাল গৌরী আসিয়াছে দেখ তোমার পুত্র-কন্যা-সাজে॥
মধুব্যবহার কর তুমি দেবি পারিপার্শ্বিক সবার প্রতি।
ঊর্দ্ধের পানে চালাইয়া দাও বিশ্বজনের মনের গতি॥
সতী সাবিত্রী তোমরা জননী যমের সঙ্গে লড়াই করি'।
সত্যবানের জীবন প্রদানো বিদিত বিশ্বভুবন ভরি'॥
লখিন্দরের পচা ধ্বসা দেহে তোমরাই আনো জীবনধারা।
তোমরাই সীতা পতি-অনুগতা ভবনে বা বনে আপন-হারা॥
বিধবা জননী মুছে ফেল তুমি তোমার চোখের শোকের জল।
তোমার স্বামী যে ভগবানে লীন জেনে প্রাণে আন নবীন বল॥

ভগবানে তুমি স্বামীরূপে পূজি' পূর্ণ কর গো শূন্য হিয়া।
সন্তানরূপে হের সবাকারে শুদ্ধ স্নেহের পরশ দিয়া ॥
লুণ্ঠিত হোক্ বিশ্বজগৎ জননি তোমার চরণতলে।
মুগ্ধ হইয়া ভাসুক সবাই মাতৃভাবের অমল জলে ॥
জাগো জাগো দেবি জাগো গো জননি জাগিয়া জাগাও বিশ্বপ্রাণ।
তোমরাই পার বিশ্বকে মহা সঙ্কট হতে করিতে ত্রাণ ॥
জাগো জাগো জাগো ভারতের নারী উঠ গো আবার তেমনি জাগি'
কিছু নাহি চাই তোমাদের পাশে শুধু মোরা এই ভিক্ষা মাগি ॥
জাগো জাগো উমা জাগো গো শিবানি নাটোরের রাণী ভবানী জাগো
জাগো চন্দ্রমণি জাগো মা সারদা অবহেলা কভু করিও না গো ॥
তোমাদের শুভ অঙ্গুলি-হেলে নূতন বিশ্ব গড়িয়া উঠে।
তোমাদের শুভ স্নেহের পরশে মরুমাঝে ভাব-বন্যা ছুটে ॥
ছুটাও বন্যা জননীবৃন্দ ধন্য হইয়া আমরা যাই।
পুণ্য পরশে শূন্য হৃদয় পূর্ণ হউক সকল ঠাঁই ॥
ওগো কল্যাণি কল্যাণীরূপে প্রকাশিত হও বিশ্বমাঝ।
শুধু এই বলি তোমাদের পাশে বিদায় মাগিছে এ দীন আজ ॥

একাদশ অধ্যায়

আদর্শ গৃহস্থ-পরিবার গঠনে সধবা নারীসম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এই অধ্যায়ে বিধবা নারী-সম্পর্কে আলোচনা করিব। শ্রীশ্রীঠাকুর বিধবা নারীর আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং দান সম্পর্কে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, মুখ্যতঃ সেইসব উপদেশবাণী অবলম্বনেই ধারাবাহিক আলোচনায় ব্রতী হইব। আদর্শ গৃহস্থ পরিবার গঠনে বিধবাদের দান উপেক্ষণীয় নহে। সমাজে অনেক গৃহস্থ-পরিবারকে একমাত্র বিধবাই ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের অক্লান্ত সেবা, স্বার্থত্যাগ দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়। বিধবাগণের নীরব স্বার্থত্যাগ, পবিত্র আচরণ এবং ভগবদনুরক্তি—পরিবারস্থ সকলকে উচ্চ-আদর্শে সমুন্নত হইবার দিব্যপ্রেরণা প্রদান করে। আজীবন ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করিয়া, কার্য্যদ্বারাই তাঁহারা পরিবারের সকলের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুভ্র বসনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদের অন্তরাত্মার নিষ্কলুষ শুভ্র-প্রভাবই যেন পরিবারের আবহাওয়াকে পবিত্র সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। হিন্দুর ঘরে বিধবা নারী—দেবীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াই বিরাজমানা।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র তাঁহার 'নারী' নাম্নীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—বিধবাদের ত্যাগের প্রভাবেই আমাদের সমাজ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহারা আমাদের দেশের নিষ্কাম-কর্ম্মের ও ত্যাগধর্ম্মের প্রধান শিক্ষয়িত্রীপদে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই ত্যাগধর্ম্মের শিক্ষা বক্তৃতা দিয়া, বই লিখিয়া হয় না। ত্যাগধর্ম্মের, নিষ্কামকর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া—তাঁহাদের আদর্শ-জীবন প্রত্যক্ষ করিয়া তবেই লোকের

ত্যাগধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। নিষ্কামকর্মের—সেবাধর্মের—রিপুজয়ের এই কোমল মাধুরী আমরা সমাজের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই। আত্মীয়দের তাহাতেই কামনা-বহ্নি প্রশমিত হয়, ভোগেচ্ছা সংযত হয়, সহানুভূতি-সহৃদয়তার বিকাশ হয়, অহমিকা শিথিলমূল হয়, ধনগর্ব লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, গৃহ পবিত্র হয়। তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্বে অলক্ষ্যপ্রভাবে আমাদের গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করে।

"আমার কোন বিশেষ মাননীয় ধনী আত্মীয় তাঁহার এক অল্প বয়স্কা কন্যা বিধবা হইলে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করতে যান, তাহাতে তিনি তৎকালীন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রকৃত হিন্দুভাবাপন্ন লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবান্ যে আমার কন্যাকে এই অল্পবয়সেই বিধবার রাজমুকুট (Crown of Widow-hood) পরিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিযাছেন, তাহাতে আমি নিজেকেও ধন্য মনে করিতেছি।"

সদ্যোবিধবা এক মেয়েভক্তকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরও এইরূপ উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—"মা! তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। সংসারে যাহা নিত্যঘটনা, তাহার জন্য বিচলিত হইলে চলিবে কেন? নিত্য কত নারী বিধবা হইতেছে। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত পাতাটি নড়ে না, পলকটিও পড়ে না। সুতরাং তাঁহার মঙ্গলবিধানে যাহা হইয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনা মূঢ়ের কার্য্য। স্বামী লইয়া ভোগবিলাস আর সন্তানপ্রসবই কি নারী-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য? প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, শরৎসুন্দরী, হরসুন্দরী, স্বর্ণময়ী প্রভৃতি বিধবা নারীর ন্যায় কোন্ সধবা সমাজের সমস্ত লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থা হইয়াছে? **সুতরাং বিধবা হওয়া পাপ নহে, বরং পুণ্যেরই উদ্বোধন।** তোমার স্বামী

জগৎস্বামীতে লীন হইয়াছেন। তুমি জগৎস্বামীকেই স্বামী বলিয়া চিনিয়া লও, আর রক্তমাংসধারী মানবের দাসীত্ব করিও না। জীবমাত্রকে সন্তান মনে করিয়া তাহাদের সেবায় জীবনের বাকী কয়েকটা দিন কাটাও, সকল বাসনা-কামনা ভগবানে অর্পণ কর। সংযমসাধনায় নিজের দেবীত্ব—মাতৃত্ব বিকাশ কর, রমণীত্ব দূর করিয়া দাও। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, সব তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহাতেই নির্ভর কর। সবাবস্থায় তাঁহার নাম কর, গুণগান কর, শান্তি পাইবে। সে আনন্দের কাছে সংসার মলিন হইয়া যাইবে, সংসারভোগে ঘৃণা জন্মিবে।"

বৈধব্যের মুকুট পরিধান, আর 'বিধবা হওয়া পাপ নহে বরং পুণ্যেরই উদ্বোধন'—প্রায় একই কথা। যে সত্যতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, নিবিষ্টচিত্তে তাহা ভাবিলে প্রাণে পরম সান্ত্বনা এবং অনাবিল শান্তি আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রদত্ত উপদেশগুলি বিধবাদের পক্ষে উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ। বিধবাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া অদূরদর্শী এবং অপরিণামদর্শী দরদী (?) লেখক বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন, আর সত্যদ্রষ্টা মহামানবের উপদেশে আছে সমাধানের এক অপূর্ব দিব্য সঙ্কেত।

এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কি চমৎকার, তাহা পণ্ডিত যামিনীকান্ত সাহিত্যভূষণপ্রণীত 'ললনামঙ্গল গীতামৃত' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

বিধবার সৌভাগ্যবর্ণনযোগ

শ্রীকৃষ্ণ—

ভাগ্যবতী বিধবারে কে বলে দুর্ভাগ্য।
যে বলে দুর্ভাগ্য সে যে নাহি চিনে ভাগ্য

যেথা অতি অমঙ্গল দেখিছ কেবল।
সম্যক্ দর্শন হ'লে দেখিবে মঙ্গল॥
করিতেছি বিধবার সৌভাগ্য বর্ণন।
একমনে তুমি তাহা করহ শ্রবণ॥
বিধবা থাকে না মগ্ন বিলাস-ব্যসনে।
বিষয়ের চিন্তা তার নাহি আসে মনে॥
নিমগ্ন থাকিতে পারে ঈশ্বর-চিন্তায়।
সংসারের আবর্জ্জনা সব ঠেলি পায়॥
নাহি শঙ্খ বালা হার কোন অলঙ্কার।
দাসত্বশৃঙ্খল তারে নাহি বাঁধে আর॥
বিধবার সর্ব্ব অঙ্গ মুক্তির লক্ষণ।
দেখিবার চক্ষু যার সে করে দর্শন॥
ব্রহ্মচর্য্য পালনের অমন সুযোগ।
বিধবার ভাগ্যে আছে করিতে সম্ভোগ॥
একাহার নিরামিষ পবিত্র ভোজন।
সাধনার অনুকূল বৈধব্যজীবন॥
সদাচার অনাহার একাদশী দিনে।
করে তার সহায়তা রিপুর দমনে॥
যম-নিয়মাদি যোগ পারে শিখিবারে।
সংসারের কেহ তারে বাধা দিতে নারে॥
ভবের অস্থায়ী সুখে বিধবা বঞ্চিত।
আধ্যাত্মিক সুখদ্বার তার অবারিত॥
পারিলে বিধবা পারে অনিত্য ত্যজিয়ে।
নিয়ত নিত্যের ধ্যানে থাকিতে মজিয়ে॥

নারীর বৈধব্য-ব্রত পরম গৌরব।
পুরুষের ভাগ্যে তাহা না হয় সম্ভব॥
মৃতদার তরে নাহি কঠোর শাসন।
তাই পুনঃ পরে গলে বিবাহ-বন্ধন॥
যত সে অনিত্য সুখ করে আস্বাদন।
ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে না হয় পূরণ॥
এইরূপে ধীরে ধীরে আসে যবে কাল।
ভাবে সে দুর্লভ জন্ম হইল বিফল॥
তবে কোন ভাগ্যবান্ আপনি বুঝিয়ে।
ক্ষান্ত হয় একবার রস আস্বাদিয়ে॥
একবার ভুল করে তত্ত্ব নাহি জানি।
পুনর্বার সেই ভুল নাহি করে জ্ঞানী॥
এ ভুল কেমনে হায় এড়াইবে নর।
যাহার বন্ধন পরে বিধি বিষ্ণু হর॥
এই ভ্রান্তি সৃজিয়াছে এই বিশ্বলীলা।
মননে দেখিতে পাবে বিশ্রামের বেলা॥
সুধীজন ক্লান্তিবোধে ছেড়ে দেয় খেলা।
অজ্ঞগণ সে মর্ম না জেনে ভোগে জ্বালা॥
পুনঃপুনঃ ভোগে কাম শান্ত নাহি হয়।
ঘৃতাহুতি পেয়ে অগ্নি দ্বিগুণ বাড়য়॥
পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সবে বলে।
বুঝিয়ে চলুক তারা নিজ বুদ্ধিবলে॥
কিন্তু সে অবলা জাতি স্বভাব দুর্বল।
তার তরে শাস্ত্রবিধি সম্বল কেবল॥

সংযম শিখেছে নারী শাস্ত্রের শাসনে।
কুপথে চলিতে সদা ভয় পায় মনে॥
করিছে অভ্যাস-যোগে সাধন সফল।
কে লইবে অবলার এই ভাগ্য বল॥
সবল সন্তানগণ স্বীয় পদে চলে।
অবলারে বেঁধে স্নেহে রাখে পিতা কোলে।
শাস্ত্রের বন্ধন তাই নহে নিরমম।
দেশ কাল পাত্র-ভেদে বিভিন্ন রকম॥

উত্তরা—বুঝিলাম প্রভো তব শাস্ত্রের বিধান।
অবিরত সমাজের সাধিছে কল্যাণ॥
কিন্তু বিধবার দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়ে।
পারি না থাকিতে কিছু নাহি জিজ্ঞাসিয়ে।
বীরাঙ্গনা হয়ে মোর এত যদি শোক।
এ বিপদে না জানি কি করে অন্যলোক॥
বিষয়ভোগবিলাস মিটেনি যাহার।
সংযত থাকিতে সাধ্য আছে কি তাহার?
কি উপায় হবে তার বল দয়া ক'রে।
তোমা বিনা এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিব কারে॥
কত সাধ জাগে বাল-বিধবার মনে।
দেখিয়ে সধবা প্রিয় সহচরীগণে॥
অন্য পতি-সঙ্গলাভ যদি ইচ্ছা হয়।
কি করিবে সে অভাগী বল সে সময়॥
অবলার পতি যদি হয় নষ্ট, মৃত।
কিম্বা হয় প্রব্রজিত, ক্লীব বা পতিত॥

এ পঞ্চ আপদে দেখি শাস্ত্রের প্রমাণ।
অন্য পতি গ্রহণের রয়েছে বিধান॥

শ্রীকৃষ্ণ—ভিন্ন পথ ভিন্ন মত ভিন্ন ঋষিগণ।
আমার ইঙ্গিতে নিত্য করে প্রণয়ন॥
বড়ই বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বলীলা।
ভিন্নরুচি ভিন্ন বিধি বিধাতা সৃজিলা॥
কেহ বলে বহু পত্নী হয় প্রয়োজন।
কেহ বলে এক পত্নী করিবে গ্রহণ॥
কেহ বলে মৃতদারে কর পরিণয়।
কেহ বলে কভু তাহা সমুচিত নয়॥
কেহ বলে বিধবারে ধর অন্য পতি।
কেহ বলে ব্রহ্মচর্য একমাত্র গতি॥
কেহ টেনে রাখে সদা অনিত্যের পানে।
কেহ বলে এস এস নিত্যনিকেতনে॥
যাহার যেমন রুচি সেই দিকে ধায়।
নিত্যানিত্য তত্ত্বকথা বলিব তোমায়॥
সাধনের উপযোগী বৈধব্যজীবন।
বিধির নিয়মে যদি করে আগমন॥
আর না কর্তব্য বৃথা সময় ক্ষেপণ।
উচিত মোক্ষের লাগি সাধন-ভজন॥
কি করিতে আসে জীব কি করিয়া যায়।
বারেক চিন্তিয়া তাহা নাহি দেখে হায়॥
এমন সুযোগ পেয়ে যে জন হারায়।
তার তরে অপেক্ষিছে জলন্ত নিরয়॥

সুখ-আশে অলিগণ ফুলে ফুলে ধায়।
নিয়ত জ্বলিয়ে মরে সংসার-জ্বালায়॥
যাহারে সে সুখ বলি করে আলিঙ্গন।
তাহা তার হয় পুনঃ দুঃখের কারণ॥
কল্যাণি! অনিত্য খেলা হ'ল তোর শেষ।
আনন্দে করিবি নিত্য নিত্যের উদ্দেশ॥
শিখাইব বিধবার সাধনের কথা।
তাহা পেয়ে কারো যদি নাহি ঘুচে ব্যথা॥
অথবা স্বেচ্ছায় চরে আবরি নয়ন।
মম প্রদর্শিত পথ না করে দর্শন॥
অন্য পতি গ্রহণের প্রয়োজন তার।
কদাপি বিহিত, কিন্তু নহে ব্যভিচার॥
সমাজের শৃঙ্খলা শান্তি রক্ষার কারণ।
কষ্টেও সংযম ব্রত পালে বিশ্বজন॥
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি প্রমাণ।
নিতান্ত দুর্ভাগাদের করিতে কল্যাণ॥
কেবল ইন্দ্রিয়সুখ চাহে ভবে যারা।
ও নিয়ম না থাকিলে কোথা যাবে তারা॥

উত্তরা—

না প্রভো! তাদের কথা কি ফল শুনায়ে।
তোমার পবিত্র পথ দাও হে দেখায়ে॥
শুনিব তোমার কথা, তোমা কাছে রব।
অমৃত ত্যজিয়ে কেন গরল সেবিব॥

সংসার-গহন-পথে নিবিড় আঁধার।
তব পুণ্যালোক দেব ভরসা আমার॥
চলিতে চলিতে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি।
তুমিই চালাবে মোরে হাতে হাত ধরি

গৃহস্থ-পরিবারে বিধবার আসন সকলের উর্দ্ধে, কেন-না দেবকার্য্যের একচেটিয়া অধিকার হইল বিধবার। পবিত্রতার মূর্ত্তি—বিধবা। বিধবার সহায়তা ব্যতীত সংসারে কোন দেবকার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। বিধির বিধানে সর্বদা যাঁহাদের দেবকার্য্যে থাকিবার অপূর্ব সুযোগ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের জীবন কি অভিশপ্ত জীবন? পার্থিব পঙ্কিল-ভোগ হইতে যাঁহাদের জীবনকে ভগবান্ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন, কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিয়া, দরদী সাজিয়া তাঁহাদিগকে ভোগপঙ্কে টানিয়া নামানই কি মহত্বের পরিচয়? অদৃষ্ট, কর্মফল এবং প্রারব্ধভোগের মধ্যে কি কোন গভীর তাৎপর্য্য নিহিত নাই? অভিযোগ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া নীচস্তরে নামিয়া আসা অপেক্ষা—নীরবে ভগবদ্বিধানকে মানিয়া প্রশান্ত-চিত্ত হওয়াই কি শ্রেয়ঃ নহে? ভগবদ্বিধানের মঙ্গল উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, বিধবার পবিত্র জীবনকে ভোগ-লালসায় উত্তেজিত করিয়া তোলাই কি প্রকৃত দরদীর লক্ষণ? বিধবার লক্ষ্য এবং কর্তব্য কি, সে সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া এক বিধবা মেয়েকে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন —"তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবা, অবশ্য মঙ্গলময় বিধাতা মঙ্গলোদ্দেশ্যেই এ জীবনে তোমার ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে জীবনের পবিত্রতার উদ্বোধন করাই তোমার জীবনের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য। স্বামীকে

যতদিন জগৎস্বামীরূপে ধরিতে না পারিবে, ততদিন গৃহে থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে—সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে হইবে। পিতা-মাতার সেবাও ধর্ম। তদ্ব্যতীত সকলকেই সন্তান-জ্ঞানে সেবা করিবে। শত্রু-মিত্র যে-ই হউক, বিপদে সাহায্য করিবে, পীড়ায় সেবা করিবে, শোকে সান্ত্বনা দিবে। পতিতাকে ঘৃণা না করিয়া, তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিবে। জীবমাত্রেই ভগবানের সন্তান, সুতরাং তুমি তাহাদের মায়ের স্থান অধিকার করিতে যত্ন করিবে। আর অন্তরে কবে তাঁর সহিত মিলন হইবে সেইদিনের অপেক্ষা করিয়া সর্বদা তাঁহার নাম লইবে। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক সর্বাবস্থায় তাঁহার জয় উচ্চারণ করিবে। সর্বস্ব তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই শরণাগত হইয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে। তোমার ছোট বোনটিকেও তোমার পথেই পরিচালিত করিবে এবং তদনুসারে শিক্ষাদি দিবে। সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে নিজেকে সাবধানে দূরে রাখিবে। চিত্ত বেশী চঞ্চল বা নীচের দিকে যাইতে চাহিলে প্রাণপণে ভগবানের নাম লইবে। নিজেকে রক্ষা করিতে তাঁহার উপরই ভার দিবে।"

সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে নিজেকে সাবধানে দূরে রাখিতে হইলে, অবাধ মেলামেশার পথকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। নারীদের যত কিছু সম্পত্তি আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পত্তি হইল—সতীত্ব। বিধবার জীবনের এই সতীত্বরক্ষার ব্রত আরও সুকঠিন। এই ব্রত রক্ষা করিতে হইলে কঠোর সংযমের একান্ত প্রয়োজন। এই নিয়মগুলি পালন করা অত্যন্ত কঠিন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু কামজয় করিবার সহজ উপায়ও ত এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। উপবাস করা, বিলাসিতা ত্যাগ করা, পুরুষদিগের সঙ্গে সচরাচর না মেশা, ব্রতপালন, পূজাদি করা—সবই সংযমশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু বিধবারা

এই সব নিয়মপালন করিয়া দীর্ঘজীবনলাভ, অটুট স্বাস্থ্য এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতার জন্য প্রসিদ্ধ। রোমান্ ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা (Monks & nuns) স্ব-ইচ্ছায় এই নিয়মগুলি পালন করেন। যাঁহারা কোন উচ্চ আদর্শে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেব সকলের পক্ষেই ঐ সকল নিয়ম উপযোগী। কামজয় বড়ই কঠিন। পুরুষদিগেব সহিত অবাধ মেলামেশা থাকিলে অনেক সময় ক্ষণিক মানসিক দুর্বলতার জন্য সধবাদেরও (কুমারী বা বিধবাদের কা কথা) পদস্খলন হয়। এইজন্যই সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে নিজেকে সাবধানে দূবে রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বিধবা মেয়েদের বিশেষ সতর্কবাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উপযুক্ত মনের বল সঞ্চিত হইলেও অবাধ মেলামেশার ফলে পদস্খলন হইতে দেখা যায়, আর যাহাদেব মানসিক প্রস্তুতি মোটে হয় নাই, তাহারা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? বর্তমানে এই অবাধ মেলামেশা বা সম্মিশ্রণেব দিনে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা আরও কঠোরভাবে প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। নারী এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক্ হইলেই সর্বাপেক্ষা মঙ্গল। নারী-পুরুষেব অবাধ মেলামেশার ফলে যে কি ব্যভিচার-স্রোত ঘবে ঘরে চলিয়াছে, তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও চিত্রগুপ্তের খাতা হইতে মুছিয়া ফেলিবার নয়। এইরূপ একটা ব্যভিচারস্রোতের উপর কি আর আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে? কাজেই সকলেরই সাবধান-সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা বলিতে মনুষ্যত্ব অর্জন এবং চরিত্রগঠনকেই বুঝায়। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে নারীদিগের সতীত্বরক্ষা সম্বন্ধে যে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে, তাহা মারাত্মকভাবে চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নৈতিক-চরিত্রহীন উপাধি অর্জন করিলেও তাহা পরিশেষে ব্যাধিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যৌথ-পরিবারপ্রথা থাকায় আমাদের নারীদের অর্থোপার্জনের

স্বার্থসংঘর্ষে কোনদিন আসিতে হয় নাই ; কিন্তু বর্তমানে সেই প্রথা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, কাজেই সধবা বিধবা সকল নারীকেই অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে নামিতে হইতেছে। স মান্য শিক্ষালাভ করিয়াও চারিত্রিক বলে আমাদের দেশের বিধবারা যে শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে হয়। খুব বেশীদিনের কথা নয়, ভুলিয়া যাইবার মত অতীতের ঘটনাও নয়—বিধবা রাণী রাসমণির কথা চিন্তা করিলেই ত হয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র 'নারী' গ্রন্থের একজায়গায় লিখিয়াছেন—"এ দেশে কর্মনিপুণা এবং ধর্মশীলা বিধবা নারীর কোন কালেই অভাব হয় নাই। এইজন্যই কেবল ভারত-ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'অশিক্ষিতা' বা সামান্য প্রাথমিক শিক্ষামাত্রপ্রাপ্ত বিধবারা বিপদের সময়েও রাজ্যভার লইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন—তাঁহাদের সুখ্যাতি ও কীর্ত্তিতে ভারত-ইতিহাস সমুজ্জ্বল। পুণ্যশীলা অহল্যাবাই, রাণী কর্মদেবী, রাণী দুর্গাবতীর জীবনকথা আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই বিদিত। তদপেক্ষা সঙ্কীর্ণ কর্মক্ষেত্রে রাণী ভবানী, লক্ষ্মীবাই ও শরৎসুন্দরীর নামও উল্লেখযোগ্য।

"এইরূপ প্রকৃত মহত্ত্বের অধিকারিণী গার্হস্থ্য-জীবনে ত্যাগশীলা, সেবাপরায়ণা, পরোপকাররতা বিধবারা এখনও গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে বিরাজিতা। তাঁহাদেরই প্রভাবে এখনও গ্রামে গ্রামে জলাশয় আছে, তাহাতেই সাধারণের জলকষ্ট নিবারিত হয় ; ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা, ধর্মশালা আছে—অনাথ, ভিক্ষুক, পরিব্রাজকরা আশ্রয় পায়। রোগ-শোক-ক্লিষ্টরা কাহার কাছে প্রধানতঃ সেবা পায়? কে তাহাদের জন্য রাত্রি জাগরণ করে?—কে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেয়? কে মাতৃহীনদের মাতার স্থান অধিকার করে? কে অপত্যপালনে মাতাদিগকে সাহায্য

করে? সেই একবসনা, একাহারা, পরসেবাব্রতরতা, প্রশান্তগম্ভীরমূর্ত্তি মহীয়সী হিন্দু-বিধবা। এই বিধবাদের জীবনের দৃষ্টান্তপ্রভাবেই এবং স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহাদিগকে এইরূপ সর্বত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া সকল নারীই বিলাসাসক্তি ত্যাগ করিতে শিখেন, সর্বত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়, ত্যাগ করিবার উপযুক্ত হৃদয়বল দৃঢ়ীভূত হয়— অন্যের দুর্ব্যবহারে তাঁহাদিগের কর্তব্যজ্ঞান শিথিল হয় না—হৃদয়ে বল পান। এইরূপ সকলেই ত্যাগশীলতার, পরার্থপরতার, প্রকৃত মহত্ত্বের অধিকারিণী হয়েন, প্রকৃত মহত্ত্বের অনুসরণ করিতে কোন ত্যাগস্বীকারে কুণ্ঠিত হন না—সকলের উপর সে প্রভাব বিস্তৃত হয়। আমাদের নারীদিগের এই গুণেই আমাদের গৃহে শান্তি প্রীতি ও তৃপ্তি আছে, সামান্য কলহে— পরস্পরের সামান্য ত্রুটিতে পাশ্চাত্যের মত গৃহদাহে পরিণত হয় না।"

বিধবার জীবনে ভগবানের কৃপা করুণা লাভের অপূর্ব সুযোগ ঘটে বলিয়াই বৈধব্যজীবন যন্ত্রণাপ্রদ না হইয়া অপরূপ শান্তিময় হইয়া দাঁড়াইত। বর্তমানে শিক্ষা এবং সংযমের অভাবই অল্পবয়স্কা বিধবাকেও ভোগপঙ্কে নামিয়া আসিবার প্রবৃত্তি দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-শিক্ষা বিধবার জীবনকে আরও পবিত্রতামণ্ডিত করিয়া তুলিবারই সাহায্য প্রদান করিত। জীবনে অভিযোগ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করা অপেক্ষা, অবনত মস্তকে ভগবদ্‌বিধানকে মানিয়া লইবার প্রবৃত্তিই তখনকার শিক্ষার মাঝে নিহিত ছিল। জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলে বিশ্বাসই ভারতীয় শিক্ষার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। যে ভারতবর্ষে কতই না কল্যাণপ্রদ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ উন্নতির নামে সেই সকল মতবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া পাশ্চাত্যের অশান্তিসৃষ্টিকারী ভোগবাদকেই জীবনের সার-সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই ঘরে-বাইরে আজ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাপণে, বিধবাদের

ত্যাগমণ্ডিত জীবনের আজ বিশেষ প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী, জগৎ-কল্যাণ-বিধায়িনী আদর্শ বিধবারমণী আজ জগতের অশান্তি-অনল নির্বাপণে অগ্রসর হইয়া আসিবেন না কি? বিধবাদের জীবনে ত্যাগের হোমানলকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবে কে? আজ সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের কল্যাণ-বাণীরই একান্ত প্রয়োজন। সেইসব বাণী জগতে যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

অল্পবয়স্কা একটি বিধবাকে তাহার জীবন-পরিচালনার পথ-নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"তোমার অপূর্ণ আসক্তি ও বাসনাই শ্রীভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবে। ভোগে মানুষের চিত্তকে দুর্বল করিয়া ফেলে, তাই সে আর ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। যৌবনের উদ্দাম লালসাই প্রেম-ভক্তির সোপান। প্রেমিকগুরুতে বোধ-হয় রূপানুগা ও কামানুগা প্রভৃতি ভক্তির বিষয় পাঠ করিয়াছ। সংসারে যে বিশেষ কোন সাধ তোমার পূর্ণ হয় নাই, তাহাও ভগবানের কৃপা। এখনই সেই সাধনার ধনকে লইয়া সাধ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হও। তোমার সর্বস্ব তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাক। শ্রীরাধা যেমন বাসরশয্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য সারারাত্র উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেন, তুমিও তেমনি শ্রীভগবানের প্রতীক্ষায় তোমার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বসিয়া থাক। এই ত সাধনা!-যোগ, জপ, তপ,—ইহার অনেক নীচে। আশীর্বাদ করি, তুমি তোমার প্রাণের দেবতার নাম-রূপে দিন দিন আত্মহারা হইয়া পড়।"

অপূর্ণ আসক্তি এবং বাসনা যে মানুষকে নরকে না ডুবাইয়া ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে, বিধবাদের পক্ষে ইহা একটি অভিনব আশার বাণী। যে শক্তির অপব্যবহার করিয়া নর-নারী ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়, সেই শক্তির সাহায্যেই মনদ্বারা পবিত্র

সুখস্বরূপ ভগবানের সান্নিধ্যও লাভ করিতে পারে। ভালবাসার বস্তু, বিষয় বা অবলম্বনকে ভগবান্ মনে করিয়া তাহার দিকে একাগ্র মনঃসংযোগ করিলে সকল অভাব এবং হাহাকাব মিটিয়া যায়। বিধবার জীবনেও রিক্ততা দূর হইয়া পূর্ণতা আসে।

আশ্রয় ব্যতীত কোন মানুষই থাকিতে পারে না। পূর্বে স্বামীহারা নাবীর হৃদয়ের রিক্ততা দূর কবিবাব জন্য কোন না কোন একটি ভগবদ্‌বিগ্রহকে আশ্রয়স্বরূপে প্রদান কবা হইত। সেই ভগবদ্‌বিগ্রহ বৈধব্য জীবনের অসহনীয় দুঃখ-ক্লেশকে বিদূরিত কবিয়া পবম শান্তিতে বিধবার জীবনকে পবিপূর্ণ করিয়া তুলিত।

স্বামী জগৎস্বামীতে মিশিযা গিযাছেন, এই ধারণা বিধবার জীবনে স্বাভাবিক ছিল বলিয়াই জগৎস্বামীকে কোন দেববিগ্রহরূপে সেবা-পূজা করিতে বিধবার প্রাণ আনন্দেই উল্লসিত হইয়া উঠিত। পার্থিব আশ্রয়হারা হইয়া বিধবা নারী পারমার্থিক আশ্রয়কেই জীবনেব একমাত্র অবলম্বনীয় সম্পদ্ বলিয়া গ্রহণ করিত। বিধবাব রিক্ত জীবনকে দেববিগ্রহ কিরূপ আধ্যাত্মিক আনন্দে ভরপুর করিয়া রাখিত, তাহার একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। দেব-বিগ্রহকে ধাতু-পাষাণ-মাটিব মূর্ত্তি মনে না করিয়া স্বামীর মতই প্রাণবন্ত বলিয়া বিধবারা ধারণা পোষণ করিত। এইজন্যই আরাধ্য-দেবতার সঙ্গে তাহাদেব জীবন-মরণ-গ্রন্থি সংগ্রথিত থাকিত। স্বামী কৃষ্ণানন্দ প্রণীত "ভক্তি ও ভক্ত" গ্রন্থের শেষে যে কাহিনীটি বর্ণিত আছে, নিম্নে তাহারই কিয়দংশ হুবহু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন ভগবদ্‌ভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একদিন গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটি মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত কি ভাসিয়া

যাইতেছে। তাহার নীলোজ্জল বর্ণ ও হস্তপদাদির দিব্য শোভা দর্শনে ব্রাহ্মণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। বোধ হইল যেন গঙ্গার তরঙ্গে একটি প্রস্ফুটিত সুনীল কমল ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্তব্রাহ্মণ আর থাকিতে পারিলেন না, সেইটি ধরিবার জন্য স্রোতোভিমুখে বেগে সন্তরণ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ইহাও প্রতীত হইতে লাগিল, যেন সেই মূর্ত্তিটি, 'আমাকে শীঘ্র ধর ধর' বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিতেছে। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে ভক্ত-হৃদয়ে আরও ভক্তির তরঙ্গ বাড়িল, প্রেমের প্রবাহ শতগুণ বেগে ছুটিল। ব্রাহ্মণ শীঘ্রই মূর্ত্তিটি ধারণ করিলেন এব কোলে হইয়া কূলে উঠিলেন। দেখিলেন, শ্যামোজ্জল আনন্দময় মুখ-মণ্ডল অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরির—গোপীকুলবিহারী ত্রিভঙ্গ বংশীধারীর শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার কোলে আসিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছে। প্রভু যমুনা পার কালে একবার বসুদেবের ক্রোড়ে উঠিয়াছিলেন, আর আজ ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য গঙ্গাসলিলচারী হইয়া ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে আসিয়া উঠিলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের প্রতি কখন কি ভাবে দয়া করেন, তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির দুরধিগম্য। ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না। জন্ম-জন্মান্তরসাধিত বহু তপস্যার ধন পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মন-প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল। আগ্রহসহ এই শ্রীবিগ্রহকে ক্রোড়ে লইয়া সবেগে নিজ বাটীতে সমাগত হইলেন এবং যথাস্থানে যোগিজনদুর্লভ ভক্তপ্রাণবল্লভের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত সেবায় নিযুক্ত হইলেন। * * * কিছুদিন সেবা করিতে করিতে ভক্তব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠবাস করিলেন এবং তাঁহার পুত্রবর্গ একটি একটি করিয়া সকলগুলিই কাল-কবলে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণের একটি মাত্র কন্যা ছিলেন, তিনিও বিধবা হইলেন। কন্যাটি অতি ভক্তিমতী ছিলেন, তিনি পিত্রালয়ে থাকিয়া এই ত্রিজগৎকর্ত্তা ভর্ত্তার সেবায় তৎপর থাকিলেন।

"ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে একজন যোগাঙ্গসাধনপটু সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে গুপ্তিপাড়া গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই নাম শ্রীমৎ স্বামী সত্যদেব সরস্বতী। যোগিবর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিতেন, এবং নিজ কুটীরে বসিয়া নির্জ্জনে নিরঞ্জনের সাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই মহাপুরুষ কিছুদিন গুপ্তিপাড়ায় সাধন করিতে করিতে কে জানি কাহার প্রেরণায় গঙ্গার পরপারে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সেইদিন নিশাবসানের পূর্ব্বে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র আসিয়া বলিতেছেন, 'তুমি আমাকে লইয়া আইস এবং এইখানে প্রতিষ্ঠা কর।' এই আদেশ পাইয়াই সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিরবলম্বন সাধু পরপারে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহে লোকজনের বড় সাড়াশব্দ নাই, বালক-বালিকার কোলাহল নাই, অথবা কেহ সে বাড়ীতে থাকে বলিয়া অকস্মাৎ বোধ হয় না। সরস্বতী স্বামী ধীরে ধীরে গৃহের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন—সেখানে পুরুষের নাম-গন্ধও নাই, কেবল একটি সুরূপসী নারী বিজনে আসনে বসিয়া সম্মুখস্থ ত্রিজগন্মনোহর একটি অপূর্ব্ব কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিতেছেন এবং মনের মত নৈবেদ্য সাজাইয়া ভক্তিভরে ভগবান্‌কে উৎসর্গ করিতেছেন। নিভৃত-নিলয়ে সরস্বতী স্বামীজী দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন এবং দেখিলেন যেন প্রভুর ঐ কামিনীর করকমলসজ্জিত, নিবেদিত মিষ্টান্নরাশি ভোজন করিতেছেন। যাহা কেহ কখন দেখিতে পায় না, যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় না, ভগবান্ স্বয়ং না দেখাইলে যাহা জীবের কোন ক্রমেই দেখিবার উপায় নাই, তাহাই আজ কৃতকৃত্য সাধু দর্শন করিয়া নিজ নয়ন পরিতৃপ্ত করিলেন এবং তাঁহার যেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যে, ঐ যোগিজনমনোমোহন

বিগ্রহ তাঁহার সহিত আসিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহাও বুঝিলেন, ইনিই স্বপ্নদৃষ্ট সেই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র।

"সাধু দেখিলেন, ঐ ভক্তিমতী যুবতী ভগবানের অকপট প্রেমে সাশ্রু-লোচনে গদ্‌গদ বচনে ভগবচ্চরণে কতই স্তুতিবাদ করিতেছেন। সন্ন্যাসী ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে এবং নিকটে অনুগত ভক্তকে দর্শন করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলেন। ক্ষণবিলম্বে ঐ ভক্তিমতী সাধ্বী সতী আসন হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণে একজন তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী বিরাজমান। অমনি তিনি সসম্ভ্রমে চকিতহৃদয়ে গিয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো! আপনি কে? কোথা হইতে কি জন্য এই দেবনিকেতনে আগমন করিয়াছেন?' সাধু ভগবানের ভোজন-দর্শনে ও সাধ্বী-সতীর ভক্তিভাবে বিমুগ্ধ হইয়া নিজেও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন, ভক্তিমতীর সুমধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মা! আমি একজন ক্ষুদ্র জীব—সন্ন্যাসাশ্রমী, ভিক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।' সাধ্বী এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন, 'আপনি যথাভিরুচি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এই দুঃখিনীকে কৃতার্থ করুন।' ইহা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন,—'আমি দণ্ডী, অগ্নি স্পর্শ করা আমার পক্ষে নিষেধ, অতএব আপনি যে অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়াছেন ঐ অন্নভিন্ন অপর কিছু ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।' সাধ্বী তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। সাধু কহিলেন, 'এই ভিক্ষার দক্ষিণা চাই, কিন্তু আমি টাকা কড়ির প্রয়াসী নই।' সতী বলিলেন 'বাবা! তবে কি দক্ষিণা দিব?' সাধু কহিলেন, 'আপনার ঐ দেবমূর্ত্তিটি।' সাধ্বী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'ঠাকুর! একটি ভিন্ন আর যাহাই চাহিবেন, তাহাই দিব।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'মা! তবে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল না।' ব্রাহ্মণকন্যা তখন মনে মনে

ভাবিতে লাগিলেন যে, 'প্রভু আজ আমাকে কি ঘোর বিপাকেই ফেলিলেন। অতিথি সন্ন্যাসী অনাহারে গৃহ হইতে ফিরিয়া যাইবেন, ইহাও তো মহাপাপ! প্রভু-বিরহে আমি অনাথা হইয়া থাকিব সে-ও ভাল, তথাচ অতিথিসেবায় অবহেলা করিব না।' প্রকাশ্যে বলিলেন, 'নারায়ণ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, আপনি প্রসাদ গ্রহণ করুন।' সন্ন্যাসীকে পক্কান্ন প্রসাদ ব্যঞ্জনাদি সেবা করিতে দিয়া সাধ্বী সতী নিজ পূজার আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও ভগবানের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'প্রভো! তুমি যে এখানে থাকিবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানি, তোমার উপরমযুক্ত সংযমী সন্ন্যাসীর সেবা বড় ভাল লাগে, তাই পিতাকে বংশনাশের ভয় দেখাইয়া তোমাকে সন্ন্যাসীর কুটীরে পাঠাইতে বলিয়াছিলে, পিতা তাহাতেও ভয় না পাইয়া তোমার সেবা করিলেন, তোমার শ্রীমুখের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? এক-একটি করিয়া এ বাটীর সকলেই ইহলোক পরিত্যাগ করিল, আছি কেবল একাকিনী আমি। প্রভো! বলিবার কিছু নাই, চাহিবার কিছু নাই, প্রাণ থাকিতে তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না, তাই কাঙ্গালিনীর প্রতি দয়া করিয়া নিজ চরণে বিলীন করিয়া লও।' গদ্গদ বচনে ভক্তিভরে বলিতে বলিতে সাধ্বী ভগবানের চরণপদ্মের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যে ভক্তিমতীর নিঃশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হইয়া গেল। মহাযোগিনী মানব-লীলা সংবরণ করিলেন।"

এই ত ভারতবর্ষের বিধবার জীবন-কাহিনী। প্রাণের দেবতার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারই চরণে শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অতিথিরূপী নারায়ণকে বিমুখ করাও অধর্ম্ম। তাই ছোটবেলা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিধবা নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও

অতিথির মর্য্যাদা রাখিলেন। এই জাতীয় বিধবার জীবন-কাহিনী শুনিলেও পুণ্য অর্জ্জিত হয়। গৃহস্থ-পরিবারে এইরূপ পূতচরিত্র বিধবারা সমাজকে অশেষ প্রেরণা প্রদান করিতেন। তাঁহাদের জীবনে ত হাহাকার ছিল না, দেবসেবা করিতে করিতে তাঁহাদের অন্তরও দেবভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তাঁহারা যে স্তরে বাস করিতেন, সেই স্তর হইতে সংসারে পঙ্কিল ভোগের দৃশ্য মোটেই নয়নগোচর হয় না। ত্যাগ এবং নিষ্ঠাপূত তাঁহাদের দিব্যজীবন সমাজকে পবিত্রভাবেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত।

ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য দৈবী-শক্তি আছে যে, বৈধব্য-যন্ত্রণাকেও তাহা ভুলাইয়া দিতে পারে। ভারতের আদর্শ ত ভোগ নহে—ত্যাগ। কাজেই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলে সুপ্ত চেতনার সঞ্চার হইবে না কেন? ত্যাগের মহিমার কথা শুনিলে কি আর পাশবিক ভোগে মন যায়? সদ্‌গুরু মহাপুরুষগণ মানবের অন্তর্নিহিত দেব-ভাবকে উদ্বোধিত করিয়া তুলেন। তাঁহাদের উপদেশে মানব-জীবনকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিবারই অপূর্ব্ব সঙ্কেত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাল-বিধবাকে সান্ত্বনাপ্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"এবার মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত তোর বিবাহ দিব, আর বিধবা হইবার ভয় থাকিবে না। আনন্দে আনন্দময়ের প্রেমে মজিয়া যা! রক্ত-মাংসের জগতে মেদমাংসের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া আপনা হারাইয়া তাঁহার প্রেমে ডুবিয়া যা।"

ভারতে বিবাহ বাস্তবিকই মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত সম্পন্ন হইত। শিবের মত বর লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষের মেয়েরা ছোটবেলা হইতেই শিবপূজা শিখে। শিবের আরাধনাই সতীনারীর লক্ষ্য। স্বামীর মধ্যে জগৎস্বামী শিব বা শঙ্করকেই ভারতের নারীরা পূজা করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর বিধবাদের ভিতর এই ভাবটিই সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা

করিতেন। পতিহারা এক বিধবাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"যদি বিশ্বাস কর, ভগবান্‌ই স্বামী, পিতা, পুত্ররূপে প্রকাশিত, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভগবানে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে ভগবান্‌কে স্বামীর মূর্তিতে ধ্যান ও আন্তরিক ভালবাসার সহিত ভজন করিলে তোমার প্রভূত উপকার হইবে, এমন কি ভগবান্‌কে স্বামীরূপেও পাইতে পারিবে। এমন ঘটনা আমি দু'একটা জানি, সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের এইখানেই রহিয়াছে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। পতি-হারা নারীকে স্বামী-বিস্মরণের উপদেশ দিলে, তাহা কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটার মতই প্রদাহকর হইয়া থাকে। দরদী হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিধবাদের যে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিধবার ব্যর্থ-জীবনে আসে সার্থকতার এক অপূর্ব শান্তি। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়াও, বিধবারা এই পথে এক শান্তিপ্রদ সরস প্রণালীতে জীবনকে উপভোগ করিবার অভিনব উপায় লাভ করিয়া থাকে। বিধবার পক্ষে, স্বামী জগৎস্বামীতে মিশিয়া গিয়াছেন, এই ধারণা লইয়া জগৎস্বামীকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে স্বীয় স্বামীরূপে ধ্যান করা মোটেই কঠিন নহে। এই অভিনব পন্থায় বিধবার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীচিন্তা ছাড়িয়া নারী থাকিতে পারে না। আশ্রয়শূন্য অবস্থায় কে-ই বা থাকিতে পারে? বিধবাদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামী-ধ্যানের ব্যবস্থাই দিয়াছেন, তবে এই ধ্যানের পেছনে এই ভাবটুকুর মাত্র সংযোগ করিতে হইবে যে, জগৎস্বামী বা ভগবান্‌ই স্বামীর মূর্তিতে আমার সম্মুখে বিরাজমান। এই পদ্ধতিতে ধ্যান করিয়া বিধবা-নারীও সাক্ষাৎভাবে স্বামীর দর্শন লাভ করিতে পারে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের সার মর্ম। ধ্যানসহযোগে

যদি কৃষ্ণ-কালী প্রত্যক্ষ হইতে পারেন, তবে জগৎস্বামীই বা বিধবার সম্মুখে স্বামীরূপে কেন প্রকটমূর্তিতে ফুটিয়া উঠিবেন না? বিধবাকে পুনঃ পুনঃ পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা না দিয়া (কেন না কোন জাগতিক পতিই তো অমর নহে) তাঁহাকে একনিষ্ঠ পতিভক্তিতেই তো অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা প্রকৃত দরদী এবং হিতাকাঙ্ক্ষীর কাজ। এই জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর সদ্য এক বিধবাকে মৃত্যুঞ্জযের সহিত বিবাহ দিয়া চির অমরত্ব লাভের ব্যবস্থা কবিয়া দিয়াছেন। জগৎস্বামীকে পতিরূপে বরণ করিয়া বিধবার জীবনে যেমন শান্তি আসিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি গৃহস্থ-পরিবারে অনেক কুমারীও পার্থিব স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া জগৎপতিকেই মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করিয়া প্রাকৃত জগতে চিরকুমারীবেশে জীবন অতিবাহিত কবিয়া গিয়াছেন—এইরূপ দৃষ্টান্তও ভারতে বিরল নহে। গৃহস্থ-জীবনগঠনে কুমারীর দান সম্পর্কে পৃথক্ অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে সধবা-বিধবা নারী স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া কি ভাবে সহায়তা করিতে পারে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যেকটি উপদেশের মধ্যে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। হিন্দুসমাজের নারীমাত্রকেই একটু আত্মস্থ হইয়া আমার চিন্তা কবিতে অনুরোধ করি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা না হইয়াও যে মানসিক শক্তির পরিচয় আমাদের অতীত যুগের হিন্দুনারীরা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি তাঁহাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে না? আদর্শ জাতিগঠনে মায়েদের যে গভীর দায়িত্ব রহিয়াছে! সে দায়িত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আস্ফালন করা কি সঙ্গত? রামকৃষ্ণ-পত্নী সারদা দেবী, বিজয়কৃষ্ণ-পত্নী যোগমায়া দেবী, বিধবা অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা), সন্ন্যাসিনী গৌরী পুরী প্রভৃতি

নারীগণ আমাদের হিন্দুপরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ। আসুরিক শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া "সভ্য" বলিয়া পরিচয় দেওয়াটাকে আমাদের প্রাচীন যুগের ঋষিরা ঘৃণা করিতেন। বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগৎ আসুরিক ভাবেরই প্রতিমূর্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সভ্যতা আজ ধ্বংসের পথে। পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে দিব্য-ভাবের বিকাশ করিতে হইবে, পারিবারিক জীবনে আদর্শ-শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। সমাজের নরনারীকে দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া উঠিতে হইবে। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে সদ্গুরু মহাপুরুষদের উপদেশকে বেদবাণীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়া প্রত্যেক নর-নারীকে চলিতে আমরা অনুরোধ করি। আদর্শ নর-নারী ব্যতীত—আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা করিবে কে?

পরিশেষে স্বামী জগদীশ্বরানন্দপ্রণীত "সাধিকামালা" গ্রন্থ হইতে বালবিধবা অঘোরমণির (গোপালের মা) জীবন-কাহিনীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিতেছি।

"দক্ষিণেশ্বরের দুই তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে কামারহাটী গ্রাম। তথায় কলিকাতার পটলডাঙ্গা পল্লীর গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবোদ্যান ও রাধামাধব-মন্দির। উক্ত মন্দিরের পূজারী ছিলেন কামারহাটীর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র নীলমাধব। নীলমাধবের গৃহ মন্দিরের অদূরে অবস্থিত। গোবিন্দ দত্তের দেহত্যাগের পর তাঁহার বিধবা পত্নী এই দেবোদ্যানে অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। নীলমাধবের বিধবা ভগ্নী অঘোরমণির সহিত দত্তপত্নীর গভীর প্রীতি ছিল। অঘোরমণির জন্ম হয় আন্দাজ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এবং বিবাহ সম্ভবতঃ ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে, নয়-দশ বৎসর বয়সে। তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী ছিল ২৪ পরগণা

জেলার বোদড়ার অন্তর্গত পাইকহাটী গ্রামে। তিনি তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিধবা হন। বিবাহের সময়ই পতিদর্শন ও শ্বশুরগৃহে গমন প্রথম ও শেষ বার।

"বালবিধবা অঘোরমণি ততদিন কেশদাম ফেলিতে পারেন নাই, যতদিন মাতাপিতা জীবিত ছিলেন। তাহার পরেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বালিকা ব্রহ্মচারিণীর মত মুণ্ডিতমস্তক হন। শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রাপ্ত কিছু ধান-জমি বিক্রয় করিয়া তিনি কয়েকশত টাকা পান। এই টাকার কোম্পানী-কাগজ করিয়া দত্তগিন্নীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। পিত্রালয়েই বৈধব্যের বার তের বৎসর কাটিল। এই সময় গঙ্গাস্নান, হবিষ্যান্নভোজন ও পূজাপাঠাদিতে অভ্যস্ত হইলেন। ঈশ্বর-চিন্তায় মন মাতিল। শ্বশুরবাড়ীর কুলগুরুকে আনাইয়া পিত্রালয়েই গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেন। স্বগৃহের পরিবেশ আর ভাল লাগিল না। গোবিন্দ দত্তের ঠাকুরবাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন পূজা ও আরত্রিকাদি দেখিতে এবং দত্তগৃহিণীর সহিত গল্প করিতে। ঠাকুরবাড়ীতে স্থায়িভাবে থাকিতে চাহিলে দত্তগৃহিণী পরমানন্দে সম্মতি দিলেন। বোধ হয় চাকরদের জন্য প্রথমে নির্মিত একতলায় একটি ক্ষুদ্র কক্ষ অঘোরমণির বাসার্থ নির্দিষ্ট হইল। এই কক্ষে অঘোরমণি বাহান্ন বৎসরেরও অধিক কাল, আন্দাজ ১৮৫২ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাটান। নিজের যে কয়েক শত টাকা ছিল, তাহা হইতে মাসিক কয়েক টাকা সুদ পেতেন। তাতেই দিন কাটাতে হত। হাটে এক হপ্তার তরি-তরকারী কিনে রাখতেন। আলু-উচ্ছে ও মুগের ডাল সিদ্ধ, আর ভাত ছিল দুপুরের আহার। বাগানের নারিকেলে প্রস্তুত লাড়ু দু'একটি ও দুধ একটু রাত্রে খেতেন। বাগানের গাছের শুকনা পাতা ডালপালা কুড়িয়ে তারই জ্বালে ভাত রাঁধতেন।

গোপালকে ভাত-তরকারী নিবেদন ক'রে তাহাই প্রসাদজ্ঞানে খেতেন। কাঠপাতা কুড়োবার সময় একটি ছোট সুশ্রী ছেলে কোথা থেকে এসে তাহাকে সাহায্য করত। সেই ছেলেকে পরে ধ্যানের সময় স্বীয় ইষ্টমূর্ত্তিতে মিলাইয়া যাইতে দেখেন। ছেলেটি তাঁহাকে এই সময় মৃদুমধুর কণ্ঠে ইহাও বলিয়াছিল,—'তুমি বাৎসল্যভাবে সাধন করো। কাঠপাতা কুড়োতে তোমার একা কষ্ট হয়, তাই আমিও তোমাকে সাহায্য করি। তুমি রান্না ক'রে আমাকে খেতে দাও, তাতে আমি বড় তৃপ্তি পাই।'

"অঘোরমণির কক্ষ গোবিন্দ দত্তের বৃহৎ অট্টালিকার অন্দর মহলের শেষাংশে অবস্থিত—নির্জন, নীরব। কক্ষের তিনটি জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গাদর্শন হইত। ব্রাহ্মণী এই ঘরে বসিয়া গঙ্গাদর্শন ও দিবারাত্রি জপ করিতেন। এই ঘরে ত্রিশ বৎসর জপ করিয়া সাধিকা সিদ্ধ হন। তিনি ভগবান্‌কে পুত্ররূপে, গোপালভাবে উপাসনা করিতেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে বাৎসল্য ভাবসাধন বলে। অঘোরমণির ষোল আনা মন গোপালের চিন্তায় ডুবিল। কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে বা কথা বলিতে তাঁহার আর ইচ্ছা রহিল না।

"তিনি স্বল্পাহারী ও স্বল্পভাষী ছিলেন। রাত্রি দুইটায় উঠিয়া তিনি জপে বসিতেন এবং সকাল ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত জপে মগ্ন থাকিতেন। তাহার পর তিনি রাধামাধব-মন্দিরে ঝাঁট দেওয়া, ধোওয়া-মোছা, পূজার বাসন মাজা, ফুল তোলা, মালা গাঁথা, চন্দনবাটা প্রভৃতি কাজ কিছু কিছু করিতেন। তদন্তে রান্না করিয়া গোপালকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পেতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জপে বসিতেন। সন্ধ্যা-সমাগমে মন্দিরে আরত্রিক দর্শন ও ভজন শ্রবণ করিতেন। অনন্তর আবার জপে বসিতেন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত। এইরূপে

১৮৫২—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর সাধিকার একটানা চলিল।”

তারপর কি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভ হয় এবং তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি কি করিয়া রামকৃষ্ণদেহে লীন হইয়া যায়—প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা “সাধিকামালা” হইতে সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীরামকৃষ্ণকে লাভ করার পর, তাঁহাকেই তিনি সাক্ষাৎ গোপাল-জ্ঞানে সেবা করিতেন। পরমহংসদেবও স্বয়ং অঘোরমণিকে ‘গোপালের মা’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। গোপালের মা তাঁহার ইষ্টদেবতা গোপালকে ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই প্রকাশিত দেখিতেন।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ গৃহস্থ পরিবার গঠনে সধবা-নারী এবং বিধবা-নারীর অবদানের কথা আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে কুমারী-জীবনের কথা আলোচনা করিব। ঘরে ঘরে কুমারী মেয়ের আর আজকাল অভাব নাই। কুমারী অনেকেই দেখিতে পাওযা যায়, কিন্তু কুমাবীব্রতধারিণী মেয়ে আর চোখে পড়ে কি? চিবকৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে পরিবারের সেবা করিবাব মনোবৃত্তি আজকাল দেখা যায় কি? বিবাহ না করিয়া, কুমারী-ব্রত ধাবণ সকলের পক্ষে সম্ভবপব নহে, আর তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক আদর্শও নহে। কিন্তু ত্যাগস্পৃহা স্বভাবতঃই যাঁহাদের মাঝে ফুটিয়া উঠে, জোর করিযা তাঁহাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করাও সমীচীন নহে। প্রাচীনযুগে গুরুগৃহে বা পিতৃগৃহে অনেক কুমারী মেয়েই পবিত্র কুমারীব্রত ধাবণ করিয়া অবস্থান করিতেন। অনেক ঋষির তপোবনেও দেখি, কুমারী মেয়েবা পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থ শ্রবণ-মনন করিয়া নিষ্কলুষভাবে জীবনযাপন করিতেছেন। গুরুগৃহে কুমারীব্রতধারিণী অনেক মেয়েই থাকিতেন।

মহর্ষি মাতঙ্গমুনির পালিতাকন্যা শবরীর উপাখ্যানের কথা মনে পড়িয়া গেল। মহর্ষি মাতঙ্গ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অন্তিম সময় শবরীকে কাছে ডাকিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে মহর্ষি বলিয়াছিলেন—"মা, আমার অন্তিম সময় সমুপস্থিত। আমি পরলোকে গমন করিতেছি। নরদেহধারী শ্রীভগবানের চাক্ষুষদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ

হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। সীতার অন্বেষণে শীঘ্রই তিনি এই আশ্রমে পদধূলি দিবেন। তুমি ব্যাকুলভাবে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা কর। তাঁহার দুর্ল্লভ দর্শনপ্রাপ্তির পর তুমি জলন্ত অগ্নিতে দেহ বিসর্জন দিয়া ব্রহ্মলোকে আমার নিকট আসিও।"

শবরী তখন বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু যৌবন তাঁহার মনে চাঞ্চল্যসৃষ্টির অবকাশ পাইল না। একাধারে গুরু এবং পিতা মাতঙ্গমুনির নিকট হইতে যে রামনামে তিনি দীক্ষা পাইয়াছেন। এখন তাঁহার মন ইষ্টচিন্তায় বিভোর। কবে ইষ্টদর্শন মিলিবে, এই চিন্তাতেই শবরীর মন ব্যাকুল। এইরূপে আদর্শের ধ্যানে—ইষ্টধ্যানে আত্মহারা বিভোর না হইতে পারিলে কি আর কামরিপু জয় করা সম্ভবপর? চিরকুমারী শবরীর মনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আছে শুধু ভগবদ্দর্শনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

পত্রের কুটীর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া।
শবরী রহেন রামচন্দ্র পথ চায়্যা॥
তৃষিত চাতকী যেন মেঘ আগমন।
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন॥
বনমধ্যে ফলমূল আনে বহু দুঃখে।
মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে॥
চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে।
যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে॥
শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল।
কথোদিন পরে প্রভু আগমন কৈল॥

দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া।
প্রথমেই ডাকে মোর শবরী বলিয়া॥

—ভক্তমাল

সমুত্তরন্তাবব্যথৌ নদান্ ভিন্নোদ্ধাসন্নিভান্।
সিদ্ধাতারামিব খ্যাতাং শবরীমাপতুর্বনে॥
বসানাং বল্কলে শুদ্ধে বিপূয়ৈঃ কৃতমেখলাম্।
ক্ষামামঞ্জনপিণ্ডাভাং দণ্ডিনীমজিনাস্তরাম্॥
প্রগৃহ্যপদবৎসাধ্বীং স্পষ্টরূপামবিক্রিয়াম্।
অগৃহ্যাং বীতকামত্বাদ্দেবগৃহ্যামনিন্দিতাম্॥
ধর্ম্মকৃত্যরতাং নিত্যমবৃষ্যফলভোজনাম্।
দৃষ্ট্বা তামমুচদ্রামো যুগ্যায়াত ইব শ্রমম্॥

—ভট্টিকাব্য, ৬।৬০-৬৩

সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধিকারী পুষ্যানাম্নী জগদ্বিখ্যাত তারার ন্যায় সর্ব্বসিদ্ধি-সম্পাদিনী, শুদ্ধা, পুণ্যবতী, বল্কলপরিধারিণী, মুঞ্জমেখলাশালিনী, যোগাভ্যাসে ক্ষীণকলেবরা, পলাশদণ্ডবতী, মৃগচর্ম্মাসীনা, নির্বিকারা, সাধ্বী, কৌটিল্যখলতাদিদোষবর্জিতা, দেবপক্ষপাতিনী, অনিন্দিতা, সদা ধর্মকর্মব্যাপৃতা, ইন্দ্রিয়ের অবিকারজনক ফলমূলাহারিণী, মহাবিদুষী শবরীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ নিবিড় বনভ্রমণজনিত শ্রান্তি দূর করিলেন।

সেদিন প্রাতে শবরী পুষ্পচয়ন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, আশ্রমবেদীতে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গজ্যোতিতে দশদিক্ আলোকিত করিয়া শবরীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভগবানের জন্য শুধু ভক্তই প্রতীক্ষায় থাকেন না, ভগবান্ও ভক্তের জন্য ব্যাকুলপ্রাণে প্রতীক্ষা করেন। আনন্দের আতিশয্যে আজ শবরী নির্বাক্। শ্রীরামচন্দ্রের

চরণকমলযুগল চোখের জলে ধুইয়া স্বীয় কেশদ্বারা তাহা মুছিয়া দিলেন। পরে সুগন্ধিপুষ্পে পাদপূজা করিয়া তাঁহাকে আহরিত ফল নিবেদন করিলেন। ভক্তনিবেদিত ভক্তিমাখা ফল ভগবান্ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। শবরীর জীবন-জনম সার্থক হইয়া গেল। এখন শবরী মহর্ষি মাতঙ্গমুনির আদেশ প্রতিপালনে যত্নপর হইলেন। মৃত্যুর আগে যাঁহার নাম একবার মাত্র স্মরণ করিলে যম যাতনা দূর হইয়া থাকে, আজ সেই ভগবান্ প্রকট-মূর্তিতে শ্রীরামচন্দ্ররূপে ভক্ত শবরীর সম্মুখে উপস্থিত। শ্রীগুরুস্মরণ এবং শ্রীভগবানের অতুলনীয় রূপ দর্শন করিতে করিতে শবরী ধীরপদে, শান্তমনে, হাসিমুখে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। শবরীর মুক্তাত্মা ব্রহ্মলোকে গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া ব্রহ্মপদে বিলীন হইল।

কুমারী-জীবনের ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আদর্শনিষ্ঠ চিত্ত কি করিয়া তিলে তিলে ইষ্টের আকাঙ্ক্ষামত গড়িয়া উঠে, শবরীর উপাখ্যান তাহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। সন্তানপালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য কেহই তখন কুমারী-ব্রত ধারণ করিতেন না। কুমারীর জীবন এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিত। অভিযোগ অসন্তুষ্টি লইয়া কুমারী ব্রহ্মচর্য-ব্রত অবলম্বন করিতেন না। তপোবনে ঋষির আশ্রমে অনবরত কর্ণে যে দিব্য ত্যাগমন্ত্রের ঝঙ্কার আঘাত দিত, তাহাতে তাঁহাদের মনে এক অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত। তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই পবিত্র কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিতেন।

পূর্বে ঋষি-মুনির আশ্রমে মেয়েদেরও রীতিমত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—এই শাস্ত্রবচনই তাহার প্রমাণ। ভবভূতিপ্রণীত মালতীমাধবে কামন্দকী লবঙ্গিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"অয়ি! কিং ন বেৎসি, যদেকত্র নো, বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিগন্ত-বাসিনাং ছাত্রাণাং সাহচর্য্যমাসীৎ।"

'অয়ি প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! তুমি কি জান না, তোমার কি মনে পড়িতেছে না যে, গুরুর নিকট একত্র বিদ্যাধ্যয়নকালে নানা দিগ্‌দেশাগত ছাত্রবৃন্দের সহিত আমাদের একত্র সাহচর্য্য হইত?'

উক্ত কবিপ্রণীত উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে মহর্ষি বাল্মীকির অন্তেবাসিনী তপস্বিনী আত্রেয়ীকে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'আর্য্যে আত্রেয়ি! কুতঃ পুনরিহাগম্যতে?' আর্য্যে আত্রেয়ি! আপনি কি জন্য এই তপোবনে আসিয়াছেন?' আত্রেয়ী বলিতেছেন—

অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥

এই দণ্ডকারণ্যপ্রদেশে সুমধুর তারস্বরে গীয়মান সামবেদপারদর্শী আর্য্যাচার্য্য অগস্ত্য প্রভৃতি মহাপণ্ডিত মহর্ষিগণ বাস করেন। তাঁহাদের নিকট বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিবার জন্য মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম হইতে পর্য্যটন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া যে কুমারীর মন নিবৃত্তিধর্মে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিত, ক্রান্তদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ গুরু তাঁহাকে সেই পথেই পরিচালিত করিতেন।

একদা সুলভানাম্নী এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী রাজকন্যা মহারাজ জনকের পণ্ডিতমণ্ডলীসমলঙ্কৃত রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? সুলভা উত্তর দিলেন—

সাহং তস্মিন্ কুলে জাতা ভর্তর্য্যসতি মদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্মেষু চরাম্যেকো মুনিব্রতম্॥

'আমি উচ্চ রাজন্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য-ব্রত সমাপ্তির পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধাদি সংগুণসম্পন্ন পাত্র না পাওয়াতে আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি নির্বাণ মুক্তি-প্রাপ্তি-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া একাকিনী মুনিধর্ম প্রতিপালন করিতেছি।'

কুমারীভাবে জীবনযাপনকে তখন অনেক মেয়েই উচ্চাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। কুমারীমূর্তিতে স্বয়ং ভগবতীই বিরাজিতা—ইহাও হিন্দুসংস্কারের একটি মজ্জাগত সংস্কার।

বৌদ্ধযুগেও ভারতীয় আর্য্যমহিলাবা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন করিতেন। 'বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী পিতার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী নানা সদ্‌গুণশালিনী রূপলাবণ্যবতী শুক্লা বৈষয়িক সুখসম্ভোগকামনা পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া আজীবন কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন বলিয়া নানাবিধ সংকার্য্যে প্রচুর ব্যয় করিতেন। দশসহস্র ছাত্রীর বাসোপযোগী একাধিক সুবৃহৎ মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ সকল ছাত্রীর খাদ্যবস্ত্রব্যয়নির্বাহের জন্য এবং অন্যান্য সংকার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

বারাণসীরাজ কৃকীর মালিনীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। রাজনন্দিনী মালিনী সনাতন বৈদিক ধর্মাবলম্বী পিতার দুহিতা হইলেও বৌদ্ধধর্মের

প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ও ভক্তি ছিল। তিনি গোপনে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ বিদুষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অদ্ভুত শক্তিশালিনী মালিনী দশসহস্র বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী ছাত্রীর বাসোপযোগী একটি সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি পিতৃপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই মঠে ছাত্রীদিগের অভিভাবিকা হইয়া বাস করিতেন এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও ধর্মপ্রচারাদি সংকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া নারীসমাজের অসীম কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন।

সংযম-ব্রত পালনান্তে যে সব কুমারী মেয়ে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদিগকে পবিত্র গার্হস্থ্যধর্মপালনেরও সুযোগ প্রদান করা হইত। কিন্তু কুমারী মেয়েদের মনোমত বরলাভের জন্য পূর্বে ব্রতপালনেরও ব্যবস্থা ছিল। কুমারী মেয়েরা বিশ্বাস করিতেন, ভগবানের মত স্বামী পাইতে হইলে, ত্যাগ-ব্রত অবলম্বন করিতেই হইবে। ভগবান্‌কে স্বামীরূপে পাওয়া সহজ কথা নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী-ব্রতের কথা উল্লিখিত আছে। যথা—

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্‌॥ ১০।২২।১
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥ ১০।২২।৪

—"হেমন্তের প্রথমে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্নভোজিনী হইয়া কাত্যায়নীর অর্চনারূপ ব্রত আরম্ভ করিলেন। সেই সকল কুমারীগণ, 'হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নন্দগোপের পুত্রকে

পতিরূপে প্রদান করুন, আপনাকে নমস্কার করি'—এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে পূজা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণার্পিতচিত্তা ব্রজকুমারীগণ এইরূপে একমাসকাল যাবৎ ব্রতাচরণ ও 'নন্দপুত্র আমাদের পতি হউন' এই কামনায় ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। শাস্ত্র এবং গুরুজনদের মুখে উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া সুকুমারমতি বালিকা এবং কুমারীদের মনে ছোটবেলা হইতেই সৎপতিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইত। তখন পতির মর্ম না বুঝিলেও কুমারী কন্যাগণ ব্রতপালনের ভিতর দিয়া একটি শুভ সংস্কার লাভ করিত। গৃহস্থ পরিবারের কুমারী মেয়েরা এইভাবে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই এমন সংস্কারে অভ্যস্ত হইতেন যে, তাঁহারা হরি এবং হরের মত পতিলাভের জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিতেন। আজও অনেক কুমারী মেয়ে শিবপূজা করিয়া থাকেন।

এইভাবে ছোটবেলা হইতেই যাহাতে মেয়েদের মন ভগবদভিমুখী হয়, সমাজে তাহার সুব্যবস্থা ছিল। অতি শৈশবের শুভ সংস্কার ভাবী-জীবনে সুফল প্রসব করিত। ছোট ছোট বালিকাদের মুখে আজও পল্লীগ্রামে শুনিতে পাই, 'শিবের মত, শ্রীরামচন্দ্রের মত, বিষ্ণুর মত আমাদের পতিলাভ হইবে।' সমাজে, কুশিক্ষার প্রভাবে ছোট ছোট মেয়েদের মুখেও আজকাল অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূজা-পার্ব্বণের প্রতি তাহারাও ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছে। এই জন্যই কুমারীমেয়েদের সু-শিক্ষার জন্য চরিত্রবলে বলশালিনী, ধার্ম্মিকা, তপস্বিনী শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে বালিকা এবং কুমারীদের রক্ষা করিতে না পারিলে, ভারতে প্রকৃত বিদুষী পতিব্রতা নারীর সৃষ্টি কখনো হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-পত্নী সারদা দেবী রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ না করিয়াও সমগ্র

জগতের যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমকক্ষতা লাভের অধিকার কয়জন আধুনিক শিক্ষিতা নারী লাভ করিতে পারিয়াছেন? ভারতীয় সংস্কৃতি দেবভাষা এবং দেবভাবের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত, এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে।

বর্ত্তমান সমাজে বিবাহ এক সমস্যাব বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে মেয়েদেব মনোমত বর মিলাই দুষ্কর, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। কিন্তু এই কুমারী জীবনযাপনের মধ্যে কোন পবিত্র উচ্চ আদর্শের প্রেরণা না থাকায়, কুমারী জীবনের পবিত্রতা অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ থাকে না। জৈব-প্রেরণায় কুমারীর পবিত্রতা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া পড়ে। বিবাহ না করিয়াও যদি নিরাপদে ভোগ-সুখ করা সম্ভবপর হয়, তবে আর কে-ই বা বিবাহের দায়িত্ব পালন কবিতে যায়? কুমারী আজ ঘরে ঘরেই বিরাজিতা, কিন্তু কুমারী-ব্রতধারণের কষ্ট স্বীকাব করিতে কাহাকেও বড় দেখা যায় না। ভোগবিলাস অর্থাৎ গান-বাজনা, রেডিও ইত্যাদির এবং খাদ্যাখাদ্যের সরঞ্জামে কুমারীর চিত্ত প্রশান্ত না হইয়া অশান্তই হইয়া উঠে বেশী। কুমারীর পবিত্রতা রক্ষা সম্পর্কে স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ তাঁহার লিখিত "কুমারীর পবিত্রতা" নামক গ্রন্থে যে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিযাছেন, নিম্নে তাহা হুবহু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কুমারী-জীবনের পক্ষে ইহা বিশেষ সতর্কবাণী বলিয়াই সকলকে তাহা মানিয়া চলিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

(১) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, কোন লোকের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। একটি ক্ষুদ্র বালিকা বা একটি স্ত্রীলোককেও তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে দিবে না। ইহাতে যদি অসুবিধা হয় মাটিতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইবে, তথাপি নিয়মের কঠোরতা কখনও হ্রাস

করিবে না। একটি শিশুকেও যদি আলিঙ্গন করিয়া ঘুমাইতে অভ্যাস কর, তবে সেই অভ্যাস তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে বিপদের জন্যই মাত্র প্রস্তুত করিবে। তোমার বুকে যেন একটি বালিশের স্পর্শ কখনও না পড়ে।

(২) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, একটি শিশুকেও চুম্বন করিবে না এবং তোমাকে চুম্বন করিবার অধিকার স্ত্রীলোককেও দিবে না। চুম্বন কেবল নৈতিক কারণেই আপত্তিজনক তাহা নহে, চুম্বন হইতে যক্ষ্মা, উপদংশ ব্যাধি বিস্তার পায়।

(৩) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, কাহারও সহিত এক থালায় খাইবে না। এক পাত্রে আহার হইতে কেবল যে যক্ষ্মা উপদংশ প্রভৃতি কদর্য্য ও ভয়ঙ্কর শারীরিক ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, তাহা নহে। ইহা হইতে নৈতিক অধঃপতনও আসিয়া থাকে।

(৪) যত আত্মীয়তাই হউক, বায়স্কোপ দেখিতে বা থিয়েটার প্রভৃতি শুনিতে কখনই কাহারও সহিত যাইবে না। শত অনুরোধ, শত উপরোধ অগ্রাহ্য করিবে। সেকেলে মেয়ে বলিয়া যদি কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তবে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। ছায়াচিত্র বা নাট্যাভিনয় হইতে যদি শিখিবার কিছু থাকে, তবে সেই শিক্ষার সুযোগ তুমি পরে নিলেও চলিবে। ছায়াচিত্রের মহিমায় বাংলার কুমারী-জীবনের উপরে কত যে পাপ, কত যে অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে বলিবার নহে।

(৫) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, তোমার শিক্ষাদাতাদের মধ্যে যদি কেহ তোমার প্রতি একটু অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক স্নেহপ্রদর্শনের চেষ্টা করেন, অথবা তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে একান্ত অনাবশ্যকীয় খুঁটি নাটি জানিবার অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, অথবা তোমার প্রতি কোনও বিষয়ে সহানুভূতি বা সহৃদয়তা প্রদর্শনের জন্য এমন কোন

বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন, যাহা আংশিক হইলেও লজ্জাজনক, তবে তোমাকে সেই শিক্ষাদাতা সম্বন্ধে একটু তেজস্বিতা ও একটু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল লতার মত বাড়িলেই নারী-চরিত্রের মহিমা প্রকাশিত হয় না, প্রয়োজনমত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধাও হইতে হইবে।

(৬) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, তোমাকে কেহ উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিবে না। পড়াশুনার কৃতিত্বের জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণের সমক্ষে উপহার প্রদান করেন, তবে একমাত্র সেই উপহারই তুমি গ্রহণ করিতে পার। ছোট-খাট জিনিসের গ্রহণ ও দানের মধ্য দিয়া অনেক বড় বড় জিনিসের নির্বিঘ্নতা নষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র একটি বস্তু উপহার গ্রহণের দ্বারা অনেক বড় বড় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরও মাথা অজ্ঞাতসারে অন্যায়ের নিকট নত হইয়া থাকে।

(৭) যত বিশ্বাসভাজনই হউক, অন্ধকার গৃহে কাহারও সহিত আলাপ করিবে না এবং কোন পুরুষের সহিত একাকিনী অবস্থান সম্বন্ধে সতর্ক হইবে। ঝড়ের বাতাসে ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ কুমারীকন্যা অন্ধকার ঘর পরিত্যাগ করে নাই, এরূপ ক্ষেত্রে অনেক কুমারীর অমর্য্যাদা ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মের দোহাই দিয়া ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়া সুচতুর লম্পট গল্প করিতে করিতে অলক্ষিতে কুমারীর চরিত্রে আঘাত করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। লম্পট নরপশুরা অন্ধকারের সুযোগ নিবার জন্য সর্বদা ওৎ পাতিয়া থাকে, অত্যন্ত দুঃসাহসী পাপিষ্ঠেরা ব্যতীত আলোককে সকল শয়তানই ভয় করে।

(৮) যত বিশ্বাসভাজনই হউক, কেহ কোন প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে প্রতিজ্ঞার বিষয়টি না জানিয়া পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিবে না। শতবার যদি

সে বলে যে, প্রতিজ্ঞাটি তোমার ভালর জন্যই করাইতেছে, তবু করিবে না। কেহ যদি বলে,—"আমার একটি কথা রাখিবে ?" তখনি বলিও না।—"রাখিব"। কি কথাটি রাখিতে হইবে, তাহা আগে জানিতে হইবে, স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে, নির্ভুলরূপে জানিতে হইবে। প্রতিজ্ঞার বিষয় না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করার ফলে কত যে অবোধা বালিকাকে নিদারুণ নৈতিক অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে এবং প্রতিদিন কতস্থানে কত বালিকাকে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় দুর্গতিতে পতিত হইতে হইতেছে, তোমার তাহা জানিবার কথা নহে। যদি শত সতর্কতা সত্ত্বেও কাহারও নিকটে কোনও বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রদান করিয়া ফেল এবং পরে বুঝিতে পার যে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে ধর্মনাশ হইতে পারে, তবে এরূপ ক্ষেত্রে সাহসের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে। যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া ধর্ম ও নীতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, সেরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পাপ হয় না, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করিলেই পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে।

(৯) যত বিশ্বাসভাজনই হউক, কেহ যদি তোমাকে বলে,—"আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলিতে চাহি, তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না ত ?" তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে,—"গোপন কোন কথা আমি শুনিতে সম্মত নহি।" গোপন কথা শুনাইতে আসিয়া অনেক যুবক অনেক কুমারীকে ফাঁদে ফেলিয়া থাকে। প্রথম প্রথম হয়ত প্রকৃতই গোপনীয় কোন গূঢ় কথার অবতারণা করে না, গোপনে কথাবার্তা কহিবার অভ্যাসটুকু অনাঘ্রাতা কুমারীর সহজ বিশ্বাসপ্রবণ নিষ্পাপ চরিত্রে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রথম প্রথম ভাল কথাই গোপনে কহে, পরে সময় বুঝিয়া আস্তে আস্তে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া অসৎ-প্রস্তাবের উত্থাপন করে। একটি লম্পট তোমার জানিত

একটি কুমারীকে (* * *) গোপনে গীতা, রাজযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি পড়াইত, গোপনে বসিয়া চরকার মহিমা শুনাইত, স্বরাজলাভের উপায় বলিত। তারপরে আসিল সাহিত্যের আলোচনা, বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের অঙ্কিত দুশ্চরিত্র নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। এইভাবে যখন কুমারীটির নির্ভর ও বিশ্বাস বাড়িয়া গেল এবং সতর্কতা শিথিল হইল, তখন যুবকটি তাহার নিকটে অতিকদর্য্য প্রস্তাব করিল এবং চেষ্টা পাইল। * * * ভগবান্ এই কুমারীটির মর্য্যাদা নিজহাতে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বাংলাদেশে শত শত কুমারীর মর্য্যাদা এইভাবে নষ্ট হইতেছে। কেহ তাহার খোঁজ রাখে না। যাহারা বা খোঁজ রাখে, তাহারা দেখিয়াও দেখে না।

(১০) কেহ যদি তোমার ঘুমের সময় নিষ্প্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে তোমার শয়নগৃহে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্কলঙ্ক মহাজ্ঞানী পুরুষ হইলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না বা তাঁহার এই আচরণকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবে না।

(১১) কেহ তোমাকে কোন পত্র লিখিয়া গোপনে উত্তরপ্রার্থী হইলে কখনই তাহার পত্রের জবাব দিবে না বা প্রাপ্তিস্বীকার করিবে না এবং সে যদি তাহার পত্র গোপনে রাখিতে বা ছিঁড়িয়া ফেলিতে অনুরোধও করে, তবু সেই পত্র আমাকে বা তোমার পিতৃদেবকে অবিলম্বে প্রেরণ করিবে।

(১২) যাহাদের গৃহে বাস করিতেছ, তাহাদের বাড়ীর মেয়েদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ বা ইয়ারকির পাত্র কোন অভ্যাগত আসিলে, বান্ধবীদের দেখাদেখি তুমিও কোন প্রকার চপল রসিকতা করিতে প্রলুব্ধা হইও না এবং কেহ তোমার সহিত বৃথা রসিকতার অবতারণা করিতে চাহিলে হাসাহাসি

ঢলাঢলি করিয়া বা তাহার ইতরজনোচিত কথাগুলি শ্রবণে অন্যায় আগ্রহ দেখাইয়া তাহাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিও না। "না" বলিবার শক্তি এবং স্থানত্যাগের শক্তি কুমারী-মর্য্যাদারক্ষার বক্ষ ও পৃষ্ঠের দুই দুর্ভেদ্য লৌহবর্ম।

(১৩) বিদ্যার্জনের জন্যই যে পরগৃহে বাস করিতেছ, এই কথা কখনও বিস্মৃত হইও না। বিদ্যার্জ্জন না হইয়া অন্যদিকে তোমার খেয়াল যাইতেছে কি না, প্রত্যহ সেই বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আত্মপরীক্ষা করিবে। বিদ্যার্জ্জনের নাম করিয়া অনেক কুমারী অবিদ্যা অর্জন করিয়া থাকে।

(১৪) নিজে নিয়মিত উপাসনা কখনই সঙ্কোচের সহিত করিও না, নির্ভয়ে এবং সাহসের সহিত নিজ আধ্যাত্মিক সাধনা অবিচলিত উদ্যমের সহিত পরিচালিত করিতে হইবে। নিন্দা, বিদ্রূপ গ্রাহ্য করিবে না এবং ঈশ্বরনিষ্ঠা লুকাইতেও চেষ্টা করিবে না। প্রকাশ্যেই উপাসনা করিবে। বাধা যত বেশী হইবে ঈশ্বরসাধনায় অধ্যবসায় তত বেশী দিবে। ঈশ্বরপরায়ণা ও সৎসাহসিকা মেয়েগুলিকে লম্পটেরা সর্বদা ডরায়।

ভারতবর্ষে কুমারীজীবনকে অতীব পবিত্রদৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। অনেক পীঠস্থানে, যেমন কামাখ্যায়, কুমারীপূজার * প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত, শারদীয়া মহাষ্টমী-তিথিতে অনেক গৃহস্থ বাড়ীতে তেমনি কুমারীপূজা এবং কুমারীভোজনের প্রথা আজও প্রচলিত আছে। জগদম্বা কুমারী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা মনে করিয়া এখনও অনেক জ্ঞানী-গুণী কুমারীপূজা করিয়া থাকেন। কুমারীমূর্ত্তি বাস্তবিকই পূজা পাইবার যোগ্যা। এই পবিত্র কুমারী-ব্রতধারণ করিয়া সমাজে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা দেবীতুল্যা। আদর্শ সমাজ-গঠনে এই কুমারী-শক্তির পূজার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পবিত্র কুমারী-ব্রত পালন

* হালিসহর আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'কামাখ্যায় কুমারীপূজা' দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা করেন, তাঁহারা জগজ্জননীর সাক্ষাৎ অংশসম্ভূতা। গায়ত্রীমন্ত্রে আমরা যাঁহার উপাসনা করি, প্রাতঃকালে তিনি সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিতা কুমারীরূপেই বিরাজমানা। ব্রহ্মশক্তিকে কুমারীরূপে ধ্যানের ব্যবস্থা ঋষিরাই করিয়া গিয়াছেন। বেদমাতা গায়ত্রী প্রাতঃকালে কুমারীরূপে অবস্থান করেন। এই কুমারী-রূপ ঋষি-মুনিজনেরও বন্দনীয়া। কাজেই কুমারী-ব্রতধারিণী যাঁহারা, তাঁহারা সমাজের কাছে পূজ্যা—প্রণম্যা।

সমাজগঠনে কুমারীদের তপস্যার দান কম নহে। বিধবার জীবন যেমন শুদ্ধ পবিত্র, কুমারীজীবনও তদ্রূপ। কুমারীজীবন পবিত্রতারই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাদের শুচি-শুদ্ধ পবিত্র ভাবে ভগবান্ নিত্য বিরাজিত। পূর্বে সর্বাবস্থার নারীগণকেই ব্রত পালন করিতে হইত। পতিব্রতা নারী-জীবনেও ব্রত আছে, তেমনি আছে কুমারীজীবনের, বিধবা-জীবনের ব্রত। ব্রত আর কিছুই নহে—সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ ব্রতধারিণীগণ অনায়াসে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিতেন। প্রতিজ্ঞা বা ব্রতবিহীন জীবন আর পশুজীবনে কোন পার্থক্য নাই। সমাজকে নিবৃত্তি-মার্গের বাস্তব শিক্ষা প্রদান করে কে? এই বিধবা এবং কুমারীগণ। পরিবারে বিধবা এবং কুমারীগণ ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করিয়া ভোগাসক্ত নরনারীর প্রাণে ত্যাগের ভাবকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। বিধবা কন্যার জন্য অনেক ভোগাসক্ত পিতাকেও অনেক কিছু ত্যাগ করিতে দেখা যায়। উহাদের করুণ অবস্থা সন্দর্শনেই অনেক পিতামাতা সংযতভাবে জীবনযাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এমন অনেক পিতামাতা আছেন, যাঁহারা বিধবা এবং কুমারীকন্যার ব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিলাসিতার বস্তু এবং ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করেন। সুতরাং পারিবারিক জীবনে কুমারী এবং বিধবা সত্যই মঙ্গলকারিণী নিয়ন্ত্রণ-শক্তি।

কেবল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, পরিবারে জীবনযাপনকেই পবিত্র কুমারীব্রত বলে না। আজকাল অনেকে বিবাহ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে কোন ব্রতানুষ্ঠান বা প্রতিজ্ঞা-সঙ্কল্প রক্ষার দায়িত্ব বা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। ভোগোপকরণের মধ্যে থাকিয়া, কোন ত্যাগমূলক শিক্ষা না পাইয়া অবশেষে কি পরিণাম উপস্থিত হয় কুমারী-জীবনে, তাহা আর ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বে হিন্দুসমাজে কুমারী এবং বিধবাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কামকে **Sublimate** অর্থাৎ দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে হইলে ব্রত-পূজা, নিয়ম-নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। কুমারীদের ছোটবেলা হইতেই এমন কতকগুলি ব্রতপালন করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত, যাহাতে তাহাদের মন ভগবচ্চিন্তায় আপনি অনুপ্রাণিত হইত। কুমারীদের এবং বিধবাদের পক্ষে শিবপূজা অবশ্যকরণীয় বিধান ছিল। পরিবারের মধ্যে একটা অধ্যাত্ম আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন কুমারী এবং বিধবাগণই। এইজন্যই আদর্শ পরিবার গঠনে কুমারী এবং বিধবাদের ত্যাগমূলক ব্রতানুষ্ঠান পরিবারের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিতই। তাঁহাদের জীবনের এই যে অনাড়ম্বর সাত্ত্বিক প্রভাব, ইহাতে যে সমাজের কি উপকার সাধিত হইত, তাহা আর বলিবার নয়।

পাতিব্রত্য-ধর্মের যেরূপ তেজ বা প্রভাব রহিয়াছে, তেমনি কুমারী-ব্রতেরও আশ্চর্য্য প্রভাব আছে। সতীত্বের তেজ প্রাচীন যুগে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকটিত হইয়া উঠিত। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, নারীজীবনের যাহা একমাত্র অমূল্য সম্পদ্‌ বা জীবাতু, তাহাই উপেক্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সতীত্ব থাকিলে, তবে ত সতীত্বের তেজ নির্গত হইবে? নিরোধশক্তি আজ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না, প্লাবনে বা স্রোতে গা ভাসাইয়া চলাই বর্তমান সমাজের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্যায়ের প্রতিকার করা ত দূরের কথা, প্রতিবাদ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে উঠে না। তাহার কারণ কি?—নৈতিক অধঃপতন। সতীত্বরক্ষায় শৈথিল্য দেখা দিয়াছে বলিয়াই নারীর ভিতর আর অন্যায়কে প্রতিহত করার শক্তি বা তেজবীর্য্য দেখা যায় না।

বিকার বা সম্ভোগের ক্ষেত্র হইল—সংসার। এই সংসারকে আদর্শ সংসারে পরিণত করিতে হইলে পরিবারের প্রত্যেককে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। সঙ্কল্পশক্তির জাগরণ আনিতে হইলে—ত্যাগ-সংযম-ব্রত অবলম্বন করিতেই হইবে। আমাদের সমাজে ত্যাগ-শক্তির বোধন করিতেন কুমারী এবং বিধবাগণই। স্বেচ্ছায় ভোগত্যাগ এবং ভোগ্যবস্তুকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি না থাকিলে, ক্রমশঃ সেই সমাজ অধঃপতনের দিকেই ধাবিত হয়।

বৌদ্ধযুগে নারীদের অভ্যুত্থান হইয়াছিল এই সংযম-শক্তিতে: 'থেরীগাথা' বলিয়া একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে মেয়েদের ত্যাগের কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। সমাজের এবং দেশের উন্নয়নের জন্য অনেক মেয়েই তখন কুমারীব্রত অবলম্বন করিতেন। বিবাহের সুবিধা বা ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হইয়া তাঁহারা কুমারীজীবন যাপন করিতেন না। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-শিক্ষার প্রভাবেই তাঁহাদের জীবনে ত্যাগের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। কুমারীজীবনে পবিত্র নিয়মসংযম-ব্রতানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাঁহারা যে দুর্লভ অবস্থা লাভ করিতেন, তাহার কথা চিন্তা করিলেও মনে আনন্দের সঞ্চার হয়।

সম্রাট্ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রার কথা অনেকেই অবগত আছেন। অশোক-পুত্র মহেন্দ্রের বয়স যখন বিশ বৎসর এবং সংঘমিত্রার বয়স আঠার বৎসর, তখন সম্রাট্ অশোক মহেন্দ্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সময় একটি বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্রাটকে

বলেন,—"মহারাজ! যিনি ধর্মসেবায় পুত্র-কন্যাকে সমর্পণ করেন, তিনিই বৌদ্ধধর্মের বাস্তবিক মিত্র।" বৌদ্ধাচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণে সম্রাট্ অশোকের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিতে কি তোমরা প্রস্তুত?" উভয়ে তখন উত্তর দিলেন, "পিতঃ, আমরা যদি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হইয়া ভগবান্ বুদ্ধের ধর্মসাধন ও প্রচারার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবে তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর আমাদের জীবনে কি হইতে পারে?"

মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্মপ্রচার-উদ্দেশ্যে সিংহলে গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি একজন নারী-প্রচারিকার অভাব অনুভব করিলেন। তিনি স্বীয় ভগ্নী সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাইবার জন্য পিতা অশোককে পত্র দিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া সিংহলে গিয়া সংঘমিত্রাও প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সিংহলে নারীগণের নিকট ভগবান্ বুদ্ধের অমৃত-বাণী প্রচারের জন্য আজও সংঘমিত্রার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে। আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের দশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কুমারীব্রত অবলম্বন আমাদের দেশে নূতন কিংবা অস্বাভাবিক একটা কিছু নহে। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে, সংঘমিত্রার ন্যায় ভারতের বাণী লইয়া, কবে ব্রহ্মচর্য্যশক্তি-সমন্বিতা কুমারী নারী শুধু স্বদেশে নহে, বিদেশেও ধর্মপ্রচারার্থ বাহির হইবেন? পাদ্রীরা আমাদের দেশে ধর্মপ্রচার করিতে আসেন, আর আমাদের ভারতবর্ষ হইতে, যে দেশ ত্যাগমহিমায় প্রসিদ্ধ—ব্রহ্মবাদিনী নারীগণ কি ধর্ম-প্রচারার্থ বাহির হইতে পারেন না?

বিদেশিনী হইলেও, কুমারীজীবনের কথা আলোচনা করিতে গেলেই, পুণ্যচরিত্রা ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে না

আসিয়া পারে না। বিবেকানন্দের শিষ্যা আয়র্ল্যাণ্ডদুহিতা নিবেদিতা ভারতবর্ষকেই তাঁহার কর্মক্ষেত্রে বলিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। একজন বিদেশিনী মেয়ে ভারতের জন্য সমগ্র জীবনটাকে যেরূপভাবে অকপটে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে হয়। যে-দেশের মেয়ে ছিলেন তিনি, সেই দেশের ত কোন অভাব ছিল না; কিন্তু কি অভাব পূরণের জন্য তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছিল? এইখানেই ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ্ অধ্যাত্মশক্তির কথা মনে পড়ে। ভোগ-সমৃদ্ধির মধ্যে লালিতপালিত হইয়াও তাঁহার জীবনে কেন অতৃপ্তি দেখা দিয়াছিল? এ কি শুধু বিবেকানন্দেরই অধ্যাত্ম প্রভাব? না, নিবেদিতার মধ্যেও নিজস্ব কিছু ছিল।

কুমারীজীবনে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষাই বড় দায়। ভগিনী নিবেদিতা এক জায়গায় বলিয়াছেন—"স্বামীজী প্রকাশ্যে আমায় একটি মাত্র ব্রত দিয়ে গেছেন, সে আমার ব্রহ্মচর্য্য। আমরণ এ ব্রত আমায় রক্ষা করতে হবে।" এই কথা ত ভারতবর্ষেরই কথা, ভারতের কুমারীজীবনেরই মর্ম-অভিব্যক্তি! বিদেশিনী এক কুমারীমেয়ের পক্ষে যে আদর্শ জীবনে রূপায়িত করা সম্ভবপর হইয়াছিল, ভারতের কুমারীমেয়ের জীবনে কি সেই আদর্শের বিগ্রহসন্দর্শন আজ অসম্ভব হইয়া পড়িল?

বর্তমান সামাজিক দুর্গতির দিনে, ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া একদল কুমারীকে আত্মগঠন করিতে হইবে। সতীত্ব-রক্ষার ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখা দিলে—ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান অসম্ভব। আজ বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাই; কিন্তু সেই সব পরিকল্পনার মধ্যে চরিত্র রক্ষার প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প-গ্রহণের কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি ত দেখিতে

পাই না। বিবাহ না হয় কুসংস্কারই হইল; কিন্তু কুমারীজীবনের পক্ষে পবিত্রতারক্ষার কি কোন মূল্য নাই? ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের কথা অমান্য করিয়া, সত্যিই কি আমরা জাতিকে অভ্যুত্থানের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিব? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে কুমারীদেব পবিত্রতারক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রের চিন্তা আরও সমধিক হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু রাষ্ট্রকর্ণধারগণ কি সত্যই এসম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন? যাঁহাদের চিন্তা করা প্রয়োজন, তাঁহারাই আজ ঋষির অনুশাসনে অবিশ্বাসী, সুতরাং অধ্যাত্ম-সংস্থা বা সঙ্ঘগুলিকেই ঋষিদের অনুশাসন প্রচারের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কুমারীজীবনের পবিত্রতা রক্ষিত না হইলে, গৃহস্থ-জীবনে সেই সব নারীদের নিকট আমরা বিশেষ কিছু আশা পোষণ করিতে পারি কি? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে, কুমার-কুমারীর জীবনযাপনপ্রণালী সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে। শিক্ষায় যে পযন্ত মানুষের মনে বিবেক জাগ্রত করিয়া, মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের অথাৎ চারিত্রিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার প্রেরণা না দিবে, সেই পর্যন্ত শিক্ষার কোন ফলই হইল না বুঝিতে হইবে। ভারতের গৃহস্থ-পরিবার পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে গঠিত হইলে, ভারতবর্ষের কোন মহিমা বা বৈশিষ্ট্যই থাকিবে না। তপোবনের ঋষি-পরিবারে কুমারীমেয়েরা যেভাবে চারিত্রিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া শিক্ষালাভ করিতেন, আজ সমাজের পক্ষে সেই শিক্ষারই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া মনে না করা, ব্যভিচারকে ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য না করা, সতীত্বরক্ষাকে কঠোর দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার না করাই যদি সভ্যতার লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ যে ক্রমশঃ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—ইহা বলিতেই হইবে। কিন্তু যাঁহাদের বিবেক আছে

যাঁহারা শাস্ত্র এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহারা কি এইরূপ সভ্যতাকে সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিবেন, না ইহাকে অসভ্যতাই বলিবেন? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে নর-নারীর দায়িত্বের কথা সকলকেই অনুধাবন করিতে বলি।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের টান, ভালবাসা বা আকর্ষণই পারিবারিক জীবনের মূল-ভিত্তি। দাম্পত্যজীবনে এই আকর্ষণের মূলে কি বিজ্ঞান নিহিত আছে অর্থাৎ পুরুষ স্ত্রীর প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়, স্ত্রীই-বা কেন পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হয়, এই অনিবার্য আকর্ষণ বা অনুরক্তির মূল নিদান কি, প্রত্যেক নর-নারীরই সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। সৃষ্টির মূলে, নারী-পুরুষের মিলনের নিশ্চয়ই একটা বিজ্ঞান আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রণীত জ্ঞানীগুরু গ্রন্থে তাহা অর্থাৎ আকর্ষণের মূল কারণ প্রাঞ্জলভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক নর-নারীকেই মনোনিবেশ-সহকারে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

'জ্ঞানীগুরু' গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"যেমন রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় না করিয়া কখনই রোগের মূলোচ্ছেদ করা যায় না, তদ্রূপ স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষার কারণ অবধারণ না করিলে সে আকুল আকাঙ্ক্ষা রোধ করা যায় না। এই জগতে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন ঘটিয়া থাকে। মহদাদি অণু পর্যন্ত সমস্তই এক নিয়মে গাঁথা; সেই আকুল আকর্ষণ-শক্তির বলে মানব কামের অনল-উত্তেজনা বুকে করিয়া ছুটাছুটি করে—নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি আকাঙ্ক্ষার শত বাহু লইয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রধাবিত হয়, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। এত আকাঙ্ক্ষা, এত উচ্ছ্বাস বোধ হয় আর কিছুতেই নাই। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলন-

জন্য যে নির্মল আনন্দ, প্রকৃতি-অংশসম্ভূতা রমণীর উপরে পুরুষ সেই মিলন আনন্দের অনুভূতি স্মরণ করিয়া ছুটিয়া পড়ে। আর প্রকৃতির যে রস উপভোগ করাইবার বাসনা, সেই বাসনাতে রমণী পুরুষে আসক্ত হয়। এই সম্মিলন-শক্তিই পুরাণের মদন, তাই তাহার অন্য নাম মনসিজ। অর্থাৎ এই সম্মিলন-ইচ্ছা মানবের মন হইতে জন্মে, তাই মদনের নাম মনসিজ।

"সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষ মূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতিঃ মাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভ কালে সেই সর্বব্যাপী জ্যোতিঃ আত্মা অভেদভাবে নাদ-বিন্দুরূপে প্রকাশমান হন। নাদ ও বিন্দু সগুণ শিব-শক্তি (যথা—"বিন্দুঃ শিবাত্মকঃ শক্তির্নাদ" ইত্যাদি)। বিন্দু পরমশিব, আর পরাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিই নাদরূপা। এই নাদবিন্দুযোগেই সৃষ্টিবিন্যাস হইয়াছে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির সংযোগে জীবপ্রবাহ অব্যাহত রহিয়াছে।

"এই মাতৃ-পিতৃশক্তিই জীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। ইহা দ্বারাই স্ত্রীদেহ, পুরুষদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সংসারে যত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তৎসমস্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। এই দুইটি শক্তিই পরস্পরের ভাবাবিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া নানাস্থানে নানাভাবে বিকশিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্য্য সম্পন্ন করে।

"যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের কথা বলা হইল, তাহারা আপনার অস্তিত্ব রক্ষা ও পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্বদাই পরস্পরের সম্মিলন চেষ্টা করিতেছে। তদ্দ্বারা উভয়েরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ওজস্বিনী শক্তিদ্বয়ই মানব-মানবীকে একীভূত করে। লৌহখণ্ডদ্বয়ে পরিস্ফুরিত বিরুদ্ধ চুম্বকশক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সম্মিলনের ইচ্ছায় আলম্বিত লৌহদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া সম্মিলিত হয়, স্ত্রী-পুরুষের উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব এবং

পুরুষত্বশক্তিও সেইরূপ নিজের নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া একত্র হয়; তদ্দ্বারা আনুভবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনোদ্বয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়। তাই বেদে স্বামী হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক্; স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্বপ্রকৃতি। পুরুষ জ্ঞান, স্ত্রী প্রেম। পিতৃ-অংশ উদাসীন—কেবল জীবনের উন্মেষক, আর মাতৃ-অংশ দেহ-সৃষ্টিকারক—কর্ম্মফলভোগ প্রবর্ত্তক।

"স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলনের দুইটি উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয় আত্মসম্পূর্ত্তি। মানুষ সুখ চায়—কেবল মানুষই বা বলি কেন, জগতে জীবমাত্রই সুখ চায়। সুখপ্রাপ্তির অন্যতম নাম আত্মসম্পূর্ত্তি। স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলনজনিত ঐন্দ্রিয়িক সুখে সে পূর্ণ-সুখ নাই। সে সুখ ত অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিভক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে, ক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া এই দুই শক্তির মিলনে আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে, তখন মানুষ পূর্ণ হয়। পূর্ণ হইলে জগতের যে প্রধান আসক্তি নর-নারীর মিলনেচ্ছা, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, ঘৃতে আয়ু ও বল বৃদ্ধি করে, আবার অস্বাভাবিক ভোজনে উদরের পীড়া জন্মে, তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন-ক্রিয়াও জ্ঞানের সহিত সংসাধিত না হইলে আত্মসম্পূর্ত্তি দূরের কথা, আত্মহত্যাই হইয়া থাকে। তবে যে কোনরূপে স্থায়ীভাবে তাহাদের মিলন করিয়া লইতে পারিলে আর ঐ মিলনেচ্ছা আসক্তিতে পরিণত হয় না।

"স্ত্রী-জাতির উপরে পুরুষের যে আকুল আকর্ষণ, যে উন্মাদ কামনা, তাহা কেন হয়, বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। কীট-পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই যাহার প্রবল আকর্ষণে আকর্ষিত, যে মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি মিলন-আশায় উন্মত্ত, তাহা কি মনে করিলেই পরিত্যাগ করা

যায়? বাস্তবিক স্ত্রী-পুরুষের মিলনেচ্ছা বিধিকৃত, জীবের ইচ্ছাধীন নহে। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে সামরস্য-সম্ভূত আনন্দ আত্মা সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই মিলনানন্দ উপভোগের জন্য জীব নিরন্তর ব্যাকুল। তাই রমণী দেখিলে পুরুষ পূর্ব অনুভূতি স্মরণ করিয়া দানবের দীপ্ত চাহনিতে চাহিয়া থাকে, পতঙ্গের ন্যায় রমণীর রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দেয়। মাতৃশক্তির বিকাশে পিতৃশক্তির এই আকুল আকাঙ্ক্ষা—পিতৃশক্তির এই উন্মাদ কামনা। বালিকাতে মাতৃশক্তির এই বিকাশ হয নাই, বৃদ্ধার ঐ শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, তাই বালিকা বা বৃদ্ধা পিতৃশক্তি আকর্ষণে সমর্থা নহে। যুবতীতেই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ, তাই পেচকীসদৃশী যুবতীও পুরুষের চক্ষে অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন কামিনীর জন্য মানুষ কেন পাগল হয়, কেন উন্মত্ত হয়, বুঝিয়াছ? এক বিন্দুপদার্থের ধারণাই তাহার কারণ, ঐ রজোবিন্দুর মিলনেচ্ছাই তাহার উদ্দেশ্য।

"কিন্তু মানুষ যে সাধনা করিতে যায়, তাহা জানে না বলিয়াই বিন্দুপতন হয়। তখন পুরুষ আর নারীর বদন নিরীক্ষণ করিতে চায় না। ক্ষণপূর্বে যে রমণীতে সুধাংশুসৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল, তাহা এখন রক্তক্লেদপরিপূর্ণ মাংসপিণ্ড বোধ হয়। ক্ষণপূর্বে যাহার নিঃশ্বাস সুরভি পবন বলিযা বোধ হইত, তাহা এখন মরুভূমির তপ্ত শ্বাস বলিয়া অনুভব হয়। যে মানুষ মুহূর্ত্তপূর্বে রমণীকে সুখের খনি মনে করিয়াছে, এখন সে আর তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতেও ইচ্ছুক নহে। মুহূর্ত্তে কেন এমন বিষম বিপ্লব, কেন এমন ঘোর পরিবর্তন? যে উদ্দেশ্যে বিন্দু আসিয়াছিল, যে আনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তোমার অনভিজ্ঞতায় মাতৃশক্তির সহিত মিলন হয় নাই, তাই সেই মিলনানন্দের কণিকা উপলব্ধি করাইয়া অভিমানে ঝরিয়া পড়িয়াছে। আবার যখন সে শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার রমণীতে অমৃতভ্রম

জন্মিয়া থাকে। আবার পিতৃশক্তির ক্ষয় হইলেই বাসনা নিবিয়া যায়।

"ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ যোগবলে এই নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্বলিতকণ্ঠ জীবকে অমৃতধারায় স্নিগ্ধ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন, রমণীর আসঙ্গস্পৃহা পরিত্যাগ করিবার শক্তি কাহারও নাই, তাই রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।* আর যোগিগণ নাদবিন্দুসংযোগের প্রণালী অবলম্বনে প্রকৃতির অনলবাহুর হাত এড়াইবার ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন।

"প্রকৃতি রমণীমূর্ত্তি বা মাতৃশক্তি রূপে সর্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং বাঁধিয়া রাখে। যদি সেই শক্তিকে সাধনার দ্বারা বশ করিয়া তাহাতে আত্মসম্মিশ্রণ করিয়া লওয়া যায়, যদি রজোবিন্দুর বা শিব-পার্ব্বতীর মিলন সংঘটন করিতে পারা যায়, তবে তাহার আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না; যাহার আকর্ষণে জীব নরকের নকারের প্রতি ছুটিয়া যায়, সেই আকাঙ্ক্ষার আগুন নিবিয়া যায়, বিন্দু রক্ষা হয়, আর ঐ মিলনে ক্ষণকালের জন্য যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ স্থায়ী-ভাবে সাধকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। কামনার আগুন নিবিয়া গেলেই সাধকের স্বতঃই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা পূর্ণতম ব্রহ্মজ্ঞান! ইহা একটি ব্রহ্মজ্ঞানীর অনন্ত সাধনা, ইহা পিতৃমাতৃশক্তির সংযোজনা বা হর-গৌরীর পূর্ণ মিলন—আত্মায় আত্মায় মিশামিশি, বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়াজড়ি করিয়া যেমন মিশিয়া যায়, ইহাও সেইপ্রকার মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না।

* তন্ত্রশাস্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্বের সাধনায় রমণীত্ব জননীত্বে পরিণত হয়। তাহার সাধনপ্রণালী "তান্ত্রিক গুরু" পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

দুই শক্তি এক হইয়া আত্মসম্পূর্তি লাভ করে, অপূর্ণ মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তবে এ রসের রসিক না হইলে, এ তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে তাহা অনুভব হইবার নহে। যাঁহারা যোগবলে, সাধন-প্রভাবে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন।

"রজঃ ও বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তি ও শিব বা প্রকৃতি ও পুরুষ; এই উভয়ের মিলনে জীবের সৃষ্টি। কিন্তু যোগী যদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই মিলনেই তাহার পূর্ণতাসংসিদ্ধি বা আত্মসম্পূর্তি ঘটিয়া থাকে। সদাশিব বলিয়াছেন—

অহং বিন্দু রজঃশক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবতাং ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥
—শিবসংহিতা

—আমি বিন্দু এবং রজঃ শক্তি; সাধনবান্ যোগী এই জ্ঞানে যখন উভয়ের মিলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হয়।

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥
—শিবসংহিতা

—বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজঃ সূর্য্যময়। অতএব যত্নপূর্বক সর্বদা যোগীর আত্মশরীরে উভয়ের মিলন করা কর্তব্য।

"সেই রজোবিন্দুরূপী প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিলন করার নাম নাদ-বিন্দুযোগ। তাহার ক্রম এইরূপ, যথা—

"মণিপুরপদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ তাম্রবর্ণ রজঃ আছে। পূরক-যোগে কুণ্ডলিনীশক্তির সাহায্যে ঐ রজঃ উত্তোলনপূর্বক সহস্রদল-কমলকর্ণিকামধ্যে শুদ্ধস্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ এবং কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজোময় যে বিন্দু আছে, তাহার সহিত সংমিলন করিবে।

"পূর্বোল্লিখিত অভ্যাসযোগেই তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকেই নাদবিন্দুযোগ বলে। এই সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃতি বশীভূত, আত্মজয় এবং আধ্যাত্মিক মরণের ভয় নিবারিত হয়। ইহা যোগীর সূক্ষ্ম-সাধনা।

"এই প্রণালী ব্যতীত শাস্ত্রে রসতত্ত্বসাধনার বা নাদবিন্দুযোগের স্থূল উপায় বর্ণিত আছে। তাহা বাহ্যসাধনা। নারীর সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হয়। স্ত্রী পুষ্পিতা হইলে প্রথম তিন দিন এই ক্রিয়া অভ্যাসের উপযুক্ত সময়। ঋতুকালই পূর্ণরসের কাল বা মাতৃশক্তির বিকাশকাল। উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ এবং সর্ববিধ পশুতে কেবল ঋতুকালে মাতৃশক্তির বিকাশ; কিন্তু মানবীতে সর্বদাই রসের বিকাশ, সুতরাং এখানে সর্বদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)। সর্বদা বিকাশ থাকিলেও ঋতুকালে কেবল উহা অধিক পরিপুষ্ট, অধিক বিকশিত, আর অন্য সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্পবিকাশ। রজঃশক্তির সাহায্যে বিন্দু স্থিরভাব ধারণ করে। যেমন বড় তরল—বড় চঞ্চল পারদকে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধকের প্রয়োজন, তদ্রূপ বিন্দুধারণের জন্য রজঃশক্তির আবশ্যক; বিন্দু ও রজঃ একত্র করিলে উহা ধারণ করা যায়। সেই আকাঙ্ক্ষার পদার্থ—চিরবিরহের অমূল্যনিধি প্রাণে আসিয়া সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিয়া থাকে। নতুবা শত চেষ্টাতেও কেহ বিন্দুধারণে সমর্থ হয় না। কারণ স্ত্রীলোক-স্মরণমাত্রে বিন্দু চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে সাধকের অজ্ঞাতে—অজানিতভাবে কখন বাহিরে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? তাই মাতৃশক্তির সংযোজনাদ্বারা পিতৃশক্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে।"

স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলনের এই অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান আদর্শ গৃহস্থ-নরনারীর প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা কর্তব্য। কিন্তু আত্মসম্পূর্তির স্থূল

প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে গিয়া নর-নারী প্রত্যেককেই ইহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মগতপ্রাণ প্রকৃত নিষ্কামী সাধক ভিন্ন অন্যে এই তত্ত্বের অধিকারী নহে। অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়াই সমাজের অধিকাংশ নর-নারী সম্মিলিত হয়, কিন্তু জ্ঞানপূর্বক সম্মিলনে প্রভূত উপকার এবং তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। সৃষ্টিব্যাপার লজ্জা বা উপেক্ষার বিষয় নহে। ইহার মূল কারণানুসন্ধানে জীব ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত হইতে সক্ষম হয়। জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া এবং অজ্ঞানের ক্রিয়া দুইটির মূল্য এক নহে। বিজ্ঞানে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়, আর জ্ঞানের অভাবে চিরকাল অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকে।

রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিবার সাধনকৌশল শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রণীত 'তান্ত্রিক গুরু'র একটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"তন্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন, বেদ-পুরাণানুযায়ী উপদেশমত রমণীর আসঙ্গলিপ্সা পরিত্যাগ করা জীবের দুঃসাধ্য, সে নেশা—সে আকুল তৃষা, জীব মনে করিলেই ছাড়িতে পারিবে না, কারণ জীবমাত্রেই রমণীর আবিষ্ট শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তাই কৌশলে রমণীর পরিচর্য্যা করিয়া—তাঁহার শরণাগত হইয়া—তাঁহার সহিত আত্ম-সংমিশ্রণ করিয়া প্রকৃতির কোমল বাহুবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। মায়ারূপিণী রমণীকে জয় করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক-রাজ্যে এক পদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। জীবের সাধ্য নাই যে, ঘৃণা বা অন্য উপায়ে রমণীর আকর্ষণ হইতে নিজকে রক্ষা করে। কেবল দেখিতে পাই, শিশু-বালকেই একমাত্র রমণীকে আপন আয়ত্তে রাখিতে পারে। বালকের কাছে নারীর সমস্ত মায়ার কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। রমণী শিশুর দাসী হইয়া সর্বদা তাহার সুখ-স্বাচ্ছ্যের জন্য

ব্যস্ত। জননী সন্তান বুকে করিয়া জগৎ ভুলিয়া যায়, সন্তান দেখিলেই স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া সযত্নে কোলে তুলিয়া লয়। সেখানে কোনরূপ অভিমান-আব্দার খাটে না। তন্ত্রশাস্ত্রকার রমণীকে ঘৃণা না করিয়া জননীর আসন দিয়াছেন, রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের দুর্গম রাস্তার প্রধান বিঘ্ন অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কুলাচারী রমণীসম্বন্ধে পবিত্রতাভাব রক্ষার জন্য কিরূপ আদেশ আছে, তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিলেই তাহা অবগত হওয়া যায়। উত্তর-তন্ত্রে আছে—'যে সাধক নারীরূপা শক্তিকে মানুষ মনে করে, তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না, বরং বিপরীত ফললাভ করিবে।' তন্ত্রকার বলিয়াছেন - 'নারীতে জগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ ভাবনা করিয়া সর্বদা ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে। ভ্রমেও কখন নারীর নিন্দা বা নারীকে প্রহার করিবে না। স্ত্রী-মূর্ত্তির অন্তরালে শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ং রহিয়াছেন, একথা স্মরণ না রাখিয়া ভোগ্যবস্তুবিশেষ বলিয়া সকামভাবে স্ত্রী-শরীর দেখিলে উহাতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার অবমাননা করা হয় এবং উহাতে মানবের অশেষ অকল্যাণ আসিয়া উপস্থিত হয়। যত স্ত্রীমূর্ত্তি, সকলেই সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্ত্তি—সকলেই জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ। তাই চণ্ডীতে দেবতাগণ বলিয়াছেন—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ ১১।৬

—হে দেবি! তুমিই জ্ঞানরূপিণী, জগতে উচ্চাবচ যত প্রকার বিদ্যা আছে, যাহা হইতে লোকের অশেষপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে—সে সকল তুমিই তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা, তুমিই জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে

বিদ্যমান, তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্বত্র বিদ্যমান। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা—স্তব করিয়া তোমার অনন্তগুণের উল্লেখ করিতে কে কবে পারিয়াছে বা পারিবে?

"কিন্তু হায়! জানিয়া শুনিয়া কত লোকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ প্রকাশের আধারস্বরূপিণী স্ত্রী-মূর্ত্তিকে হীনবুদ্ধিতে—কলুষিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া দিনের ভিতর শতসহস্রবার তাঁহার অবমাননা করিতেছে। কয়জনে দেবীবুদ্ধিতে স্ত্রীশরীর অবলোকন করিয়া—যথাযথ সম্মান দিয়া, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবার ও কৃতার্থ হইবার উদ্যম করিতেছে? পশুবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা করিয়া ভারত দিন দিন অধঃপাতে চলিয়াছে।"

হিন্দুশাস্ত্র দেহ ছাড়িয়া দেহাতীত দিব্যভাবের প্রতি সর্ব্বদাই ইঙ্গিত করিতেছে। হিন্দুর দর্শন, পুরাণ, কাব্য, সাহিত্য নিছক বস্তু-তান্ত্রিক ভাবের কথাতেই পরিপূর্ণ নহে—সর্বত্র রহিয়াছে একটি বিদেহী-ভাবের অপূর্ব রূপায়ণ। নারীর দেহকে পূজা করিবার বিধান—একমাত্র হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ আছে। শক্তিপীঠে কুমারীপূজার প্রথা এখনও বিদ্যমান। হিন্দু জানে, 'যত্র নারী তত্র গৌরী।' এইখানেই হিন্দুধর্মের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। মনুসংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩।৫৬

যেখানে স্ত্রীলোকের সমাদর নাই, পূজা নাই, সম্মান নাই, সেখানে সব ক্রিয়াকর্মই নিষ্ফল। পূজা মানে শ্রদ্ধার ভাব, দৈবীভাব। স্বামীকে বলা হইতেছে না যে, স্ত্রীকে ফুল-বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে। অবশ্য সেইরূপ উচ্চভাব আসিলে স্ত্রীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশসম্ভূতা মনে করিয়া পূজাও করা যায়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সারদাদেবীকে

মা ভবতারিণীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। স্ত্রীকে ইষ্টদেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করা সাধারণের কর্ম নহে। এইরূপ স্বর্গীয় দৈবভাব সাধারণ নরনারীর মাঝে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও যে নাই, একথা বলা চলে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতখানি উচ্চভাব না থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে ঋণী। অতএব কাহারও প্রতি কাহারও অবজ্ঞার বা উপেক্ষার ভাব থাকা কর্তব্য নহে। স্ত্রীদেহকে সর্বদা কামদৃষ্টিতে দেখা আদর্শ স্বামীর পরিচায়ক নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনদিনই সারদাদেবীকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখেন নাই—বরঞ্চ ইষ্টমূর্তিরূপে পূজা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সারদাদেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি আমাকে কি ভাবে দেখ?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন—"মন্দিরে যে ভবতারিণীর পূজা করি, এই দেহেও তাঁহাকেই দেখি।" দাম্পত্যজীবনযাপনের ভিতর দিয়াও কিরূপ স্বর্গীয় দেহাতীত ভাবের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা সুপ্রমাণিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করিয়াও এইরূপ নির্লোভ দৃষ্টি এক অতিমানব মহাপুরুষের মাঝেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ এবং স্বপ্রতিষ্ঠা নারীই এইরূপ পরস্পর পরস্পরের মর্যাদা সংরক্ষণ করিয়া চলিতে সক্ষম। মোটকথা, ভোগ্য-ভোক্তার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে দেহাতীত দিব্যভাবের সন্ধান মিলে না। এই বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কঠোর দায়িত্ব রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র নারীকে মহাশক্তিস্বরূপিণী বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছে। তন্ত্রসাধনার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, নর-নারীর ভিতর যে প্রাকৃত ভাব রহিয়াছে তাহা

সংশোধিত করিয়া কি ভাবে প্রত্যেক নর-নারী হর-পার্বতীরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহারই কৌশল জ্ঞাপন করা। দাম্পত্যজীবনে অজ্ঞাতসারে যে তন্ত্র সাধনা চলিযাছে, জ্ঞানপূর্বক তাহার অনুষ্ঠান করাই উন্নত সাধকের পরিচায়ক। নারীকে ভোগদৃষ্টিতে সন্দর্শন করার ফলে, সাধনায় লোকের ভিতর যে সংস্কার জন্মে, তাহাতে তাহাকে দেবীরূপে শ্রদ্ধা-সম্মান-পূজাদি করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য জন্ম-জন্মান্তরীণ সংস্কারকে অতিক্রম করা কঠিন বটে, কিন্তু অভ্যাস এবং সাধনার ফলে মানুষ সবই করিতে পারে। প্রত্যেক নারীর ভিতরই মা জগদম্বা রহিয়াছেন। সাধনকৌশল জানিলে এই প্রসুপ্ত দেবীভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলা যায়। যে প্রকৃতি, যে স্বভাব লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার রূপান্তর ঘটানোই ত মানবের সাধনা। পরমহংসদেবের ভাষায় লিঙ্গ গুহ্য নাভি—এই তিন স্তরকে অতিক্রম করিতেই হইবে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে—চাই ত্যাগ-সংযম-ব্রহ্মচর্য। দাম্পত্যজীবনেও ব্রহ্মচর্যের বিধান শাস্ত্রে রহিয়াছে। আমাদের সংস্কৃতশাস্ত্রে নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে আর্যপুত্র ও দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন দেখিতে পাই। বর্তমানের মত সর্বক্ষণ নারীদেহের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পুরুষদের ছিল না। ব্রহ্মচর্যের কঠোর নিয়মে নারী-পুরুষের জীবন সুগঠিত হইয়া উঠিত বলিয়াই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা মর্যাদার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। দাম্পত্যজীবন সম্ভোগেরই জীবন বটে, কিন্তু ত্যাগ সংযম ব্রহ্মচর্য ব্যতীত সম্ভোগও করা চলে না। যুক্তাহারবিহারই আদর্শ গৃহীর লক্ষণ। আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, চাই ব্রহ্মচর্যের সাধনা। পরবর্তী অধ্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর আচার এবং ব্রহ্মচর্যের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করিব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ত্যাগ-সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিবার পূর্বেই সমাজের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর যে প্রাণের ঐকান্তিক আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন, তাহার কথাই প্রথমে উল্লেখ করিব। 'ব্রহ্মচর্য্য সাধনের' ভূমিকাতে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"যাহা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া যুবকগণকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা সাধারণকে বুঝাইয়া দিউন; যে শিক্ষায় মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাহার প্রচার লজ্জাজনক বা কুরুচি মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর হিন্দুদিগের রক্ষা নাই। আমরা যে আয়ু, বল, স্বাস্থ্য, যৌবন-শক্তি, ধারণাশক্তি, সৎসাহস, উচ্চ আশা—এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের যথাসর্বস্ব একেবারেই হারাইয়া ফেলিতেছি, তাহার একমাত্র কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।

"অতএব যদি প্রকৃত দেশের উন্নতি ইচ্ছা থাকে, তবে আপামর-সাধারণকে ব্রহ্মচর্য্য অভাবে যে কি হইতেছে, তাহা সর্বাগ্রে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। কেবল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর বলিয়া বক্তৃতা দিলে চলিবে না। ধনী মহাশয়েরা ধন, বিদ্বানেরা জ্ঞান এবং সাধারণে অধ্যবসায় লইয়া প্রস্তুত হউন। প্রথমতঃ ছাত্রগণের সৎসাহস এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিশেষ প্রয়োজন। একদিনেই যে দেশের অভাব দূর হইবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদিগের পুত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য পালনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে, অন্ততঃ সেই সংস্কার লাভ করিতে হইবে। ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সুবিধা পায়, প্রতি জেলায়, মহকুমায় এবং বিশিষ্ট পল্লীতে এমন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।"

আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন গঠনের মূল ভিত্তিই হইল—ব্রহ্মচর্য্য। আজকাল সমাজের নর-নারীর কাহারও এই দিকে মোটে দৃষ্টি নাই। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া সামাজিক শিক্ষায় নর-নারী যতই কেন অগ্রসর হইয়া চলুক না, তাহাতে জাতির প্রকৃত কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইবে না। সমাজকল্যাণকামী নেতাগণ অন্য সকল বিষয়েই সজাগ; কিন্তু হিন্দুসমাজের ভাবী আশাভরসাস্থল, সুকুমারমতি কুমার-কুমারী ও যুবক-যুবতীর ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষাসম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্রহ্মচর্য্য-সাধন চরিত্র-গঠন সম্পর্কে কেহই আর কোন কথা বলেন না। যে কোন কারণেই হউক, সমাজের নেতাগণের এই যে আবশ্যকীয় বিষয়টির প্রতি এই নিদারুণ উপেক্ষা-অবজ্ঞা, ইহাতে সমাজের যে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা আর বলিবার নয়। হিন্দুসমাজ আজ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে উৎখাতের পথে চলিযাছে। এইজন্যই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর সমাজের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যসম্পর্কে যুব-সমাজকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিকই নর-নারীর নৈতিক-জীবন যতদিন পর্যন্ত সুগঠিত না হইবে, সেই পর্যন্ত জাতিতে কদাচিৎ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তরূপ দুই-একটি মহামানব দৃষ্ট হইলেও বিরাট জাতির উন্নতি হিসাবে কিছুই হইবে না। সমগ্র জাতির এই বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে, চরিত্র-গঠন এবং ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা বিষয়ে সকলকে সচেতন হইতে হইবে। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে সর্বাগ্রে সমাজের যুবক-যুবতীগণকে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ সংযমের সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আজকাল হিন্দু-পরিবারের দিকে লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার দৃষ্ট হয় যে, কাহারও আর আহার-বিহার-সংযমের প্রতি মনোযোগ নাই। যথেচ্ছ-ভাবে সকলেই বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব

লইয়া জাতির অভ্যুত্থান হইবে কেমন করিয়া? যে কোন কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলেই—চাই শক্তি, চাই স্বাস্থ্য, চাই ধৈর্য্যশীলতা। এই সব আসিবে কোথা হইতে? ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়া পড়িলে ক্রমশঃই জাতির দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। দুর্বল দেহ, দুর্বল মন লইয়া জাতি উন্নতি করিবে কেমন করিয়া? মহাপুরুষগণ জাতির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া একবাক্যে ব্রহ্মচর্যরক্ষা বিষয়ে যত্নপর হইতে সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জীবন-গঠনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে কয়জন? সর্ববিষয়ে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিয়া এখনও কি হিন্দুজাতির চেতনার সঞ্চার হইবে না?

সমাজ আজ পুঁথিগত শিক্ষায় উন্নত বটে, কিন্তু চরিত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে পশ্চাৎপদ। যে কোন প্রকারেই হউক, চরিত্র থাকুক আর যাউক; সতীত্ব রক্ষিত হউক আর না হউক, পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেই সমাজের কাছে সব অপরাধ মার্জ্জনীয়। চরিত্রহীন হইয়াও ডিগ্রীধারী বা ধারিণী হইতে পারিলে সকলের মুখই চুপ। এখন সকলের উপরে স্থান হইল—পরীক্ষা পাশের; তা-ও আবার বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে হইলেই হইল। চারিত্রিক পবিত্রতা হারাইয়া এই যে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীলাভ—ইহার কোন সার্থকতা আছে কি? নিছক বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ হইলে কি হইবে? কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে হইলে যে সব গুণ (অর্থাৎ কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি) থাকা প্রয়োজন, সেই সব গুণ অর্জ্জন বিষয়ে জাতি আজ অনেক পশ্চাতেই পড়িয়া আছে। কাজেই সমাজ প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইয়া ক্রমশঃই অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। সমাজের আজ এমনই দুরবস্থা যে, শক্তির অপচয়-অপব্যবহার করিয়াও কাহারও মনে আর বিন্দুমাত্র আত্মগ্লানির ভাব দেখা যায় না। নির্বিচারে দিনের পর দিন অন্যায় পথে

চলিয়াও কাহারও প্রাণে এতটুকু অনুশোচনার ভাব জাগিতেছে না। মানুষের ভিতর আর বিবেকের দংশন বলিয়া কিছুই নাই। ভিতরে বিবেক থাকিলে তবে ত তাহার দংশন হইবে? বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে বিবেকবোধনের কোন স্থান নাই। অন্যায় করিয়া নির্লজ্জের মত অবিকম্প-চিত্তে সমাজে বিচরণ করিবার দুঃসাহস আজ সর্বত্রই প্রকটিত। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অধঃপতিত অবস্থা ইহাই যে, কেহ আর এখন অন্যায় করিয়া ভিতরে গ্লানি অনুভব করে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরকাল-পরলোকেরও কোন ভয় নাই, কাজেই পরিণাম-চিন্তায় যে অনুতাপ আসিবে, তাহারও কোন পথ নাই। মোটকথা, সর্ববিষয়েই সমাজের নর-নারীদের মধ্যে বেপরোয়া মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে। সমাজে আজ উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডবলীলা চলিযাছে।

এই দুরবস্থার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, প্রথমে জাতির প্রাণে অটুট সঙ্কল্পেরই উদ্বোধন করিতে হইবে। সকলের না আসুক, সমাজের মুষ্টিমেয় নর-নারীর প্রাণে যদি ভাল হইবার—আদর্শ হইবার প্রেরণা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই হইল। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনের প্রেরণা মুষ্টিমেয় নর-নারীর প্রাণেই প্রথমে উদ্বুদ্ধ হউক।

জড়পদার্থ নিরুপায়ভাবে স্রোতে ভাসিয়া চলে; কিন্তু মানুষ ত আর জড় নয়—চেতন। যে কোন মুহূর্তে অবস্থা বুঝিয়া মানুষ সঙ্কল্পসহায়ে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। সমুদ্রবন্ধন অসম্ভব মনে হইলেও শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকট সমগ্র প্রকৃতিই করযোড়ে দণ্ডায়মানা। আজ সমাজে অটুটসঙ্কল্পব্রতধারী একদল নারী-পুরুষেরই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রতিজ্ঞা হইবে—"জীবন বিসর্জন দিব, তথাপি সঙ্কল্পচ্যুত হইব না, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

একদল নর-নারীর ভিতর এই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প জাগরিত হউক। তবেই যদি জাতি বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পায়। বর্ত্তমান সমাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতকে বন্ধ করিতে হইলে চাই একদল সাধক-সাধিকা নর-নারী। কি করিয়া এই অধঃপতিত সমাজের কল্যাণ হইবে, মানুষ মানুষের মত বাঁচিতে পারিবে—এইরূপ কল্যাণ-চিন্তায় তাহাদের মন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। প্রেরণা জাগিলেই পথের সন্ধান মিলিবে। পথ ধরিয়া চলিতে আর কোন অসুবিধা হইবে না। বাহির হইতে ভদ্রসমাজের ভদ্র-বেশভূষা দেখিয়া কিছুই বুঝিবার জো নাই। কিন্তু সন্ধানী-দৃষ্টি লইয়া বর্তমান সমাজের নব-নারীর মানসিক বৃত্তির দিকে তাকাইলে প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হিন্দুসমাজ ভোগের জন্য আজ উন্মাদ—পাগল। ত্যাগ-সংযম-তিতিক্ষা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। পশু যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হইলে উদর পূরণ করে, ভোগ করিবার ইচ্ছা হইলে ভোগে রত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপর যেমন তাহাদের কোন আধিপত্য নাই, মানুষও আজ সেই স্তরে উপনীত। ক্ষুধা পাইলে মানুষ খায়, কামপ্রবৃত্তি জাগিলে বৃত্তির চর্চ্চা করে। তাহাতে বিধি-নিষেধের কোন বালাই নাই। পশু-জগৎও যে নিয়মটুকু প্রতিপালন করিয়া চলে, চেতন মানুষ সেই নিয়মটুকু পর্যন্ত প্রতিপালন করিয়া চলে না। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়া যে বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, নির্ব্বিচারে সেই সব বিধি এখন উল্লঙ্ঘিত হইতেছে। এখন সমাজে আছে শুধু একটি স্রোত বা প্রবাহ—সেইটি হইল স্বেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত। এই ত হিন্দুসমাজের অবস্থা। এই সমাজকে রক্ষা করিবে কে?—আদর্শ-গৃহী।

আদর্শ-গৃহী ত্যাগ-সংযম-তিতিক্ষাগুণে বিভূষিত। ক্ষয়রোগগ্রস্ত হিন্দুসমাজকে বাঁচাইবে—এই আদর্শ-গৃহী। সমাজের প্রত্যেক নরনারীর

মনে একটা পবিত্র ভাবের সঞ্চার হওয়া চাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে মনে রাখিতে হইবে, কেবল দৈহিক ভোগে প্রমত্ত হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে চলিবে না। আদর্শ সমাজের স্রষ্টা তাহারাই। সুস্থ সবল বলিষ্ঠ সন্তানের জনক-জননী হইতে হইলে—ত্যাগ-সংযম-সদাচার একান্ত প্রয়োজন। আজকাল মায়ের কোলে বিকলাঙ্গ সন্তান-সন্ততির উদ্ভব হইতেছে বেশী। ইহার কারণ কি? শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র তাঁহার "নারী" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"নারীরা পুরুষদিগের সহিত প্রতি-যোগিতায় কর্ম করিতে হইলে রজঃকালীন যে বিশ্রাম তাহাদিগের একান্ত আবশ্যক, তাহা তাহারা পায় না। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও সে বিশ্রাম পায় না। পূরামাত্রায় অন্য সময়ের মত কর্ম করিতে বাধ্য হওয়ায়, তাহাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার—তজ্জন্য তাহাদিগের নানারূপ ব্যাধি—বিশেষতঃ স্নায়বিক ব্যাধি হয়—যাহার জন্য তাহাদিগকে আজীবন অনেক সময় ভুগিতে হয়। 'নারীনিগ্রহী' হিন্দুরা তাহাদিগকে তৎকালে অশুচি বলিয়া তাহাদিগের অভ্যস্ত কর্ম হইতে বিরাম দিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিল—যাহা কোন অবলাবান্ধব পাশ্চাত্ত্যসমাজ এ-পর্যন্ত করে নাই। পূর্বকালের হিন্দুরমণীরা তাঁহাদিগের অটুট স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহারা অনেক স্ত্রীরোগ (একালের তরুণীরা সাধারণতঃ যে সকল রোগে ভুগিয়া থাকেন) হইতে মুক্ত ছিলেন, রজঃকালীন নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তন করার ফলেই ঐ প্রকার স্বাস্থ্য সম্ভবপর ছিল। যদি তরুণীদিগের অভিভাবকেরা এই কথাটা মনে রাখেন ও তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে নারীদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজেই ও বিনাব্যয়ে হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহাদিগকে সেই অবস্থায় স্কুলে পাঠাইতেছি—থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্রিকেট ম্যাচে লইয়া গিয়া তাহাদিগের স্নায়ু উত্তেজিত করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন করিতেছি।

"রজোনির্গমের আরম্ভ হইতেই—পুরুষদিগের শুক্র জন্মিবার পর হইতে—এক প্রকার নূতন শারীরিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। স্নায়ুমণ্ডলী কাম-উদ্ভাসিত হয়। তৎকাল হইতে জননেন্দ্রিয়সংশ্লিষ্ট রসগ্রন্থি হইতে একপ্রকার স্রাব নিঃসরণ হয়, যাহা স্নায়ুগণকে উত্তেজিত করিয়া বিশেষতঃ উচ্চ মানসিক ক্রিয়াকারী মস্তিষ্কের অংশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—তাহা বিশেষ সুখদায়ী—তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়—ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি করে; কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ-হরমোনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাতে পুরুষের ক্রিয়াশক্তি, সৃষ্টি করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে—মনে মনে অনেক সাহসী কর্ম করিবার ইচ্ছা উদ্দীপিত হয়—তাহাদিগের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ু কাম-উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে তাহাদিগের কর্মশক্তি ও প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে না—তাহাদিগকে নম্র করে—পরের অনুগামিনী হইবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে, তাহারা তৎকালে মনে মনে সুখের স্বপ্ন দেখে—তাহাদিগের আত্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা বর্দ্ধিত করে—নিজেদের ব্যক্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি হয়।"

স্বাভাবিক নিয়ম বা প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিলে তাহার কুফল ব্যাধিরূপে দেখা দিবেই। আমাদের প্রাচীন যুগে, মুনি-ঋষিরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া সামাজিক ব্যবস্থার বিধান করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক বিধি-নিষেধের মূলে ছিল—সমাজকল্যাণকামনা। নারীদিগের অশুচি অবস্থায় ঋষিগণ তাহাদিগকে অস্পৃশ্যা বলিয়াছেন। এই অস্পৃশ্যতার নামে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবিয়াও দেখেন না এই বিধানের মূলে কি উদ্দেশ্য নিহিত! ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েসনের জার্ণালে সুব্বা রাও এবং গুপ্ত লিখিয়াছেন—"একটি ফোটা ফুল গাছ হইতে তুলিয়া রজস্বলা স্ত্রীলোক

ধরিয়া থাকিলে ২০ মিনিটে ফুলটি শুকাইয়া যায়। কিন্তু অরজস্বলা স্ত্রীলোক হাতে করিয়া ধরিয়া থাকিলে ৪০।৫০ মিনিট সহজেই থাকে। তাঁহারা আরও বলেন যে, রজস্বলা স্ত্রীলোকের দেহ হইতে একপ্রকার বিষাক্ত বস্তু নির্গত হইতে থাকে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, পাঁউরুটি তৈয়ার করিবার সময় রজস্বলা স্ত্রীলোক ময়দা মাখিলে বা ঠেসিলে রুটি ফুলিয়া উঠে না, কিন্তু অরজস্বলা স্ত্রীলোকের হাতে সহজেই ফুলিয়া উঠে।" এই বিষয়ে তাঁহারা বহু জার্মান, বেলজিয়ান, সুইস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষার নজীর দিয়াছেন। তাই হিন্দুশাস্ত্রে রজস্বলা স্ত্রীকে অস্পৃশ্যা বলিয়াছেন।

"ভারতাজির" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় (২১শ বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা) ধর্মরত্ন ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্, ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বটানী (**Botany**) পড়িতেছে। শিক্ষক নূতন প্রস্ফুটিত ফুল লইয়া কাজ করিতেছিলেন। ১৫ মিনিট পর একটি ছাত্রী বলিয়া উঠিল, আমার ফুলটি শুক্‌না। শিক্ষক মহাশয় তাহাকে দ্বিতীয়বার একটি ফুল দিলেন, ২০ মিনিট পর সেটিও শুকাইয়া গেল। এক ঘণ্টার ক্লাশ। দুইবার দুইটি ফুল নষ্ট হওয়ায় শিক্ষক মহাশয় বিরক্ত হইয়া তৃতীয়বার ফুল দিলেন। সেটিও ঘণ্টার শেষে শুকাইয়া যাইতে, শিক্ষক মহাশয় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—'তোমার ব্যাপার কি? পুনঃ পুনঃ বাছিয়া ফুল দিতেছি, তোমার হাতে শুকাইতেছে, আর কাহারও হাতে ত শুকাইতেছে না! তোমার কোন অসুখ করিয়াছে কি?' মেয়েটি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'না, অসুখ করে নাই; রজস্বলা হইয়াছি।' অধ্যাপক বলিলেন, 'তাহাতে কি? তাহার জন্য ফুল শুকাইবে কেন?' কিন্তু মনে সন্দেহ হইল। ব্যাপারটি কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন

রজস্বলা হওয়াই ফুল শুকাইবার কারণ। এই পরীক্ষা **Belgium, Switzerland, Germany**-তেও হইয়াছে। সেখানেও এই ঘটনা দেখা গিয়েছে। আরও দেখা গিয়াছে রজস্বলা স্ত্রীলোক ঘাঁটাঘাঁটি করিলে পাঁউরুটি ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠে না। **The dough does not rise.** এই সকল বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন—**The sweat and the secretions of the manstruating woman are toxins to minute life.** রজস্বলা স্ত্রীলোকের স্পর্শ খুব ছোট প্রাণীর পক্ষে বিষময় ফল প্রদান করে। দেখুন, যাঁহারা এদেশে স্থির করিয়াছিলেন যে রজস্বলা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না, তাঁহারা কি অসাধারণ পাণ্ডিত্যমণ্ডিত ছিলেন! এখনও তাঁহাদের কাছে আমরা পৌঁছিতে পারি নাই।"

এই সব সামাজিক মঙ্গল-বিধানগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছিল, সেই রহস্য বা কারণ আমরা এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছি, তাই বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া সেই সব বিধানের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। ঋষিরা বহু পূর্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আজ বৈজ্ঞানিক experiment-এ ধরা পড়িতেছে।

সুস্থ-সবল, বলিষ্ঠ-সন্তানের জনক-জননী হইতে হইলে মাতাপিতাকে সর্বাগ্রে সদাচারী হইতে হইবে। পিতামাতার প্রভাব সন্তানের ভাবী জীবন-গঠনের পক্ষে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে। পুত্রের জন্য জনক-জননী সবই ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু ত্যাগের ভাব গর্ভ-সঞ্চারের পূর্বেই আসা প্রয়োজন। সৃষ্টির পূর্বেই আরও বেশী দায়িত্ব। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পিতামাতা যেরূপ চিন্তা করেন, যে ভাবনায় অধিকাংশ সময় ভাবিত থাকেন, অলক্ষ্যে তাহার প্রভাব সন্তানের উপর পতিত হয়। এইজন্যই সেই অবস্থায় সদাচার পালন, ভাগবত-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহন, ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান বিশেষ মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"সুস্থ সবল প্রাণবন্ত জাতি গঠন করিতে হইলে—সর্বাগ্রে চাই ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা।" এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে কে? আজ যাঁহারা মাতা হইয়াছেন, কিছুকাল পূর্বে তাঁহারাই কুমারী ছিলেন, তারপর যুবতী হইয়াছিলেন। মাতা হওয়ার পরও যেমন ব্রহ্মচর্য্যপালনের বিধান শাস্ত্রে আছে, তেমনি কুমারী-যুবতী অবস্থায়ও ব্রহ্মচর্য্যপালনের বিধান আছে। মা হওয়ার উপযুক্ততা অর্জনের নামই—ব্রহ্মচর্য্যপালন।

সমাজের কুমার-কুমারী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যপালনের ভাব বিশেষ করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের দেহ-মন যদি সুগঠিত না হয়, তবে সমাজে আদর্শ জনক-জননীর উদ্ভব হইবে কোথা হইতে? আচারের স্থলে অনাচার, ব্রহ্মচর্য্যের স্থলে উচ্ছৃঙ্খলতা, সংযমের স্থলে যদি অসংযমের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে কি করিয়া সমাজে আমরা আদর্শ গৃহীদের পাইব? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন মুখের কথা নহে। ইহা একটি পুণ্যব্রতবিশেষ। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ব্রত-পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৃহীদের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। সমাজের নর-নারীর চিত্ত যখন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, তখনই শাস্ত্রের বিধি-লঙ্ঘনের কু-প্রবৃত্তি দেখা দেয়। সাধারণতঃ ভোগপ্রবণ চিত্ত যাঁহাদের, তাঁহারা নিয়ম-সংযমের নাম শুনিলেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। প্রবৃত্তিস্রোতে বাধা পাইলেই ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়। তখন আর হিতাহিত বিবেচনাবোধ থাকে না। মনুসংহিতাতে আছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ২।২১৫

—"মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান্ যে, তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত

আকর্ষণ করিয়া থাকে।" মনুর এই বচন শুনিয়া তাঁহার এই উক্তিকে অসম্ভব বলিয়াই অনেকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে পুনঃ মনু-বচনের প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলে। নারী-পুরুষ এই ভেদজ্ঞান থাকা পর্যন্ত, ভোগ্য-ভোক্তার সংস্কারপ্রবলতাহেতু, অবাধ সম্মিশ্রণ কোন কালেই মঙ্গলের হেতু হয় না। ব্রহ্মচর্য্য এবং ত্যাগ-সংযমের শিক্ষায় যাহাদের জীবন গঠিত হয় নাই, তাহারা কি করিয়া নারী-জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? মা বলিয়া ডাকিলেই ত আর জাতিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় না অর্থাৎ মা-ও যে স্ত্রীজাতি এই জ্ঞান কি লুপ্ত হইয়া যায়? এই কামের প্রভাব এতই প্রবল যে, স্বয়ং ব্রহ্মা পযন্ত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া স্বীয় কন্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। কাজেই ইন্দ্রিয়সংযমবিষয়ে সাবধানতার শেষ নাই।

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্॥ ২।২১৪

—"সংসারে দেহধর্মবশতঃ সকলেই কাম-ক্রোধের বশীভূত। তাহাতে অবিদ্বান্ হউন আর বিদ্বান্ই হউন, কামিনীগণ অনায়াসে তাঁহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতে সমর্থ হয়।"

এই সব শাস্ত্রবচন পাঠ করিলে দুরন্ত কামের প্রভাব কত, তাহা অনায়াসেই ধারণায় আসে। অথচ বর্তমান সমাজ এই সব শাস্ত্রের অনুশাসন জানিয়াও আচরণসম্পর্কে কোন সতর্কতা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ক্রমবর্দ্ধমান হইয়াই চলিয়াছে। মনুসংহিতাতে আছে, আচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি। যে ভাবে অনাচারের স্রোত প্রবাহিত, তাহাতে আর ধর্ম থাকিবে কি করিয়া?

অনাচারে কোনও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না, উন্নতি হয় সদাচারে। সমাজের নর-নারীর আর আচারের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই। তাহারা এখন ইচ্ছামত অনাচারের বশবর্ত্তিনী।

মনু বলিয়াছেন—

নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপি স্ত্রিয়মার্ত্তবদর্শনে।
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ॥
রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুবায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে॥
তাং বিবর্জ্জয়তস্তস্য রজসা সমভিপ্লুতাম্।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে॥
নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা নচাসীনাং যথাসুখম্॥
নাঞ্জয়ন্তীং স্বকে নেত্রে নচাভ্যক্তামনাবৃতাম্।
ন পশ্যেৎ প্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ॥

—মনুসংহিতা ৪।৪০-৪৪

"কামোন্মত্ত হইলেও রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে স্ত্রীগমন করিবে না, অথবা তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। যে পুরুষ রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে, তাহার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষু ও আয়ু—এই সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। যে লোক রজস্বলা স্ত্রীকে ব্যবহার না করে, তাহার বুদ্ধি, বীর্য্য, বল, চক্ষু ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ভার্য্যার সহিত একত্রে ভোজন করিবে না; ভোজন করিতেছে, এমন সময় ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না; হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসংযতভাবে বসিয়া আছে—এমন সময়েও ভার্য্যাকে দেখিবে না। নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈল-ম্রক্ষণ করিতেছে, অথবা সন্তান

প্রসব করিতেছে, এমন সময়ে তেজস্কামী ব্রাহ্মণ ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না।"

শাস্ত্রের উপরোক্ত নিষেধ-বিধিগুলি আজ সমাজে প্রতিপালিত হইতেছে কি ? ঋষিগণ সমাজের মঙ্গলেব জন্যই এই বিধিগুলির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে অন্য কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। যাঁহারা এখনও কোন শাস্ত্র-শাসন মানিয়া চলেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ধর্মে মতি হয়, সন্তান-সন্ততিও দীর্ঘায়ু এবং বলিষ্ঠ হয়। অনাচারের জন্য যে প্রজ্ঞা, তেজ, বল, আয়ু ও চক্ষুর শক্তি কমিয়া যাইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট। কামোন্মত্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষা এই যে, একটি মুহূর্ত্তেও যেন ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত না হইতে হয়, কিন্তু এই লোভে পরিণাম কি দাঁড়ায়, তাহা কি আব বলিযা দিতে হইবে ?

ঋষিপ্রণীত মঙ্গল-বিধানগুলি, এখন কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত। এই উপেক্ষার ফলে, শক্তিহীন ও বীয্যহীন হইতেছে কে ? রোগযাতনা ভোগ করিতেছে কে ? কুপথ্যসেবনে কি কোনদিন রোগ আরোগ্য হয় ? ঋষিরা সমাজেব মঙ্গলেব জন্য যে সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এখন্ তাহা অনাদৃত। ভারতেব সমাজ এখন পরিচালিত হইতেছে বানরের মত চঞ্চল মনোবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের নির্দেশে—অর্থাৎ জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে ভোগই যাহাদের ইষ্টমন্ত্র বা জপমালা। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া কি আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন কোনদিন সম্ভব ?

আধুনিকদের মতে শাস্ত্রের নির্দেশগুলি হৃদয়হীনতার, নিষ্ঠুর চিত্তের পরিচায়ক। দিবসত্রয়ের নিষেধ কেন, ঋষিরা যদি বলিতেন, চটক পক্ষীর মত প্রতিমুহূর্তে রমণ-ক্রিয়া চলিতে পারিবে, তাহা হইলেই তাঁহারা দরদী হইতেন। কি শোচনীয় অধঃপতনই না আসিয়াছে। এখন আর পুরাতন সংহিতার বিধান চলিবে না, নিত্যনূতন নববিধানের সৃষ্টি

হইবে। কলির সমস্ত লক্ষণ একে একে সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই দুর্দিনেও শ্রীশ্রীঠাকুর আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষগণ বুকভরা আশা লইয়া 'সমাজের এই দুর্দিন থাকিবে না' এই ভরসা-বাণীই আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গল-নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়া, গৃহস্থদের মধ্যে কি স্রোতের বিরুদ্ধে সঙ্কল্পশক্তি লইয়া দণ্ডায়মান হইবার প্রেরণা কাহারও প্রাণে জাগিবে না? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন কি একটা অসম্ভব কথা? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি পালন করা কি বিশিষ্ট ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? বিরল হইলেও, সদাচারসম্পন্ন গৃহস্থ কি সমাজে মোটেই নাই? তাঁহাদের নিষ্ঠা এবং সদাচারপালনই তো মঙ্গল-যুগকে আকর্ষণ করিয়া সম্মুখবর্তী করিবে।

একটি নিয়ম-পালনে শৈথিল্য দেখা দিলে, ক্রমশঃই সকল ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রবেশ করে। সদাচারপালনবিষয়ে কোন সময়েই শৈথিল্য প্রকাশ করা উচিত নহে। মুখে আদর্শ গৃহস্থ-জীবনের জয়গান আর আচরণে তদ্বিপরীত হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের মর্য্যাদা থাকিল কৈ? আদর্শ গৃহীর নিয়ম-সংযম-সদাচার হইবে নিত্যসাথী। তাঁহারাও যদি সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ ধরিয়া চলেন, তবে আর আদর্শ গৃহী হইবেন কেমন করিয়া? সদ্‌গুরুর অভয়বাণীতে গর্বিত হইয়া, পরকাল-পরলোকের আর কোন চিন্তা নাই বলিয়া যদি তাঁহারা কদাচারী হইয়া উঠেন, তবে সত্যই কি তাঁহারা শ্রীগুরুর প্রিয়ভাজন হইতে পারিবেন? ঋষি-মুনিপ্রদর্শিত সদাচারের পথই যে আদর্শ গৃহীর বরণীয়!

পূর্বে সমাজে পতি মৃত হইলে, কোন কোন পুণ্যশীলা আদর্শ নারী স্বামীবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া পতির সঙ্গেই স্বেচ্ছায় সহমরণ-প্রথা অবলম্বন করিতেন। নতুবা পতির মৃত্যুর পর তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন

করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। শাস্ত্রানুশাসনের প্রতি তাঁহাদের কোন অভিযোগ ছিল না। এই সংস্কার তাঁহাদের চিত্তে প্রবল ছিল যে, শাস্ত্রের নির্দেশ—মঙ্গলের জন্যই, অমঙ্গলের জন্য নহে। পরকাল-পরলোক, সতীত্ব রক্ষা, সংযম-তপস্যা, সদাচারপালন প্রভৃতির প্রতি সমাজের তখন অটুট বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের খুঁটিকে নড়চড় করিয়া দেওয়াই হইল বর্তমান সমাজ-কর্ণধারদের একমাত্র কর্তব্য। শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যাঁহারা চলেন, তাঁহারা হইলেন অন্ধবিশ্বাসী। আর যাঁহারা স্বেচ্ছাচারী, তাঁহারা হইলেন স্বাধীন চিন্তানায়ক।

স্ত্রীলোকসম্পর্কে যে সব হিতকারী বিধি রহিয়াছে, আজ অনেকেই শাস্ত্র পড়িয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক নহেন। সংস্কৃতি বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন, জানি না। যাহা হউক, মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের কতকগুলি বচন, নিম্নে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ-কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥ ১৪৭
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥ ১৪৮
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৫৫
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বীস্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥ ১৫৬
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপিগৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ ১৫৭
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥ ১৫৮

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥ ১৫৯
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৬০
অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ ১৬১
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ১৬২
পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতিচোচ্যতে॥ ১৬৩
ব্যভিচারাৎ তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥ ১৬৪
পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতিচোচ্যতে॥ ১৬৫
অনেন নারীবৃত্তেন মনোবাগ্দেহসংযতা।
ইহাগ্র্যাং কীর্ত্তিমাপ্নোতিপতিলোকং পরত্র চ॥ ১৬৬

—"স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহে থাকিয়াও স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎমাত্র কার্য্যও স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয়। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে—কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না। স্ত্রীলোকসম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই—কেবল পতিসেবাদ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বী-স্ত্রী পতি-লোকগামী হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মৃত

হইলে স্ত্রী বরং শুভ পুষ্প-মূল-ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখনও পতিবিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। যত দিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মাচারী হইয়া মধু-মাংস-মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, একমাত্র পতি-পরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অনুত্তম পরমধর্ম, তৎপালনেই একাগ্র হইবেন। অনেক সহস্র কৌমার-ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ, সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যবলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করেন। যে স্ত্রীলোক সন্তান হইবার লোভে স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হয়, সে ইহলোকে নিন্দাগ্রস্ত ও পরত্র পতিলোক হইতে চ্যুত হয়। স্বামীব্যতিরিক্ত অপর পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন ধর্মকার্য্য হইতে পারে না অথবা সহধর্মিণীব্যতিরিক্ত অপরের স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানদ্বারা পুরুষেরও কোন কার্য্য নাই—শাস্ত্রকারেরা এরূপ জাত পুত্রকে পুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। কোন শাস্ত্রেই সাধ্বীগণের দ্বিতীয় ভর্তা গ্রহণের উপদেশ নাই। নিজের পতি অপকৃষ্ট অর্থাৎ ধন-মান-কুল-শীলাদিতে হীন বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, সে ইহলোকেই নিন্দনীয় হয়—লোকে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলিয়া থাকে। পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধুজনেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনোবাক্দেহসংযতা

হইয়া নারীধর্মে জীবনযাপন করেন, তিনি ইহলোকে পরমা কীর্তি লাভ করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন।"

সতী-সাধ্বী নারী পতিলোকের জন্যই যতদিন না দেহপাত হয়, অপেক্ষা করেন। সতী-নারীর বিশ্বাস, দেহান্তে গিয়া পতিলোকে পতির সহিতই তাঁহার পুনর্মিলন হইবে। সুতরাং পত্যন্তরগ্রহণের জন্য সতী-নারীর প্রাণে কোন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না। স্বামী-বিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া, তপস্যার জীবনই সানন্দে তাঁহারা অতিবাহিত করেন; সুতরাং তাঁহাদের ভিতর ভোগাকাঙ্ক্ষা আর জাগিয়া উঠিবে কেমন করিয়া? আত্মসুখ সতীনারীর জীবনের কাম্য নহে। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভোগস্পৃহারও হয় অন্তর্ধান।

বর্ত্তমানে ছোটবেলা হইতেই ভোগমূলক শিক্ষা পাইয়া নর নারী সুযোগ পাইলেই সংযম-ব্রত জলাঞ্জলি দিয়া বসে। পরকাল-পরলোক-বিশ্বাস যখন নাই, তখন আর পাপানুষ্ঠানেই বা ভয় কি? অবাধে তাহারা ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলে। এইরূপ সমাজকে সত্যই কি আদর্শ সমাজ বলা বলে? ভারতবর্ষের শিক্ষাই ছিল ত্যাগমূলক, উচ্চাদর্শের জন্য তপস্বীর জীবনযাপনে তাহাদের দৈহিক, মানসিক কোন কষ্ট হইত না। ত্যাগের ব্রত প্রত্যেক নর-নারী স্বেচ্ছায়ই গ্রহণ করিতেন, তাহা বাধ্যতামূলক ছিল না।

যুবক-যুবতীর একসঙ্গে বসিয়া নিরালায় আলাপ, ভোজন প্রভৃতি কোনরূপেই কল্যাণপ্রদ নহে। বেশী ঘনিষ্ঠতায়, পরিণামে বিকারগ্রস্ত হইয়া শেষে আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া নারকীয় কর্মে তাহারা প্রবৃত্ত হয়। এইজন্যই শাস্ত্রের এত কঠোর অনুশাসন-বাণী। শাস্ত্রেই আছে –

আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাৎ যানাৎ পাপং সঙ্করতে নৃণাম্ ॥

আর একটি বড় অনাচারের কথা না বলিয়া পারিলাম না। ঘরে-ঘরে আজকাল কুমারী-যুবতী মেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা হয়। যুবতীরা যে মনোবৃত্তি লইয়া গঠিত, যুবকরাও সেই ভাবেই গঠিত। নিশ্চিন্তমনে অভিভাবকগণ বয়স্থা মেয়েদের অসংযত যুবকদের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন। তার ফল অল্প কিছুদিন পরেই প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ হইয়া যায়। প্রায়ই শুনা যায়, কুমারী এবং যুবতী মেয়েরা উধাও হইয়া গিয়াছে। শিক্ষকও উধাও, ছাত্রীও উধাও। এইরূপ ব্যভিচারী শিক্ষায় যাহাদের জীবন গঠিত, তাহাদের দ্বারা আদর্শ, পবিত্র গৃহস্থ-জীবন যাপন কি সম্ভব? পতন অনিবার্য জানিয়াও অভিভাবকগণ যেন স্বেচ্ছায়ই তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে ঠেলিয়া দেন। এই সব খুঁটিনাটি ছোট ছোট সমস্যা বা বিষয়ের অন্ত নাই। কি ভাবে সমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে চলিয়াছে, এই সব দৃশ্য দেখিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

সমাজের এইসব দুরবস্থা দেখিয়াই, শ্রীশ্রীঠাকুর আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ-গঠনে জাতিকে ঋষিপ্রদর্শিত পন্থায় চলিতে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। সমাজ যতদিন পর্যন্ত ঋষিদের কল্যাণপন্থা অনুসরণ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ গড়িয়া উঠা অসম্ভব। অন্যায়কে, ব্যভিচারকে, অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়া আদর্শ সমাজ-গঠনের কল্পনা—আকাশ-কুসুমের মতই মিথ্যা। এইজন্যই চাই একদল আদর্শনিষ্ঠ সঙ্কল্প-ব্রতধারী যুবক এবং ব্রতধারিণী কুমারী ও যুবতী। তাঁহারাই হইবেন নূতন-যুগের স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকর্ত্রী। কত জীবনই তো বিসর্জিত হইয়াছে, একটা জনম না হয় পবিত্র আদর্শ রক্ষায় জন্যই

উৎসর্গিত হইল! শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীয় জীবনে এবং পরিবারে মহান্ আদর্শ রূপ দেওয়ার চেষ্টা জাগ্রত হউক। আদর্শ গৃহস্থ-গঠনে আপ্রাণ চেষ্টাটুকু জাগিয়া উঠিলে, সাহায্যকারিরূপে শ্রীগুরু-ভগবানের আশীর্ব্বাদকেও তাঁহারা পাইবেন। জীবনে সংযমের ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে—সৎসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গের ফলেই মানুষের ভিতর সু-কু প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। শৈশবাবস্থা হইতেই সৎশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার জন্য পিতামাতার দায়িত্ব সর্ব্বাগ্রে। তাঁহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষাই যে সন্তানকে অশিষ্ট দুষ্ট করিয়া তুলে, সে কথা কি তাঁহারা একবার ভাবেন? সমাজের মঙ্গলচিন্তা করিয়াই তাঁহাদের চরিত্রে সংযম এবং আচরণে সদাচার ফুটিয়া উঠা আবশ্যক। ঋষিবাক্যলঙ্ঘনের আসুরিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তানায়ক সাজিয়া নিত্যনূতন সমাজবিধান সৃষ্টি করিলে, তাহাতে সমাজের হিত অপেক্ষা অহিতই হইবে বেশী। মনে রাখিতে হইবে, শাস্ত্রের বিধিগুলি বহু চিন্তা এবং মঙ্গলদৃষ্টি লইয়াই বিরচিত।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী, মহাজনদের বাণী এবং শাস্ত্রবাণীর আলোচনা যথেষ্ট করা হইল। সমাজে ভগবদিচ্ছায় আবার সৎ-ভাব, সৎ-আদর্শের স্ফুরণ হইবেই। আমরা এই দুর্দিনে জাতির কল্যাণমার্গ কি, তাহা সুস্পষ্টরূপে কীর্তন করিলাম। ভগবদিচ্ছায় সমাজে আবার যথার্থ মানুষের সৃষ্টি হউক। আসুরিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। ভারত যে সংস্কৃতির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ দুর্দিনে সেই দেবসংস্কৃতিসংগঠক ঋষিসমাজকেই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। দেবতারা আবার গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করুন, সমাজে আবার আধ্যাত্মিকতার সুপ্রতিষ্ঠা হউক। ঋষিপ্রদর্শিত কল্যাণ-পথ অনুসরণ করিয়া,

সমগ্র পৃথিবীতে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হউক। সমাজের প্রতিটি নর-নারীর প্রাণে পবিত্র ত্যাগ-সংযম ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনের দৈবী প্রেরণা জাগিয়া উঠুক। যে ভারত সমগ্র জগতের গুরু, সেই ভারত যেন সর্ব্বাবস্থায় তাহার লক্ষ্য এবং আদর্শকে ঠিক রাখিয়া চলে। এই দুর্দিনে আদর্শ নিষ্ঠাই সমগ্র জাতিকে পরিত্রাণের পথ দেখাইবে।

———

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা, আহারসংযম এবং সদাচারপালনেই সমাজে সুস্থ সবল আদর্শ গৃহীর উদ্ভব হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীগুরুতে লিখিয়াছেন— "বীর্য্যই ব্রহ্মতেজ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার অভাব হইলে মানুষের সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।" পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ত্যাগ, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে যৌগিক ব্যায়ামের সহায়তা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যৌগিক ব্যায়ামের উপকারিতা অসাধারণ। এই ব্যায়ামপদ্ধতি শুধু পুরুষদের জন্যই রচিত হয় নাই। সমাজের প্রত্যেক নর-নারী এই ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া দীর্ঘজীবন এবং অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্যরক্ষাসম্পর্কে বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে ক্রিয়াযোগ অবলম্বনেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে আসন-মুদ্রার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। ভারতের তপোবনে ঋষিগণ ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা বিষয়ে যেমন মৌখিক উপদেশ প্রদান করিতেন তেমনি যৌগিক প্রক্রিয়াসাহায্যে কি ভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায়, তাহার স্থূল-প্রক্রিয়াদির কৌশলও শিক্ষা দিতেন। দেহকে সুস্থ সবল, নীরোগ এবং কর্মঠ রাখিতে হইলে, প্রত্যেক গৃহীকে যোগব্যায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। অটুট স্বাস্থ্য এবং সুদৃঢ় দেহ না হইলে আদর্শ গৃহী হওয়া সম্ভবপর নহে। আদর্শ গৃহীকে অনেক দায়-দায়িত্বই বহন করিতে হয়, সুতরাং দুর্বলদেহে সেই কর্তব্যপালন সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

আধ্যাত্মিকতা ত পরের কথা, ভোগের সংসারে আমরণ ভোগ করিতে হইলেও যোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে। যৌগিক ব্যায়াম শুধু গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্যই রচিত হয় নাই, আদর্শ গৃহী হইতে হইলেও—আসনমুদ্রাগুলির অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। সুস্থদেহে সুখভোগ কোন্ নর-নারীর কাম্য নহে? যৌগিক ব্যায়াম মানুষকে সুস্থ সবল দেহে ভোগসামর্থ্যই প্রদান করে। এইজন্যই আদর্শ গৃহস্থ-পরিবারে নিয়মিত যৌগিক ব্যায়াম প্রচলন অপরিহার্য্য কর্তব্য। পূর্বে যৌগিক ব্যায়াম সর্বসাধারণই অভ্যাস করিত, কিন্তু অনুশীলন-চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃ তাহা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী-বিরাগীর গুপ্ত সম্পদে পরিণত হইয়াছে। পরম আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রকর্ণধারগণেরও এই দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং জওহরলাল নেহরু এই আসন-প্রাণায়ামসম্পর্কে মূল্যবান্ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। "The discovery of India" তে তিনি লিখিয়াছেন—

"There are a large number of these asanas. For many years now I have practised a few simple selected ones, whenever I have had the chance, and I have no doubt that I have profited greatly by them, living as I often did in environments unfavourable to the mind and body. These and some breathing exercises are the extent of my practice of the physical exercises of the Joga System."

—"আসনের সংখ্যা অনেক। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি নিজে কয়েকটি বাছা বাছা সহজ আসন যখনই সুযোগ পেয়েছি অভ্যাস করেছি, আর আমার কোন সন্দেহই নেই যে উপকার পেয়েছি—

মনে রাখতে হবে যে, আমাকে অনেক সময় আমার মন ও দেহের পক্ষে অনুপযোগী পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এই আসনগুলি এবং কয়েকটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাস পর্যন্তই আমার এ বিষয়ে দৌড়।"

২৫শে আগষ্ট (১৯৬৫ ইং) নয়া দিল্লীর এক অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু দীর্ঘদিন বাঁচিবার এবং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য দেশের যুবকদের সহজ যোগব্যায়াম করিতে উপদেশ দেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি 'শীর্ষাসন' করিয়া আসিতেছেন। ইহা তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, তিনি 'ডন-বৈঠকে'র বিরোধী নহেন, কিন্তু যোগব্যায়ামে শরীর ও মনকে যে ভাবে সজীব করিয়া তোলে, ভারী ধরণের ব্যায়ামে তাহা সম্ভব নহে। তিনি বলেন, স্কুল ও কলেজগুলিতে যোগব্যায়াম প্রবর্তিত হইলে ভাল হয়।

আদর্শ সংসারী হইতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি সকলেরই পালন করা কর্তব্য। কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী, স্বাস্থ্য সকলের নিকটই অমূল্য সম্পদ্। শরীর ভাল না থাকিলে, যোগ-যাগ-তপস্যা কোন কিছুই ঠিকভাবে করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। আদর্শ গৃহীর কর্তব্যের অন্ত নাই। সেই কর্তব্যপালনে সুস্থশরীরই একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি জানিয়া, তাহা পালন করিয়া চলা প্রত্যেক গৃহস্থেরই একান্ত কর্তব্য।

যৌগিক ব্যায়ামদ্বারা কেবল যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহাই নহে; যোগবলে রোগও আরোগ্য করা যায়। সাধারণ আসন-মুদ্রা-প্রাণায়াম শরীরের কোন্ অঙ্গের উপর কিরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, কোন্ ভঙ্গিতে বসিলে কোন্ রোগ সারে, তাহার কথা যৌগিক ব্যায়াম-পদ্ধতিতে উল্লিখিত আছে। যে কোন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ যোগ-ব্যায়াম

অভ্যাসদ্বারা রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন। আজকাল ঘরে ঘরে দুর্বল ভগ্নস্বাস্থ্য নর-নারীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে স্ত্রী-ব্যাধির যেমন প্রসার দেখা যায়, পূর্বে তেমন ছিল না। তাহার কারণ স্বাস্থ্যবিধিপালনে তখন নারীরা অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। নিয়মিত এবং নির্দ্ধারিত যৌগিক ব্যায়াম করিলে বিবাহিত জীবনেও তাহার সুফল লাভ করিতে পাবা যায়। যৌগিক ব্যায়ামের ফলে দেহ নীরোগ, বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ হইয়া থাকে। যৌগিক ব্যায়ামদ্বারা মস্তিষ্ক পরিচালনার ক্ষমতাও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

সমাজের নর-নারীর দেহ যদি সুস্থ-সবল না হয়, তবে তাহাদেব সন্তান-সন্ততির দেহই বা কি করিয়া সুস্থ-সবল হইবে? সুস্থ পিতা-মাতার ঘরেই সুস্থ সবল সন্তানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন বলিতে সুস্থ-সবল দাম্পত্য জীবনকেই বুঝায়। সংসার করিয়াও একটু ইচ্ছা থাকিলেই সহজ-সরল আসন মুদ্রা-প্রাণায়ামগুলি সকলেই অভ্যাস করিতে পারেন। যৌগিক ব্যায়াম সম্পর্কে বর্তমানে অনেক পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'যোগীগুরু' ও 'ব্রহ্মচর্য্যসাধন' গ্রন্থে আসন-মুদ্রা-প্রাণায়াম সম্পর্কে প্রাঞ্জল বিবৃতি আছে। ইহা ছাড়া আয়রণম্যান শ্রীনীরদকুমার সরকার-প্রণীত 'সরল যোগ-ব্যায়াম' এবং স্বামী জগদীশ্বরানন্দলিখিত "সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই সব পুস্তকে বর্ণিত আসন-মুদ্রাগুলি একটু চেষ্টা-উদ্যম থাকিলে সকলেই করিতে পারেন। বিবাহিত জীবনেও আহারে-বিহারে সাধারণ সংযম পালন করিয়া চলিলে, যৌগিক-ব্যায়াম অভ্যাসদ্বারা প্রত্যেক দম্পতিই সুস্থ-সবল-দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন। যৌগিক ব্যায়াম এমন কিছু

আড়ম্বরপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান নহে। যোগ-ব্যায়াম গৃহী এবং সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই সম-উপকারী। তবে আসন-মুদ্রাদি দৈহিক অবস্থা বুঝিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দপ্রণীত "সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম" গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে—"বর্ত্তমান যুগে নর-নারীগণকে জীবিকা উপার্জ্জন উপলক্ষ্যে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বসিয়া কাটাইতে হয়। এইজন্য তাঁহাদের মেদবৃদ্ধি ও উদর বৃহৎ হয় এবং তাঁহাদেব হৃৎপিণ্ডও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই মেদবৃদ্ধি বন্ধ করিতে যৌগিক ব্যায়াম অমোঘ। গলদেশে যে-সকল এণ্ডক্রীন গ্রন্থি আছে, সেইগুলি অপরিমিত আচার ও আহারে, অধিক পরিশ্রমে, ব্যাভিচারে বা কঠিন রোগে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তখন এই সকল গ্রন্থি হইতে রস নির্গমন হ্রাস হয় এবং তজ্জন্য জরা আসে। দেহে টক্‌সিন্ (Toxin) নামক যে বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত গ্রন্থিজাত রসের দ্বারা অচিরে বিনষ্ট হয়। এই রস আবশ্যকীয় পরিমাণে নির্গত হইলে শরীর সবল ও সুস্থ থাকে। সর্ব্বাঙ্গাসন এণ্ডক্রীন গ্রন্থিসমূহকে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ। অন্য কোন ব্যায়ামের দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। যৌগিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য—স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধন। স্নায়ুমণ্ডলী দেহযন্ত্রকে চালিত করে এবং মস্তিষ্ক হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আদেশ বহন করে। ইহাদের দ্বারাই মাংসপেশীর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। যৌগিক ব্যায়ামের ন্যায় অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম স্নায়ুমণ্ডলীকে পুষ্ট করিতে পারে না। স্নায়ুজাল সবল ও সুস্থ থাকিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। মস্তিষ্কই আমাদের সকল চিন্তা ও কার্য্যের কেন্দ্র। মস্তিষ্ক সুস্থ রাখিবার উপায় কোন ব্যায়াম-পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; কিন্তু যৌগিক ব্যায়ামের শীর্ষাসন মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তপ্রবাহ আনিয়া উক্ত কার্য্য অনায়াসে সাধন করে। যাঁহারা

মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে যৌগিক ব্যায়ামই বিশেষ উপযোগী। নিয়মিতভাবে কিছুকাল যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করিলে মস্তিষ্কের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়, স্নায়ু সবল ও মাংসপেশী সতেজ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, বহুমূত্র, অর্শ, অজীর্ণ, শুক্রতাবল্য প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ সারিয়া যায়।"

যৌগিক ব্যায়াম দেহকে শুধু সুস্থই রাখে না, রোগ-জীবাণুর আক্রমণকেও প্রতিহত করিতে পারে। যৌগিক ব্যায়াম করিবার সময় আহার-বিহার সম্পর্কে বিশেষ সাবধান সতর্ক হইতে হইবে। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীগণ ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। অবশ্য আসন-মুদ্রা বীর্যধারণসম্পর্কে যথেষ্ট সহায়তা করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসংযম না থাকিলে বীর্যধারণ অসম্ভব। যথাসময়ে পরিমিত ভোজন, অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, মাসে ২।১ দিন উপবাস—এই সব সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে এবং রাত্রে শুইবার পূর্বে এক গ্লাস করিয়া ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল সেবন প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহাতে কোষ্ঠপরিষ্কার হয়। ভুঁড়ি আর মুড়ি ঠিক থাকিলে কোনও রোগই আক্রমণ করিতে পারে না।

আসন-মুদ্রার সঙ্গে ভাবের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। দুশ্চিন্তার সময় আপনি গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। **শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে বিভিন্ন ভাবের সম্পর্ক রহিয়াছে।** নিয়মিতভাবে আসন-মুদ্রা করিলেই তাহা বেশ ধরিতে পারা যায়। মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া ভ্রূমধ্যে কিংবা নাসিকায় দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে মনে আপনি দিব্যভাব আসে। অবশ্য আসন-মুদ্রাগুলি ছোটবেলা হইতেই অভ্যাস করা উচিত। যাঁহারা করেন

নাই, তাঁহারাও যে কোন বয়সে আসন-মুদ্রা অভ্যাস করিলে তাহাতে অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। দাম্পত্যজীবনেও সহজ সরল আসন-মুদ্রা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শরীরে যে সব রোগজীবাণু জন্মে, আসন-মুদ্রা দ্বারা তাহাদিগকে বিদূরিত করিতে পারা যায়। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্বপ্নদোষ, যে কোন স্ত্রীব্যাধি এবং মাথাধরা প্রভৃতি রোগ একমাত্র আসন অভ্যাসদ্বারাই স্বাভাবিকভাবে আরোগ্য হয়। আসন-অভ্যাসের ফলে মেয়েদের দেহ সুস্থ, সুশ্রী এবং লাবণ্যযুক্ত হয়। **সকালে মলমূত্র ত্যাগের পর আসন করার বিধি।** পেটে মল লইয়া, মুখ না ধুইয়া আসন করা কখনই উচিত নহে। রজস্বলা অবস্থায় মেয়েদের অন্ততঃ ৪ দিন আসন-মুদ্রা অভ্যাস বন্ধ রাখিতে হইবে। গৃহীদের পক্ষে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, বীরাসন, শীর্ষাসন এবং সর্বাঙ্গাসন এই কয়টি করিলেই যথেষ্ট। মুদ্রার মধ্যে—মহামুদ্রা এবং যোনিমুদ্রা এই দুইটির অভ্যাসে প্রভূত উপকার হইতে পারে। উচ্চাঙ্গের প্রাণায়াম করিতে না পারিলেও গৃহস্থদের পক্ষে শীতলীকুম্ভকটি খুব উপকারী। একমাত্র শীতলীকুম্ভক করিতে পারিলে, আর অন্য ধরণের প্রাণায়াম না করিলেও চলে। ঠোঁট দুইটি পাখীর ঠোঁটের মত সরু করিয়া ধীরে ধীরে জিহ্বার দ্বারা একটানা যতদূর পারা যায় নির্মল বায়ু টানিতে হইবে। বায়ু-টানা শেষ হইলে, ঢোক গিলিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত পারা যায় কুম্ভক করিয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর আস্তে আস্তে নাক দিয়া বায়ু ছাড়িয়া দিতে হইবে। নাভিকন্দধ্যানের সহিত শীতলীকুম্ভক করিতে পারিলে যে কোন প্রকার পেটের অসুখ সারিয়া যায় এবং হজমশক্তিও বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রণীত 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে' লিখিয়াছেন—"মুদ্রা শারীরিক ব্যায়ামের অনুরূপ। মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা শুক্রধাতুকে সম্যক্

সন্ন্যাসীদের জন্য যে প্রক্রিয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, তাহার সবগুলি গৃহীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে ; কিন্তু সহজসাধ্য কতকগুলি যৌগিক ব্যায়াম গৃহীদের পক্ষেও একান্ত উপকারী। সংযম মানুষমাত্রের পক্ষেই প্রয়োজনীয় এবং উপকারী—এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে।

আজকাল বাজারে যে-সব মুদ্রিত গ্রন্থ প্রচারিত আছে, তাহার মধ্যে আসন-মুদ্রাসম্পর্কে যে-সব ছবি আছে, ইচ্ছা করিলে সেই সব ছবি দেখিয়াও অনায়াসে যৌগিক ব্যায়ামের অনুষ্ঠান করা যায়। আর অভিজ্ঞ শিক্ষক পাইলে ত কথাই নাই। সাংসারিক কঠোর পরিশ্রমের পব দেবগৃহে আসনে বসিয়া ধ্যান-ধারণা করার একটা বিশেষ সুফল আছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৌগিক ব্যায়ামের প্রচলন প্রতি গৃহস্থ-পরিবারেই আমরা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

যৌগিক ব্যায়ামের অর্থাৎ আসন-মুদ্রার নিখুঁত কৌশল বা পদ্ধতি অনুধাবন করিয়া, পাশ্চাত্যদেশবাসী অনেকেই আসন-মুদ্রা শিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন এবং অনেকে ভারতবাসীদের নিকট হইতে এই সব উন্নত ধরণের প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া অভ্যাস করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদেরই দেশের যৌগিক-ব্যায়াম অনুশীলন করিয়া বিদেশীরা লাভবান হইতেছেন, আর আমাদের দেশের লোকের এদিকে এখনও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি পড়ে নাই। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়িলে, যৌগিক-ব্যায়ামের প্রতিও আগ্রহ জাগিয়া উঠিবে।

অনেকের ধারণা, সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর, আবার আসন-মুদ্রার অভ্যাস করিয়া কি লাভ? তাঁহারা জানেন না যে, এইরূপ আসনও আছে, যাহাতে শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম-সুখও দেওয়া যায়।

এই আসনটির নাম—**শবাসন**। শরীরকে ব্যায়ামান্তে বিশ্রাম দেওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক যৌগিক ব্যায়ামে কতকগুলি মাংসপেশীর সংকোচন এবং আর কতকগুলির বিকোচন হয়। একমাত্র শবাসন দ্বারাই এক সঙ্গে সকল মাংসপেশীর পূর্ণ বিশ্রাম হয়। শবাসনে শবের মতই নিস্পন্দ হইয়া বিশ্রাম করিতে হয়। সকল যৌগিক ব্যায়ামের অন্তেই শবাসন করিতে হয়। ইহার পর আর কোন ব্যায়াম করিতে নাই। এই সুখসাধ্য শবাসন পরিশ্রমী নারীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

আহারান্তে গৃহস্থ নর-নারী দু বেলা বীরাসনে ৫।৭ মিনিট বসিলে হজম ভাল হয় এবং তাহাতে বাতরোগ জন্মে না। বীরাসনে বসিবার নিয়ম—পা দুটি ভাঁজ করিয়া গোড়ালিদ্বয় নিতম্বের (পাছার) নিম্নে আনিবে এবং দুই পদতলের বা গোড়ালির মধ্যে গুহ্যদ্বার স্থাপন করিয়া সোজা হইয়া হাঁটুতে হাত রাখিয়া বসিবে। বীরাসন মোটেই কষ্টকর আসন নহে, অথচ উপকার হয় ইহাতে প্রভূত।

গরীব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের একটানা কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। শরীরকে মোটে বিশ্রাম না দিয়া, এই যে দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে সংসারের জন্য মেয়েরা দেহপাত করেন, তাহাতে শীঘ্রই তাঁহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অথচ সামান্য দু'চারটা আসন-মুদ্রা অভ্যাসের ফলে কিন্তু শারীরিক অবসাদ বা ক্লান্তি অনায়াসে বিদূরিত হইতে পারে।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন শুধু ভাবুকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শৃঙ্খলার সহিত ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল শরীর-মনকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই, তবে সমাজের নর-নারীকে আদর্শ-রূপে দেখিতে পাওয়া সম্ভব হইয়া উঠিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধন'

এবং 'যোগীগুরু' গ্রন্থ কেবল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য লিখিয়া যান নাই। তাঁহার আশ্রিত শিষ্য-ভক্ত এবং সর্ব্বসাধারণ গৃহস্থ-পরিবারের প্রত্যেকেই শরীর-মন-গঠনোপযোগী নিয়মগুলি পালন করিয়া সংসারে সুখে জীবন-যাপন করুক—ইহাই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে এই গ্রন্থে যে সব আলোচনা করা হইল, নিবিষ্টচিত্তে তাহা অনুধাবন করিয়া চলিলে সকলেই উপকৃত হইবেন—ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আদর্শভাবে জীবনযাপন-প্রণালীর প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ফিরিয়া আসুক। সমাজে আদর্শ নরনারীর উদ্ভবে সকল সমস্যা বিদূরিত হইয়া ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করুক।

পরিশিষ্ট

সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে কত বিদ্যার যে অনুশীলন চর্চা হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। এক এক বিদ্যার আবাব বহু শাখা বা সম্প্রদায় ছিল। গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে সেইসব বিদ্যাব অনুশীলন চর্চা হইত। 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ' নামক ছান্দোগ্যোপনিষদের (৭।১।২) সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ বলিতেছেন—

'ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য-মেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি ॥'

—'হে ভগবন্ সনৎকুমাব! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্বণ (অথর্ববেদ), পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র, বেদসমূহের বেদ অর্থাৎ বৈদিক পদনিষ্পাদক ব্যাকরণশাস্ত্র, পিত্র্য (শ্রাদ্ধপদ্ধতি) গণিত শাস্ত্র, অনিষ্টসূচক উৎপাতজ্ঞাপক শাস্ত্র, ভূগর্ভস্থ বস্তুজ্ঞানের শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, বেদাঙ্গ শিক্ষাকল্পাদি শাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ যাহাদ্বাবা নানাপ্রকাব গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা যায় এবং নৃত্যগীতাদি শিক্ষা কবা যায়, সেই সমস্ত শাস্ত্র সবই জানি, কিন্তু এত জানিয়াও আমি আত্মবিৎ হইতে পারি নাই।'

আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না হইলে বিভিন্ন বিষয়ে এত জ্ঞান সত্ত্বেও মানুষ শোক-মোহের পরপারে যাইতে পারে না। বিদ্যার সম্পূর্ণতা হয় আত্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করিলে। এইজন্যই এত

বিদ্যা অধিগত করিয়াও নারদ শোক-মোহের পরপারে যাইতে পারেন নাই। নারদের প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া নারদকে সনৎকুমার ক্রমশঃ ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান প্রদান করেন। তবেই নারদের জীবন পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে অর্থাৎ সর্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া নারদ কৃতকৃত্য হন।

ছান্দোগ্যোপনিষদের বিদ্যার তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ভারতবর্ষ কোন বিদ্যা অধিগত করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ লাভ করিয়া প্রাচীন ভারতে মানুষ ধন্য কৃতকৃতার্থ হইত। বাৎসায়নের কামশাস্ত্রেরও চর্চা হইত বিদ্যা-হিসাবেই। সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনে কামশাস্ত্রের প্রতিও উপেক্ষা নাই। আচায শঙ্করকে পর্যন্ত কামশাস্ত্র বা কামবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য রাজা অমরকের দেহে আবিষ্ট হইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সকল বিদ্যা বা শাস্ত্রের অনুশীলনেরই ব্যবস্থা ছিল। পরম্পরাক্রমে সকল বিদ্যাই প্রাণবন্ত এবং প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে আজ বহুবিদ্যাই মৃত অর্থাৎ প্রাণহীন বা বিলুপ্ত। অন্যান্য দেশ ভারতবর্ষেব সেই সব বিদ্যা অধিগত করিয়াই আজ গৌরবান্বিত।

আচার্যগৃহে বিদ্যালাভের জন্যই বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রসমাগম হইত। বিদ্যার অনুশীলন বা চর্চা করিতে করিতে কাহারও কাহারও অন্তরে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য অদম্য পিপাসা জাগ্রত হইত। তাঁহারা আর বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্মে বা প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন না। উর্ধ্বস্রোতা হইয়া তাঁহারা সারাজীবন নিবৃত্তিধর্মের অনুশীলন-চর্চা করিয়াই জীবনের পরিমিত আয়ু নিঃশেষ করিতেন। গুরুগৃহ হইতে বিদ্যাচর্চা সমাপনান্তে কেহ কেহ চতুরাশ্রমের মধ্যে অন্যতম গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সংসারধর্ম নিখুঁতভাবে যাহাতে প্রতিপালিত হয়, সেই জন্য আচার্যই প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশও প্রদান

করিতেন। সংসারধর্মের দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে যথোচিত উপদেশ লইয়া তবে গুরুগৃহাগত শিষ্য বিবাহাদি করিয়া **প্রজাতন্তুর ধারাকে** অব্যাহত রাখিতেন। চতুরাশ্রমের ভিত্তিতেই আদর্শ গৃহস্থ-জীবনও গঠিত হইত। আজ ভারতবর্ষের আদর্শসমাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ আমরা ঋষিবাক্যকে অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। পতনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া আজ আবার দেখিতেছি মানুষের প্রাণে উত্থানের বা বাঁচার মত বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণই বটে।

কেবল ভোগ বা পার্থিব সমৃদ্ধিলাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নহে। ত্যাগভিত্তিক ভোগই ভারতবাসীর কাম্য। আসুরিক সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া দৈবী সম্পদ্‌লাভের কৌশল বা উপায়কে অশ্রদ্ধা করা ভারতের শিক্ষার আদর্শ নহে। এইজন্যই বিবাহ-ক্ষেত্রে ত্যাগ-সংযম, ব্রতপালন ইত্যাদি আজ পর্যন্ত নির্মূল হতে পাবে নাই। প্রবৃত্তিমার্গের নর-নারীও আজ ভারত-বর্ষের নিকট হইতে উন্নত আদর্শের শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। উন্নতি বলিতে মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতেছে যে দৈহিক বললাভই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য নহে। শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। আজ সুদৃঢ় শরীর এবং অটুট স্বাস্থ্যলাভের জন্য যৌগিক ব্যায়াম পাশ্চাত্যদেশেও সমাদৃত হইতেছে। ভারতের যোগবিদ্যার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছে আসন-মুদ্রা-প্রাণায়ামের উপকারিতা পাশ্চাত্যদেশের নর-নারীগণও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। রাজযোগের সঙ্গে সঙ্গে হঠযোগের শিক্ষার প্রতিও মানুষের মন আকৃষ্ট হইতেছে। ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ভারতের সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন অন্য দেশবাসীদের মধ্যেও আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছে।

এই শুভক্ষণে ভারতের ঋষি-মুনিপ্রচারিত সকল বিদ্যার অনুশীলনই জাতির পক্ষে পরম কল্যাণজনক।

গার্হস্থ্যজীবন বলিতে বিবাহিত জীবনকেই বুঝাইয়া থাকে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'—এই কথাটির গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। আদর্শ সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি করিতে হইলে মৌলিক শিক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য-ব্রত-পালন সমাজের প্রত্যেক নর-নারীব পক্ষে অত্যাবশ্যক। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র, উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিলে কেবল বিড়ম্বনাভোগই করিতে হয়। সমাজে যে-বিদ্যার আলোচনা এবং প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন, আজ সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। সন্তান-সন্ততি লাভেব জন্যই অর্থাৎ পুত্রৈষণার জন্যই সংসারধর্ম করা। সংসারটা অধর্মের বা কুপ্রবৃত্তির লীলানিকেতন নহে। **সুপ্রজননবিদ্যার** অনুশীলনে হয় দেবসন্তানের আবির্ভাব। বীজপ্রদ পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতা—উভয়ের গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। এই কর্তব্যের প্রথম শিক্ষাই দেওয়া হয় **ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে**। ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনের ফলে উপযুক্ত বীজপ্রদ পিতার সৃষ্টি হয় সমাজে। সুপ্রজননও একটা বিদ্যা, তাহারও বিজ্ঞান আছে। কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই বিবাহরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নহে। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের পেছনে রহিয়াছে অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশ। সুসন্তানের জনক-জননী হওয়া মুখের কথা নহে। কামবৃত্তি চরিতার্থ করিলেই সুসন্তানের জন্ম হয় না। ত্যাগ-তপস্যা-সংযম দেবসন্তান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। আচার্যগৃহে এই মৌলিক শিক্ষাই প্রদান করা হইত। এইজন্যই সুস্থ-সবল-সচ্চরিত্র নাগরিকের কোনদিন অভাব হয় নাই।

কথাপ্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। সেদিন কলেজে-পড়া একটি মেয়ের সঙ্গে আলোচনা হইল। মেয়েটির

প্রশ্ন—'স্বামীজি! এত পড়াশুনা করি অথচ মনে রাখিতে পারি না কেন? চেষ্টা করিয়াও কুচিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না কেন? দয়া করিয়া আমাকে এই সম্পর্কে কার্য্যকরী কিছু উপদেশ বা কৌশল শিখাইয়া দিন।'

মেয়েটিকে আমি প্রথমেই বলিলাম, 'আচ্ছা, ভগবান্ আছেন কি নাই – এইসব জটিল প্রশ্নের আলোচনায় নাই বা গেলাম। তুমি দেহ, প্রাণ এবং মনকে স্বীকার কর ত? অনাহারে মানুষ মরে, আর আহারদ্বারাই মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং দেহের পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। আহার দ্বারা যেমন স্থূলদেহ তৈরি হয়, তেমনি হয় মন তৈরি। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—**"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।"** সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত কথাগুলির সহজার্থ হইল—অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেই ভুক্তান্নের যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা মলে পরিণত হয় অর্থাৎ বিষ্ঠা হয়। যাহা মধ্যম ভাগ তাহা মাংস হয়, আর যাহা সূক্ষ্মতম ভাগ, তাহাদ্বারা মন গঠিত হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারিলে খাদ্যের দ্বারাই মন তৈরি হয় এবং মানসিক বৃত্তিরও উৎপত্তি হয়। এখন ত তোমাদের মধ্যে খাদ্যবিচারই নাই। যেখানে-সেখানে খাওয়া, যাহা-তাহা খাওয়া ত তোমাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। কাজেই মনের দোষ কি? মনের আহার ত তোমরাই দাও অর্থাৎ মন বা মানসিক বৃত্তি ত তোমরাই গঠন কর। যেমন খাদ্য, তেমনি মন আর তেমনি বিচার বা চিত্তবৃত্তির গঠন। আহার বিষয়ে তোমরা কি সংযমের পথ ধরিয়া চল? কাজেই তোমাদের মনস্থিরের অলৌকিক উপায় আমি আর কি বলিব? আগে প্রত্যেকের বাড়ীতে কোন না কোন বিগ্রহ বা দেবতার সেবা-পূজা

হইত। পরিবারস্থ সকলে পাইতেন দেবতার প্রসাদ। প্রসাদে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে কল্যাণ-চিন্তার হয় উন্মেষ। আগে মনটাকে তৈরি করার উপায় বা কৌশল আয়ত্ত করিয়া আমার কাছে আসিও। আমি তখন মনস্থিরের উপায় বলিয়া দিব।'

ছান্দোগ্যোপনিষদে মনঃশুদ্ধির উপায়ের কথাই বলা হইয়াছে।

'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।' ঋষিপ্রদর্শিত কল্যাণপন্থাকে অগ্রাহ্য করার জন্যই আজ সমাজে এত কুৎসিৎ প্রবৃত্তি এবং অনাচারের সৃষ্টি হইতেছে। মানসিক চাঞ্চল্য বা এত কুপ্রবৃত্তি দেখা দেয় কেন, তাহারও কারণ আছে। বিনা কারণে কোন কার্য হয় না। আহারের উপরই নির্ভর করে মানসিক বৃত্তির। গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক খাদ্যের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

আয়ুসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টাদুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

—গীতা ১৭।৮-১০ শ্লোক

—যে সকল আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরস, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর এবং মনোরম সেইগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। যে সকল আহার দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকর সেইগুলি রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। মন্দপক্ব,

রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও যজ্ঞে নিষিদ্ধ আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

স্বয়ং ভগবান্ আহারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল, দুষ্টাচারী মানুষ কি ভগবানের কথায় আজকাল কর্ণপাত করিয়া চলে? সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক খাদ্য গ্রহণের লোভ বা প্রবৃত্তি হয় প্রকৃতি অনুসারে। প্রকৃতি অনুযায়ী খাদ্যে রুচি এবং অরুচি হয়। মন তৈরী হয় যে-আহারের দ্বারা, সেই আহার-সম্পর্কে আমরা সতর্ক-সচেতন নহি। এইজন্যই তামসিক বৃত্তি বা পশুপ্রবৃত্তির এত প্রাধান্য। ভগবদ্‌বাক্যকে অগ্রাহ্য করিবার দুঃসাহস বা দুষ্প্রবৃত্তি সমাজের অধিকাংশ নর-নারীর মধ্যে দেখা দিযাছে। অবশ্য কলিতে মানুষের আচার-আচরণ বা প্রবৃত্তি কিরূপ হইবে, ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে, যথা—'আর্যধর্ম বিলুপ্ত হইবে, বেদোক্ত বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ও সদাচার—সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। **মনুষ্যগণ কুকুর ও বানরের মত শুধু কামবশীভূত হইয়া বর্ণসঙ্কর বর্ধিত করিবে।'** ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ভগবদ্বাক্য বা শাস্ত্রবাক্যের প্রতি মানুষের আর তেমন শ্রদ্ধা নাই। কাজেই সমাজ আজ দ্রুত অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভগবদ্বাক্যে বা শাস্ত্রবাক্যে পুনঃ বিশ্বাস ফিরিয়া আসিলেই আবার নবযুগের সৃষ্টি হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুঃসময়ে ভগবদ্বাক্য বা শাস্ত্রবাক্যের প্রচাব একান্ত আবশ্যক।

সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বিগণের প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠানের পেছনে আছে দিব্যভাব। ভাববিচ্যুত হইয়া পড়ার জন্যই সামাজিক এত দুর্দশা দেখা দিয়াছে। সমাজে আবার সেই মহানুভাবেরই উদ্‌বোধন করিতে হইবে। আহার-বিহার প্রত্যেকটি কর্মকে ধর্মভাবাপন্ন করিয়া

তুলিতে হইবে। **'আহার করি, আহুতি দেই শ্যামা মারে'**— রামপ্রসাদের এই অমর শাক্তপদাবলীর তাৎপর্য মনন করিতে হইবে।

ভোজন আমার আহুতি প্রদান,
শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর,
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গভঙ্গী মুদ্রাবিরচন,
যে ভাবেই বসি, সেই ত আসন
যে চিন্তাই করি, তাঁরই ধ্যান ধরি
এ জীবন তাঁর যন্ত্র।

প্রত্যেকটি কর্মকে এইভাবে দিব্যভাবসম্পুটিত করিতে হইবে। তুচ্ছ কর্মও ভাবমাহাত্ম্যে উচ্চ গতি প্রদান করে।

এখন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিবাহের তাৎপর্য বা রহস্য সম্পর্কেই গভীর আলোচনায় ব্রতী হইতেছি। হিন্দুর বিবাহসংস্কার একটি মহান্ তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই বিবাহ সম্পর্কে ঋষিরা অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন—বেদে উপনিষদে। আর্য ঋষিরা ছিলেন যজ্ঞবাদী। প্রত্যেকটি কর্মকেই তাঁহারা যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখিতেন। আর্য ঋষির সমগ্র জীবন যজ্ঞময়। মৃত্যুকে বলা হয় অন্ত্য ইষ্টি অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যজ্ঞাগ্নিদ্বারাই সৃষ্টি, আবার অন্তিমেও অগ্নিতে দেহকে আহুতি প্রদান করা হয়। আর্যজাতির জন্ম-মৃত্যু সবই যজ্ঞভাবে ভাবিত। প্রত্যেকটি কর্মকে ঋষিগণ যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকটি কর্মকে যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখার কথা গীতার মধ্যেও ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়া গিয়াছেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

গীতা, ৯।২৭ শ্লোক

সমস্ত কর্মকে যজ্ঞেশ্বর ভগবানে আহুতি দেওয়া বা সমর্পণ করাই যজ্ঞ। ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিবাহ-কর্মটি **মন্ত্রবিদ্যা**। বীজপ্রদ পিতা গর্ভধারিণী স্ত্রীতে রেতেরই অভিসিঞ্চন করেন। বিবাহটিও একটি পবিত্র যজ্ঞবিশেষ। বিবাহকে যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখা পৃথিবীর আর কোথায়ও আছে কি? স্ত্রীকে সহধর্মিণীরূপে সম্বোধন এক ভারতবর্ষ ছাড়া আর কুত্রাপি দেখা যায় কি? ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবন্ধন নহে। ধর্মোৎকর্ষের জন্যই কাম-চর্চা। ধর্মের অবিরুদ্ধ কামকেই শাস্ত্র সমর্থন করিয়াছেন। যথেচ্ছ উপভোগকে ঋষিরা আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন নাই। যুক্তাহার-বিহারকেই গীতাও প্রশংসা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কর্মকে সংযমদ্বারা ব্রতপালনদ্বারা বিশুদ্ধ করাই আর্যধর্ম। আর্যধর্মাবলম্বী কখনও আসুরিক ভাবাপন্ন হইতে পারেন না।

স্ত্রীর গর্ভে সন্তান-উৎপাদন—এই মহৎ কার্যের পেছনে রহিয়াছে একটি স্বর্গীয় বা মহৎ ভাবনা। ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ১ম শ্লোকটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

'যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥'

'হে গৌতম! যোষাই (স্ত্রীই) অগ্নি। উপস্থই তাহার সমিৎ, আর যে সম্ভাষণ করে, তাহাই ধূম, জননেন্দ্রিয়ই অর্চিঃ, আর যে আভ্যন্তরীণ করা, তাহাই অঙ্গারস্বরূপ এবং আনন্দানুভূতিই স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ।'

শাঙ্কর ভাষ্যের বিশ্লেষণটি আরও সুন্দর এবং অপূর্ব। 'হে গৌতম, যোষাই অগ্নিস্বরূপ, উপস্থই তাহার সমিধ্, কেননা ইহাদ্বারাই সেই যোষা পুত্রাদি সমুৎপাদনার্থ উত্তেজিত হয়। আর যে উপমন্ত্রণ করে, (পুরুষকে) আহ্বান করে, তাহাই ধূমস্বরূপ, কারণ, সেই উপমন্ত্রণ কার্যটি স্ত্রী হইতেই সমুদ্ভূত হয়। জননেন্দ্রিয়ই অর্চিঃ, কারণ, উহাও লোহিতবর্ণ। আর যে আভ্যন্তরীণ করে, তাহাই অঙ্গারসমূহ, কারণ, উক্ত অগ্নির সহিত উহারও সম্বন্ধ রহিয়াছে। অভিনন্দ অর্থ—স্বল্পমাত্র সুখ, তাহা স্ফুলিঙ্গরাশি, কারণ, উহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।'

'তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি।'২

'সেই এই যোষারূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ (শুক্র) আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।'

কঠোপনিষদে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ নচিকেতাকে স্বয়ং যম প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্নিবিদ্যা সুপ্রাচীন বিদ্যা। যজ্ঞ-কর্মে অগ্নিতেই আহুতি প্রদান করা হয়। অগ্নিতত্ত্ব ভাল করিয়া জানিতে পারিলে তাহাব আর আত্মজ্ঞানে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না।

রমণকার্যে রেতঃকেই আহুতি প্রদান করা হয়, যোষারূপ অগ্নিতে। **অগ্নিভাবনা সুপ্রাচীন বৈদিক-ভাবনা।** হোমসংশ্লিষ্ট জলই এইরূপে শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতোরূপ আহুতিক্রমে গর্ভীভূত হয়। পঞ্চমী আহুতি আহুত হইলে রেতোরূপ জলই গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের যজ্ঞভাবনা বা মৈথুনকর্মরূপ অধঃউপাসনা আরও গভীর রহস্যব্যঞ্জক। পৃথিবীর আর কোন্ ধর্মসাহিত্যে এইরূপ স্বর্গীয় ভাবনা রহিয়াছে? **'তস্যাঃ উপস্থঃ বেদিঃ'**—স্ত্রীর উপস্থটিকে যজ্ঞবেদীরূপে ভাবনা ঋষিদেরই দিব্যভাবনা বা চিন্তাপ্রসূত।

অতঃপর সর্বভূতের সারভূত শুক্রের আধানপাত্র নির্মাণের প্রণালী কথিত হইতেছে অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোপনিষদে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

'স হ প্রজাপতিরীক্ষাঞ্চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি, স স্ত্রিয়ং সসৃজে, তাং সৃষ্ট্বাধ উপাস্ত, তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত, স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজত ॥ ৪০৯ ॥ ২

সেই প্রজাপতি (বিধাতা) উক্ত রেতের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন, - ভাল, ইহার (রেতের) প্রতিষ্ঠা বা আধানপাত্র নির্মাণ করিব, তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন, সেই স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া নীচে রাখিয়া **উপাসনা** করিয়াছিলেন, সেই হেতু এখনও স্ত্রীকে অধে রাখিয়াই উপাসনা করিবে। সেই প্রজাপতি নিজেরই স্পন্দমান এই পাষাণতুল্য পুং-চিহ্নটি [স্ত্রীচিহ্নে] প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রকারেই স্ত্রী-সংসর্গ করিয়াছিলেন।'

শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ, যথা—'যেহেতু এই রেতঃ হইতেছে সমস্ত ভূতের সারতম, সেইহেতু প্রজাপতি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, ইহার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা বা আধান-পাত্র কি হইতে পারে? তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া স্ত্রীমূর্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সেই স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অধে রাখিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন—মৈথুনকর্মরূপ অধ-উপাসনা করিয়াছিলেন; সেই হেতু অপর লোকেও স্ত্রীর অধ-উপাসনাই করিবে, কেননা সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠলোকের আচরণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।'

'এ বিষয়ে বাজপেয়-যাগের সাধারণ ধর্মের পরিকল্পনা প্রদর্শন করিতেছেন, – তিনি (প্রজাপতি) কাঠিন্যরূপ তুল্য ধর্ম থাকায় [যজ্ঞীয়] সোমনিষ্পেষণের পাষাণখণ্ডস্থানীয় প্রাঞ্চ—উত্তম গতিযুক্ত বা স্পন্দন-

সম্পন্ন আপনার এই পাষাণখণ্ডটি অর্থাৎ কাঠিন্যযুক্ত জননেন্দ্রিয়টি স্ত্রীচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া উৎপূরণ করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারাই এই স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিয়াছিলেন।'

বৃহদারণ্যকের মূল শ্লোকানুবাদ :—

'স্ত্রীর উপস্থটিকে (জননেন্দ্রিয়কে) বেদি বলিয়া চিন্তা করিবে লোমসমূহকে কুশ বলিয়া, চর্মকে [চর্ম বলিয়া] এবং মুষ্কদ্বয়কে (উভয় পার্শ্বের স্থূল মাংসখণ্ড দুইটিকে) অধিষবণদ্বয় (সোম-পেষণের দুইটি পাষাণখণ্ড) বলিয়া চিন্তা করিবে। যজমান (যাজ্ঞিক পুরুষ) বাজপেয় যাগের দ্বারা যে পরিমাণ লোক বা ফলপ্রাপ্ত হন, যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষেরও সেই পরিমাণই ফল লাভ হয়। [অতএব এ বিষয়ে ঘৃণা বা কুৎসা করিতে নাই]। যে ব্যক্তি এই প্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অধোপহাস (উক্ত কর্ম) আচরণ করে, সেই লোক সেই স্ত্রীদিগের পুণ্য আহরণ করে, পক্ষান্তরে, যে লোক এইরূপ বিজ্ঞানবর্জিত—যথেচ্ছাচারী হইয়া উক্ত অধোপহাস কর্ম আচরণ করে, স্ত্রীগণ তাহার পুণ্য আবৃত করে অর্থাৎ গ্রহণ করে।' ৪১০।৩, (দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত মূল এবং ভাষ্যানুবাদ)।

আচার্য শঙ্কর তাঁহার রচিত ভাষ্যে বলিয়াছেন—'বাজপেয় যজ্ঞকর্তার যে পরিমাণ লোক প্রাপ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথোক্ত প্রকার মৈথুনকর্মকারী বিদ্বানেরও সেই পরিমাণ লোকই—ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে ঐ কর্মের প্রশংসা করা হইতেছে, তখন এ বিষয়ে বীভৎসা বা নিন্দা করা উচিত নহে। এইরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন যে লোক **'অধোপহাস'** আচরণ করে, সে লোক সেই স্ত্রীর পুণ্য অধিকার করে। আর যে-লোক যথোক্ত প্রকার বাজপেয়-যাগ-সম্পাদনক্রম জানে না এবং রেতঃ যে রসতম—

ইহাও অবগত নহে, অথচ অধোপহাস আচরণ করে, স্ত্রীগণ সেই অবিদ্বানের সুকৃতি বা পুণ্যরাশি আবৃত করিয়া থাকে।'— ভাষ্যানুবাদ।

সুপ্রজনন বিদ্যা বলিতে মন্থকর্মাভিজ্ঞ অর্থাৎ অধোপহাস নামক মৈথুনক্রিয়াকেই বোঝায়। বর্তমানে অবিদ্বান্ অথচ মৈথুনকর্মে আসক্ত লোকের সাংখ্যাই বেশী। তাহারা অধোপহাস নামক ক্রিয়া করে, অথচ সেই ক্রিয়ার রহস্য সম্পর্কে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। অতএব তাহাদের ইতর যোনিতেই পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞ মন্থকর্মাদ্বারা কেবল পাপের মাত্রাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমাজের দুর্গতি দেখিয়া, নর-নারীর ইতরবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্বংসের কথাই, প্রলয়ের কথাই কেবল মনে জাগে। এই অধঃপতিত যুগের পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে আবার আমাদের শ্রদ্ধাসহকারে মুনি ঋষিদের ভাবনাকেই আশ্রয় বা অবলম্বন করিতে হইবে। বাঁচিবার ইহাই একমাত্র পথ। অধোপহাস বা মৈথুন কর্মেরও রহস্য জানিয়া তবে স্ত্রীতে উপগত হওয়ার বিধান দিয়া গিয়াছেন ঋষিবৃন্দ। নারীদের শ্রেণীর পার্থক্য না জানিয়া, যোনি-বিচার না করিয়া শিয়াল-কুকুরের মত মৈথুনকর্মে প্রবৃত্ত হইলে অধোগতি অনিবার্য।

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক—পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রত্যেকটি কর্মকে যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখাই আর্য-ঋষিদের হিত-উপদেশ। মন্থকর্মেরও বিজ্ঞান আছে। আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন করিতে হইলে রীতিমত ঋষিপ্রদর্শিত সাধন-প্রণালী অবগত হইতে হইবে। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন কেবল বক্তৃতার বিষয় হইয়া থাকিলে তাহাতে কোন ফললাভ হইবে না। সংযত পিতামাতা ব্যতীত দেবসন্তানের উদ্ভব বা সৃষ্টি হয় না। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন সম্পর্কে অনেক কার্যকরী উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন সদ্‌গুরু ঠাকুর নিগমানন্দ। বহু উপদেশ তিনি দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সব উপদেশ কি গৃহস্থসমাজে প্রতিপালিত

হইতেছে? ব্রহ্মবিদ্ ঋষির কুলে বা বংশে অব্রহ্মবিদের জন্ম অসম্ভব—এই কথা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। কেন তবে সমাজে এত পাশবিক ভাব এবং সেই ভাবেরই মূর্তি সন্তান-সন্ততির জন্ম? শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত পুরুষ-নারী ভক্ত কি অক্ষরে অক্ষরে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন? ব্রহ্মচর্যবিহীন উচ্ছৃঙ্খল পিতামাতা দ্বারা সমাজে ধর্মভাবাপন্ন সন্তানের সৃষ্টি হইবে কেমন করিয়া? আহারশুদ্ধি নাই, জাতি-অজাতি বিচার নাই, যোনিবিচার নাই—কি করিয়া আদর্শ গৃহস্থ-সমাজের সৃষ্টি হইবে? ঋষিযুগের পুনরুত্থানের জন্যই সদ্গুরু নিগমানন্দ আসিয়াছিলেন। আজকাল অনেক অনুষ্ঠান বা আন্দোলনই সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় ব্রহ্মচযপালনমাহাত্ম্যের তেমন উল্লেখযোগ্য প্রচার আছে কি? মন্থকর্ম বা সুপ্রজননবিদ্যায় পারদর্শী মনীষী আজ কোথায়? আড়ম্বরপূর্ণ অথচ অন্তঃসারশূন্য ভক্তসম্মিলনীর অনুষ্ঠানদ্বারা শিষ্য-ভক্ত-সমাজের কি স্থায়ী উপকার সম্ভব? এই ভাবে কি সারস্বতসমাজ বা অধ্যাত্মসমাজ গঠিত হইবে? ব্রহ্মচর্যপালন, আহার-শুদ্ধি, ভাব-সংশুদ্ধির ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। মূল কাটিয়া গাছের অগ্রভাগে জল ঢালিলে কি হইবে? কর্তব্যকর্মে এবং সাধনপ্রযত্নে শৈথিল্য আনে যে অভয়-বাণীতে, সেই অভয়-বাণী প্রচার বন্ধ রাখা উচিত। মুমূর্ষু রোগী আর সুস্থ-সবল আদর্শ সমাজের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ব্যক্তিগতভাবে অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিশিষ্ট অধিকারীকে সদ্গুরু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই উপদেশকে সার্বজনীনভাবে প্রচার করা কিছুতেই মঙ্গলপ্রদ কার্য নহে। অবস্থা, প্রকৃতি এবং অধিকারকে নির্বিচারে বিসর্জন দেওয়া কোন মতেই জাতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ পন্থা নহে।

দেহচাঞ্চল্য, প্রাণচাঞ্চল্য এবং মনশ্চাঞ্চল্যের কি কোন হেতু নাই? উপনিষদে ধাতু-প্রসাদের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থ-সমাজে আজ কি সেই সব কল্যাণ বিধান প্রতিপালিত হইতেছে? কর্মের কৌশল বা বিজ্ঞান না জানিয়া সেই কর্ম করিলে অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তাই প্রশস্ত হয় মাত্র। মুমূর্ষু রোগীর কর্ণে অভয় বাণী শুনানো প্রয়োজন, কিন্তু সুস্থ-সবল সমাজসেবী নর নারীর সম্মুখে সাধন ভজন এবং কর্তব্যের কথাই বেশী জোর দিয়া বলিতে হইবে। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে—প্রত্যেকের ব্রহ্মচর্য পালন অপরিহার্য বিধি। ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে, আহার-সংযম সম্পর্কে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকবিচার সম্পর্কে গভীর-ভাবে কোন সম্মিলনক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় কি? কেবল ভাবের নৌকায় পাল তুলিয়া দিলেই আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন হয় না।

সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীর চতুরাশ্রমের প্রত্যেকটির পেছনেই রহিয়াছে দিব্য ভাবনা। ভাবনাবিহীন যে কোন কর্মই যজ্ঞ নহে। যজ্ঞেরও বিধি আছে, প্রয়োগকৌশল আছে। বিধি বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া আসুরিক ভাবের পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিলে আদর্শ গৃহস্থ সমাজ গঠিত হইবে না। পাশ্চাত্যদেশে ভোগের আগুনে অধিকাংশ নর-নারী আজ দগ্ধ, জীবন্মৃত। সেই দেশের আদর্শকে অনুসরণ বা অনুকরণ করিতে যাওয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনারই নামান্তর। ত্যাগ সংযম ব্রহ্মচর্য ব্যতীত আদর্শ সমাজ-গঠন কোন কালে সম্ভবপর নহে। ঋষিসমাজের কথা জানিতে হইলে ভাল করিয়া বেদ-উপনিষদ পাঠ এবং মনন করিতে হইবে। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গকে যজ্ঞের সাধন বা যজ্ঞবেদিরূপে কল্পনা দেব-মানবের মস্তিষ্কেই আসিয়াছিল। সাধারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট নর-নারীর দৃষ্টি তো প্রাকৃত দৃষ্টি। ভোগের সঙ্গে অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়সের কথাও চিন্তা করিতে হইবে। ভোগের কথা, মন্থকর্মের কথা, অব-উপাসনার কথা ঋষিরাই বলিয়া

গিয়াছেন। কর্ম করিতেন তাঁহারা বিজ্ঞানসহ- শ্রদ্ধা-বিদ্যা-উপনিষদ দ্বারা। শ্রদ্ধার অনুশীলন, বিদ্যার অনুশীলন এবং উপনিষদের অনুশীলন আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন বিষয়ে একান্ত প্রয়োজনীয়। সমস্ত কর্মেরই বিদ্যা বা সাধন-প্রণালী রহিয়াছে। আচার্যের আনুগত্যে সেই বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে মনুসংহিতাখানাও ভাল করিয়া পাঠ করিতে হইবে। চতুরাশ্রমের কথা মনুসংহিতায় গভীরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 'ঋষির দৃষ্টি জড়দৃষ্টি বা ভূতদৃষ্টি নহে। বস্তুর পেছনে আছে ভাব, তাহার পেছনে আছে তত্ত্ব। বস্তুরূপে জীব-জগৎকে দর্শন মোটেই অধ্যাত্ম-দর্শন নহে। গার্হস্থ্য-জীবনকেও অধ্যাত্ম-ভিত্তিতে সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। শ্রদ্ধাহুতি, সোমাহুতি, বর্ষাহুতি, অন্নাহুতি এবং শুক্রাহুতি—এই আহুতিরহস্যগুলি গৃহস্থকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হবনকার্য শ্রদ্ধাদ্বারাই করিতে হইবে। 'শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে'—এই বেদবাণীর মর্ম উপলব্ধি হওয়া চাই। শ্রদ্ধাই সকলের মূল। এই মৌলিক বস্তুটিকে হারাইলে সবই নিষ্ফল। শ্রদ্ধার আবেশ একেবারে গোড়ার কথা।

কামদৃষ্টিকে পূত-পবিত্র-সংযত করিতে হইবে তপস্যাদ্বারা। বিনা তপস্যায় উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গুলি আত্মাভিমুখী হয় না। ব্রতপালন, ইন্দ্রিয়সংযম, অসৎচিন্তা—অসৎসঙ্গ ত্যাগ, আদর্শ গৃহস্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সৎসঙ্গ গ্রহণ এবং অসৎ সঙ্গ বর্জন করিতে হইবে। দিনের মধ্যে অন্তত কিছু সময় মৌন-ব্রত পালন গৃহীর পক্ষেও মঙ্গলকর। বহু বাক্যব্যয়ের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। অসৎ সঙ্গ, অসৎ চিন্তা, অসৎ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া আদর্শ গৃহীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আহার-নিদ্রা-মৈথুনে আসক্তি আদর্শ গৃহীর লক্ষণ নহে। নিজে আসক্তি বর্জন

করিয়া তবে অন্যকে আসক্তি-ত্যাগের উপদেশ দিতে যাওয়া উচিত। অনধিকারচর্চা কাহারও পক্ষে করণীয় নহে। স্ব-ধর্ম পালন প্রত্যেক আশ্রমীর পক্ষেই কর্তব্য।

দেহের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্মার দিকে লক্ষ্য করাই আদর্শ গৃহীর লক্ষণ। **নারীদেহকে সর্বদা কামদৃষ্টিতে দেখা রীতিমত পাপ**। জড় দেহপিণ্ডের কথা আমরা যত ভাবি, দেহের ভিতরই অবস্থিত জ্যোতির্ময় আত্মার কথা কি আমরা তেমন ভাবি? আদর্শ গৃহীর এই দোষদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। দেহনিরপেক্ষ আত্মার কথা ভাবিলে জড়বাদের মূল শিথিল হইয়া যায়। দেহের আলিঙ্গনে আমরা যত অভ্যস্ত, আত্মার আলিঙ্গনে আমরা তত অনভ্যস্ত। কামুক গৃহী দেহপিণ্ড ছাড়া কিছুই বুঝে না। কামুকের সঙ্গে কামবৃত্তিরই হয় উন্মেষ। আদর্শগৃহী স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত।

'প্রাকৃত জগতে দেখি, স্ত্রীতে বীজ নিক্ষিপ্ত হলে জীবসৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা যজ্ঞের অনুরূপ। স্ত্রী এখানে অগ্নি, হব্য রেতঃ, কিন্তু আহুতি কর্তা হলেন দেবতারা। রেতঃ আসে কোথা থেকে?—অন্নের পরিপাক থেকে। পুরুষরূপ অগ্নিতে দেবতারা অন্ন আহুতি দেন। তাইতে রেতের উৎপত্তি হয়। অন্ন আসে কোথা থেকে?—বৃষ্টি থেকে। পৃথিবী তখন অগ্নি, বৃষ্টি হব্য। বৃষ্টি আসে কোথা থেকে?—সোম থেকে। পর্জন্য তখন অগ্নি, সোম হব্য। সোম আসে কোথা থেকে?—শ্রদ্ধা থেকে। দ্যুলোক তখন অগ্নি, শ্রদ্ধা হব্য। এখন অনুলোমক্রমে বলতে গেলে শ্রদ্ধা থেকে সোম, সোম থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে রেতঃ, আর রেতঃ থেকে পুরুষের উৎপত্তি হয়। **উৎপত্তির আধার হল, যথাক্রমে পাঁচটি অগ্নি**—দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী। দেবতারা নিমিত্ত। এই হল প্রবাহণের **পঞ্চাগ্নিবিদ্যা**।

'কৌষীতকীতে রাজা চিত্র একবার বলছেন, চন্দ্রমা থেকে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে জীবের জন্ম হয়। আবার একটি ঋক্ উদ্ধার করে বলছেন, চন্দ্রমা থেকে রেতঃ আহরণ করা হয়, পুরুষ তাকে স্ত্রীতে নিষিক্ত করে। চিত্রের বিবৃতিতে শ্রদ্ধা এবং অন্নের কথা বাদ পড়েছে। তাছাড়া চিত্র প্রবাহণের মত কথাটাকে গুছিয়ে বলছেন না। ঐতরেয়ে আছে, রেতের উৎপত্তি দিব্য অপ্ হতে। অন্যত্র আছে, রেতঃ পুরুষের সর্বাঙ্গ হতে সংভৃত তেজ। ঋক্‌সংহিতায় যে গর্ভাধানমন্ত্র আছে, তাতে দেবতাদের আবাহনই করা হয়েছে; কিন্তু কি করে জীবসৃষ্টি হয়, তার কোনও ইঙ্গিত সেখানে পাওয়া যায় না। এই দিক্ দিয়ে প্রবাহণ তাঁর বিদ্যাকে নিজস্ব বলে দাবি করতে পারেন। **বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ** এবং **গর্ভ**—এদের মধ্যে কার্যকারণসম্পর্ক অনুমান করা কঠিন নহে। ওষধির সঙ্গে (= অন্ন) সোমের সম্পর্ক ঋক্ সংহিতাতেও পাচ্ছি। আবার বৃষ্টিতে ওষধির পুষ্টি—এ-ও জানা কথা। তাই থেকে সোম অম্ময় বা জলময়—এ ধারণা হতে পারে, বিশেষতঃ যাজ্ঞিকদের সোম যখন লতার রস, তা পান করলে মানুষ অমৃত হয়। পার্থিব সোমই আকাশে চন্দ্র, দেবতারা তাকে পান করেন। এই সব ভাবানুষঙ্গ থেকে মনে হতে পারে, সোম "পিত্র্যাবান্" বা পিতৃশক্তির আধার। সব জীবই চন্দ্র থেকে আসছে, আবার চন্দ্রে যাচ্ছে (কৌ. ১।২) তবে চন্দ্র দুটি—একটি আদিত্যের ওপারে, আরেকটি এপারে। দুটিই অমৃত প্রাণের আধার, কিন্তু একটি থেকে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, আরেকটি থেকে হয়।'—বেদ-মীমাংসা, অনির্বাণ।

শ্রীমন্ত আর **পুত্রমন্ত** হইল আভ্যুদয়িক কর্ম। অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স্ উভয়ই বৈদিক যজ্ঞের লক্ষ্য। বিদ্যাসম্প্রদানের জন্য আচার্যকে শ্রীমন্তও হইতে হয়, নতুবা ভরণপোষণ কার্য চলিবে কেমন করিয়া?

আচার্যের গৃহে বিদ্যার্থীর সমাগম হইবেই। সেই সব বিদ্যার্থীর ভরণ-পোষণের জন্য শ্রীমন্ত্র অর্থাৎ ঐশ্বর্যেরও প্রয়োজন আছে। ধন-ঐশ্বর্য ব্যতীত বিদ্যার্থীকে ভরণ-পোষণ করা যায় না। এইজন্যই আচার্য যেমন পুত্রমন্থী হইবেন, তেমনি হইবেন শ্রীমন্থী। পুত্রমন্থ বা দাম্পত্য ধর্মপালন সম্পর্কেও আচার্যকে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। সুপ্রজনন বিদ্যাতেও থাকা চাই আচার্যের অধিকার। **দাম্পত্যধর্ম পালন করিতে হইবে অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া নহে, দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া।**

দেবাবিষ্ট পিতাই সু-সন্তানের জনক—এই কথাটি গৃহস্থদের প্রত্যেকের স্মরণ থাকা উচিত। কামাতুর পিতা সু সন্তানের জন্মদাতা হইতে পাবে না। সু-প্রজননবিদ্যায় পারদর্শী না হইলে আদর্শ গৃহস্থ হওয়া যায় না। গর্ভাধান ব্যাপারটিও দৈব কার্য—আসুরিক নহে। দেবাবিষ্ট হইয়া চিদ্‌বীজ নিক্ষেপ করিতে হইবে স্ত্রীর গর্ভে তবেই সুসন্তান সম্ভব। সুপ্রজননবিদ্যার ইহাই নিগূঢ় রহস্য। দেবাবিষ্টচিত্ত না হইলে সু সন্তানের 'চিৎ-কণ' সেখানে সংগৃহীত হয় না। সুপ্রজননও একটি বিদ্যা। উপযুক্ত ভ্রূণকে গর্ভে আবাহন করিয়া আনা—শ্রদ্ধা, তপস্যা, সংযমের ব্যাপার। পশুর মত ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিলে সেখানে ভাল আত্মার আগমন হয় না। শুধু প্রজনন নহে, সুপ্রজননও একটা বিদ্যা। এই বিদ্যার নামই পুত্রমন্থ বিদ্যা। এই বিদ্যার শিক্ষালাভ করিতে হইবে দেবাবিষ্ট আচার্যের নিকট।

স্ত্রীর মধ্যেও জাতিভেদ আছে। আদর্শ গৃহস্থ হইতে হইলে উপযুক্ত ভার্য্যা গ্রহণ করিতে হইবে। বিবাহকার্য স্বেচ্ছাচারমূলক নহে। পুত্রমন্থ কর্ম অজ্ঞানীর দ্বারা সম্ভবপর নহে। মন্থকর্ম যজ্ঞবিশেষ পূর্বেও তাহা বলা হইয়াছে। এই মন্থবিদ্যার উপদেশ লাভ করিতে হইবে শাস্ত্র এবং বিদ্বান

আচার্যের নিকট হইতে। এইজন্যই উপনিষদের মন্ত্র—'আচার্যদেবো ভব।' আচার্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যার্জন করিতে হইবে।

যেমন দেবযোনি আছে, তেমনি আছে দুষ্টযোনি। দেবারিগণ বা রাক্ষসগণের সঙ্গে মিলন শুভজনক নহে। জ্যোতিষও বেদাঙ্গ, সেই বিদ্যাকেও উপেক্ষা-অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। মারাত্মক বা অশুভ যোনিও আছে। **গণবিচার** এবং **যোনিবিচার** দাম্পত্য-জীবনযাপনে একান্ত প্রয়োজন। পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি জীবনের লক্ষ্য হইলে সেইরূপ বিদ্যার অনুশীলন-চর্চাও করিতে হইবে। দেবাবিষ্ট সমর্থ পুরুষ এবং সমর্থা নারীর শুভ মিলন হইলে সু-সন্তানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সেই ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে কুপুত্রের মুখ দেখিতে হয় না। সংযম-সাধনা ব্যতীত দেবসন্তান আবির্ভূত হয় না। এইসব মৌলিক বিধান বা শিক্ষাকে বাদ দিয়া অভ্যুদয় লাভ করিতে গেলে কি হয়—তাহা পাশ্চাত্যজগতে আজ সুপ্রকট। ব্রহ্মচর্যের কথা ত বর্তমান সমাজে উপহাসের বিষয়। ভোগস্পৃহা এবং ভোগক্ষমতা বা শক্তিবৃদ্ধির জন্য সমগ্র জগৎ আজ উন্মাদ। তবুও বলিতে হইবে, ভারতবর্ষে এই দুর্দিনেও উন্নত আদর্শের কিছু আলোচনা-চর্চা আছে। পাশ্চাত্যের নর-নারী ভারতবর্ষে বিদ্যালাভের জন্যই আসেন। দেহাত্মবাদী হইলে ত আমাদের চলিবে না। সুস্থদেহ চাই বটে, কিন্তু নশ্বর দেহের পরিচর্যায় সমগ্র শক্তি নিঃশেষ করিলেও তো চলিবে না।

ধ্যান-ধারণা, চিত্তসংযম, যম-নিয়ম ইত্যাদির প্রতি আবার মনোযোগ দিতে হইবে। ভারতে কোন্ বিদ্যার অনুশীলন-চর্চা ছিল না? ভারতবাসী একদিন সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং কুশলী ছিল। আজ সেই সোনার ভারত সকল দিকে অধঃপতিত। আবার বোধন-মন্ত্রে সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে।

যজ্ঞের প্রত্যেকটি অঙ্গের একটি রহস্য আছে, তাহা না জানিয়া কর্মের অনুষ্ঠান একটা পণ্ডশ্রম মাত্র। কর্ম করিতে হইবে শ্রদ্ধা, বিদ্যা বা রহস্যবিজ্ঞান এবং উপনিষদ্ বা দেবাবেশ সহকারে। তাহা না হইলে সেই কর্ম নির্বীর্য হইতে বাধ্য। আজ ভারতবর্ষে কর্মানুষ্ঠান হইতেছে, কিন্তু রহস্যবিজ্ঞান নাই। রহস্যবেত্তারও অভাব। সেইজন্যই কোন কর্মই ফলপ্রসূ হইতেছে না। প্রত্যেকটি কর্মকে যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখা এবং করাই—ঋষিদের উপদেশ।

'বেদে অগ্নি সূর্য আর সূর্যরশ্মির প্রতীক দিয়ে দিব্য ভাবনাকে প্রকাশ করা হয়েছে। অগ্নি ও সূর্য—দুই-ই দ্যুতি বা জ্যোতি বা দেবতা। অগ্নি পৃথিবীতে আছেন, আছেন আমার মধ্যে আত্মচৈতন্যের তাপ আর আলো হয়ে। সূর্য আছেন দ্যুলোকে—বিশ্বচৈতন্যের দ্যোতক হয়ে। সূর্যরশ্মির বিকিরণ একই চৈতন্যের বহু হওয়া। এই বহুধা বিকীর্ণ চৈতন্যই বিশ্বদেবগণ। অগ্নির শিখা সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী, সে যেন পৃথিবী থেকে সূর্যে পৌঁছতে চায়। এটি আমার আত্মচৈতন্যের বৃহৎ হয়ে পরম জ্যোতিতে উপসন্ন এবং বিশ্বজ্যোতিতে পরিকীর্ণ হওয়ার প্রতীক। অগ্নিতে যা আহুতি দেওয়া হয়, তা-ই আগুন হয়ে যায় এবং সূর্যের দিকে উজিয়ে চলে। অতএব অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়াই সূর্যে পৌঁছনর সাধন। ঋষিরা আহুতি দিতেন পুরোডাশাদি অন্ন, পশুমাংস এবং সোমরস দ্বারা। এরা যথাক্রমে দেহ, প্রাণময় এবং আনন্দময় চেতনার প্রতীক। আত্মমন্থন করে আগুন জ্বালতে হবে, নিজের মধ্যে একটা চিন্ময় তাপ আর আলো সৃষ্টি করতে হবে এবং তার মধ্যে দেহ প্রাণ আর রসচেতনাকে আহুতি দিয়ে তাদের হিরণ্য জ্যোতির্ময় করে তুলতে হবে। এই সাধনার নাম 'যজ্ঞ'—যা একটি তত্ত্বের মত এখান

হতে দ্যুলোক পর্যন্ত, অগ্নি হতে সূর্য পর্যন্ত, আত্মচৈতন্য হতে ব্রহ্মচৈতন্য পর্যন্ত বিতত হয়ে আছে।'—বেদমীমাংসা

বিবাহব্যাপারটা যদিও জৈব অনুষ্ঠান, কিন্তু তাহার পেছেনে আছে একটি মহৎ ভাবনা। অমার্জিত, অবিশুদ্ধ ভোগ নর নারীর কাম্য নহে। জীবনে, সৃষ্টির মূলে যে কাম-রস আছে, তাহাকে পরিশোধিত পরিমার্জিত করিয়া দেবতাব উদ্দেশে আহুতি দিয়া তাঁহারই প্রসাদরূপে তাহাকে গ্রহণ করিয়া আধারে আনন্দেব ঢল নামানো—ইহাই হইল সোমযাগের লক্ষ্য। রসেরও শোধন চাই। ভূতশুদ্ধির রহস্যও এইখানে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'—ইহা সংহিতারই উপদেশ। ভোগেরও বিশুদ্ধি চাই। এইজন্যই বিবাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। ভোগস্পৃহা মানবজীবনের সহজাত প্রবৃত্তি। তাহাব উচ্ছেদে বা নিগ্রহে জীবন সার্থক হয় না। জীবন সার্থক হয় সংযমনে, আপ্যায়নে বা ঊর্ধ্বায়নে। ভোগের এক মেরুতে আছে গৃধ্নুতা বা লোলুপতা, আরেক মেরুতে ত্যাগ। একটি আসুরী প্রবৃত্তি, আরেকটি দৈবী সম্পদ্। অসুর আত্মম্ভরি, সে আহুতি দেয় নিজের মুখে, আর দেবকাম মানুষ আহুতি দেয় হব্যবাহন অগ্নিতে। দেবাবিষ্ট চেতনাই অমৃত-চেতনা।

'গর্ভাধান জীবের প্রথম জন্ম। গর্ভাধান হতে মৃত্যু পযন্ত তার আয়ুষ্কালের পরিমাণ। মানুষের সমস্ত জীবনই একটা যজ্ঞ। এই দৃষ্টিতে আহুতি দিয়ে যেমন জীবনের শুরু, তেমনি আহুতি দিয়েই শেষ। ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি গর্ভাধানকে বলেছেন, যোষারূপ অগ্নিতে দেবতাদের দ্বারা রেতের আহুতি। অর্থাৎ পুরুষসূক্তে যেমন দেখি বিশ্বসৃষ্টি একটি দেবযজ্ঞ, প্রজননও তা-ই। আর মৃত্যুর পর দেহকে চিতায় তুলে দেওয়া হল 'অন্ত্যা ইষ্টি' বা জীবনের শেষ যাগ। মানুষের জীবন আদ্যন্ত অগ্নিপ্রবাহ, "অগ্নিই আয়ু"।

'গর্ভাধান যে "বীভৎস" কর্ম নয়, সে যে অগ্নি এবং আদিত্যের মিলন এবং মানুষের দিব্যজন্মের প্রয়োজক, এ ভাবনা আমরা আরণ্যকেই পেয়েছি। একে বৈদিক ঋষিরা যে রাহস্যিক দৃষ্টিতে দেখতেন, তার পরিচয় পাই ঋক্‌সংহিতার গর্ভাধানমন্ত্রগুলিতে। সেখানে দেখি, মায়ের গর্ভাশয়কে গড়ে তুলছেন মাধ্যন্দিন সূর্যের দেবতা বিষ্ণু, প্রজাপতি তাতে বীজ নিষেক করছেন, সে বীজকে ভ্রূণে পরিণত করছেন একদিকে যেমন সিনীবালী এবং অশ্বিদ্বয় যাঁরা অব্যক্তের অন্ধকারে আলোর ঈশ্বরা, আরেকদিকে তেমনি বিশ্বকর্মা "ধাতা' এর প্রচেতনা বা প্রজ্ঞানের দেবতা সরস্বতী—অর্থাৎ সমস্তটা জীবন যে কালো হতে আলোয় উত্তরণ, ভ্রূণের মধ্যে নিহিত হচ্ছে তারই সম্ভাবনা। সেই ভ্রূণকে বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় রূপায়িত করছেন বিশ্বশিল্পী ত্বষ্টা। **এই গম্ভীর ভাবনা গর্ভাধানের মূলে।**

'রেতঃ পুরুষের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে থাকে প্রজননের প্রয়োজিকা শক্তিরূপে। রেতের দেবতা "অপ্‌" বা দিব্যপ্রাণের ধারা। এই রেতঃ হল গর্ভ বা ভ্রূণের আদিরূপ। পিতার সমস্ত দেহ হতে রেতঃ সম্ভৃত বা সঞ্চিত হয় জননেন্দ্রিয়ে তেজ রূপে। তেজ হল জ্যোতিঃশক্তির "সংহনন" বা জমাটবাঁধা। এটি পিতারই আত্মস্বরূপ, অতএব প্রজনন বা তাঁর আত্মা বা তনু হতে আত্মার বিসৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই তেজকে বিভর্তি বা ধারণ করেন, অর্থাৎ নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখেন। তারপর মনের প্রবেগে তাকে যখন তিনি স্ত্রীতে নিষিক্ত করেন, তখন সর্বাঙ্গস্থিত তাঁর রেতঃকে জনয়তি কিনা ব্যক্তরূপে প্রাদুর্ভাবিত করেন। পুরুষ এখানে বিসৃষ্টির প্রবর্তক এবং বীজনিষেকের পরেই আবার আপনাতে আপনি গুটিয়ে আসেন। এই হল পুরুষের সর্বাঙ্গ হতে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে জীবের প্রথম জন্ম। তারপর পুরুষের তেজ স্ত্রীর সমস্ত সত্তায়

ছড়িয়ে পড়ে তাঁর অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তিনি তার সঙ্গে একাকার হয়ে যান। তিনি ওই তেজকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেন, তার কোন অংশই আর তাঁর অনাত্মীয় থাকে না। তখন তাঁর মধ্যে শুরু হয়ে যায় ভাবনার ক্রিয়া। পুরুষের ভাবনা প্রজ্ঞানময়, স্ত্রীর ভাবনা প্রাণময়। পুরুষ স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের ভাবকে রূপ দিতে চান, তার জন্যই স্ত্রীতে তাঁর তেজের আধান। আর স্ত্রীও রূপকৃৎ, অতএব সেই তেজের স্পর্শে তাঁরও রূপায়ণী শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞানও এমনতর একটা কথা বলে: পুং-বীজ যেমন স্ত্রী-বীজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে সক্রিয় করে তোলে এবং তার পরেই শুরু হয়ে যায় কোষবিভাজন—এক ভেঙে দুই, দুই ভেঙে চার এমনি করে।

'স্ত্রী ভাবয়িত্রী—পুরুষের তেজকে আত্মগত করে তিনি তাকে রূপ দিয়ে চলেছেন। বীজনিষেকের পর পুরুষ স্ত্রী হতে বিবিক্ত থাক্‌লেও নিষ্ক্রিয় থাকেন না—স্ত্রীর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তাঁরও ভাবনা। স্ত্রীর ভাবনা প্রাণের—পুরুষের ভাবকে তা রূপ দেয়। আর পুরুষের ভাবনা প্রজ্ঞার—ওই ভাবাবিষ্ট রূপকে তা সমর্থ বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন করে তোলে। তারই জন্যে আরও নানা সংস্কারের অনুষ্ঠান করা, যাতে **'ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ'**—ভ্রূণের তনু ব্রহ্মধারণার যোগ্যতা লাভ করে। এমনি করে ভ্রূণের ভাবয়িত্রী স্ত্রী হয় পুরুষেরও ভাবয়িতব্যা। সৃষ্টির তপস্যা চলে উভয়ত—এইভাবে।

'পুরুষ রেতঃকে তেজরূপে আত্মারূপে নিজের দেহে "বিভর্তি" বা ধারণ করেন। আবার স্ত্রী সেই নিষিক্ত তেজকে নিজের মধ্যে গর্ভ বা ভ্রূণরূপে বিভর্তি বা পোষণ করেন। দুজনের ভরণে এই তফাত। স্ত্রী পোষণ করেন 'দশমে মাসি সূতবে'—দশম মাসে প্রসব করবার জন্য। প্রসবের পর পৃথিবীমায়ের কোলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম। মানবী মা

এতদিন তাকে একান্তভাবেই আত্মরসে পুষ্ট করেছেন এবং এখনও কিছুদিন করবেন। কিন্তু এই মায়ের নাড়ীর বাঁধন কাটবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীমা তাকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর অন্নজল আলো বাতাস দিয়ে। এইবার এই মায়ের মধ্যে তার পুষ্টি, যতদিন না সে বলতে পারে 'মাতা ভূমিঃ, পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ।'—ঐতরেয়োপনিষদ, অনির্বাণ।

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্যন্ত দশটি সংস্কার গৃহস্থ সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। সমস্ত সংস্কারেরই তাৎপর্য হইল অন্নরসপুষ্ট তনুকে 'ব্রাহ্মী' করিয়া তোলা। তাহার একটি বিশিষ্ট সংস্কার হইল 'উপনয়ন'—পিতার নিকট পুত্রের স্বাধ্যায়ের আরম্ভ অথবা আচার্যের কাছে। এইটিকেও দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়—সংস্কারের দিক হইতে। মনু বলিয়াছেন, অন্তেবাসীর পিতা তখন আচার্য, আর মাতা সাবিত্রী।

সাধারণতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে মানুষের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কিন্তু এই জ্ঞানকে কতখানি পিছাইয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার একটা প্রচেষ্টা প্রাচীন সুপ্রজননবিদ্যার অঙ্গীভূত ছিল। এইজন্যই দিব্যভাবনায় ভাবিত হইয়া প্রজননের অনুষ্ঠান। **পিতামাতার আত্মসমাহিত অবস্থায় যদি গর্ভাধান হয়, তাহা হইলে তন্ত্রে সেই গর্ভের সন্তানকে বলা হয় 'যোগিনীভূ'**। মধ্যযুগে সুবিখ্যাত শৈবাচার্য মহামাহেশ্বর অভিনব গুপ্ত তন্ত্রালোকের গোড়াতেই তাঁহার নিজের এই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পুরাণে পরাশর, অষ্টাবক্র, পরীক্ষিৎ—ইঁহাদের সকলেরই মাতৃগর্ভে থাকিতেই দিব্যজ্ঞানের উন্মেষের কথা পাওয়া যায়। ঋষি বামদেবের জন্মও এইরূপ।

যোগীরা জানেন, চেতনার অন্তরাবৃত্তির ফলে ভ্রূণদশায় ফিরিয়া না গেলে নিরোধসমাধি বা জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। স্বপ্ন বা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া নিরোধভূমিতে পৌঁছিবার কথা পাতঞ্জলের যোগসূত্রেও

বর্ণিত আছে। উপনিষদেও এইরূপ যোগনিদ্রার কথা নানা জায়গায় নানাভাবে পাওয়া যায়। **গর্ভাধানের সময় পিতামাতার ভাববীজ ভ্রূণে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাকে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত মনোবিদ্‌রাও স্বীকার করিয়াছেন।** এইরূপ একটা দিব্যভাবনা যে বৈদিক ঋষিদের সু-প্রজননবিদ্যার মূলে ছিল, তাহা গর্ভাধানসংস্কারের নানা বিবৃতি হইতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। পিতামাতার ভাব সন্তানে সংক্রামিত হয় বলিয়াই ঋষিশাস্ত্রে পিতা মাতা উভয়ের সংযমের কথা বলা হইয়াছে। গর্ভাধানের পর সন্তানের ভ্রূণ অবস্থা হইলে, মাকে সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবার নির্দেশ শাস্ত্রেও প্রদত্ত হইয়াছে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতে মাকে রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি সংগ্রন্থ পড়িবার বা শুনিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে শাস্ত্রে। মায়ের ভাব সন্তানের সূক্ষ্ম শরীরে ক্রিয়া করে। এইজন্যই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মাকে শুচিশুদ্ধ পবিত্রভাবে দিনযাপনের উপদেশ দিয়াছেন শাস্ত্র। আজকাল এই সব মঙ্গল-বিধান অগ্রাহ্য করা হয় বলিয়াই সুসন্তানের জন্ম হয় না। **আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে একেবারে গর্ভাধান বা ভ্রূণ অবস্থা হইতেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।** দিব্যভাবে আবিষ্ট অবস্থায় সঙ্গম হইলে গর্ভে উচ্চ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মারই অনুপ্রবেশ ঘটে। সু-প্রজননবিদ্যার ইহাই নিগূঢ় রহস্য। আজকাল এই সমস্ত পবিত্রভাবের কথা মোটে আলোচনা-চর্চা হয় না। মনে যদি সাত্ত্বিক ভাবের ভ্রূণ বা বীজই না থাকে, তবে সেই ভাবের মূর্তি সুসন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিবে কেমন করিয়া? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন বলিয়া প্রতি বৎসর একই কথার পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাতে কোন সুফলই দেখা দিবে না। আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ সন্তানের জন্ম শুধু মুখের কথায় হয় না। সুপ্রজননবিদ্যার রহস্য না জানিয়া কামবশে কেবল সন্তানের সৃষ্টি করাই আজকাল সমাজের প্রগতি হইয়াছে।

ঋষিযুগে জন্ম এবং মৃত্যু দুই-ই বৈবস্বত চেতনায় উদ্ভাসিত —প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ই হইত। অজ্ঞানে জন্ম এবং অজ্ঞানে মৃত্যু কাহারও হইত না। ইহা দ্বারাই বেশ বুঝিতে পারা যায়, জন্ম এবং মৃত্যু— চেতনার এই দুই অবস্থাই প্রাচীন বৈদিক যুগে অনুশীলনের বিষয় ছিল। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি স্তর সম্পর্কে প্রায় সকলেরই সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল। আজকালও অনেক গৃহস্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, অন্তিম সময় তাঁহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান বা চেতনা ছিল। ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতেই তাঁহাদের মহাপ্রয়াণ ঘটে। সতত ভগবৎচিন্তা, স্মরণ-মননের ফলেই অন্তিম সময় অবশে ধ্রবাস্মৃতির হয় জাগরণ।

ঋষি বামদেবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, গর্ভাবস্থাতেই তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল।

'স এবং বিদ্বান্ অস্মাচ্ ছরীরভেদাদ্ উর্ধ্ব উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ॥'

'বামদেব এইভাবে সব জানিয়া এই শরীরের খোল ভাঙিয়া উর্ধ্বগ হইয়া উৎক্রান্তির পর সমস্ত কামনার আপ্তিতে অমৃত ওই স্বর্গলোকে সম্ভূত হইয়াছিলেন।'

পিতার জীবনের অনুবৃত্তি চলে সন্তানের জীবনে। পিতাই আবার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন অসমাপ্ত কর্ম নিষ্পত্তির জন্য। এইসব কথা অতীব তত্ত্বগর্ভ। মৃত্যুতে চেতনার উত্তরণ ঘটে। মৃত্যু শেষ-পরিণাম নহে। 'অতিমৃত্যু' কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। অন্তরাবৃত্ত হইয়া জন্মের মূল ভ্রূণ অবস্থায় পৌছিতে পারিলেই অতীত অনাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। উপনিষদে অন্তরাবৃত্ত হওয়ার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বহিশ্চর মনোবৃত্তি দ্বারা অন্তর্জগতের সন্ধান মিলে না। ভিতরে ডুবিবার শক্তি থাকা চাই। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে

জীবাত্মার ভ্রূণ অবস্থা হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। গর্ভাশয়ে ভ্রূণের সাত্ত্বিক পরিপুষ্টির একান্ত প্রয়োজন। বীজশুদ্ধি এবং আধারশুদ্ধি অর্থাৎ বীজপ্রদ পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতা উভয়ের ভাব-সংশুদ্ধি চাই সর্বাগ্রে। দেবভাবে ভাবিত না হইলে দেবসন্তানের জন্ম হইবে কেমন করিয়া? দেবজন্মের মূলে থাকা চাই দেব-ভাবনা। দেবতার উপাসন হইল—তাঁহাকে লইয়া নিরন্তর তন্ময় হইয়া চলাফেরা করা। আহারে বিহারে সর্বক্ষেত্রে চাই একটা দিব্যভাব—পশুভাব নহে। আবেশজনিত সৃষ্টিও সম্ভব। সেইরূপ সৃষ্টিদ্বারাই আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠিত হয়।

কেবল ভাবের কথা শুনিলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সু-প্রজননবিদ্যারও করিতে হইবে অনুশীলন। বৈদিক যুগে এই অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল, তাই ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্তক ঋষিদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ধাতুপ্রসাদ অর্থাৎ দেহশুদ্ধি, প্রাণশুদ্ধি এবং মনঃশুদ্ধি চাই সর্বাগ্রে। দেহ-প্রাণ-মনের উৎকর্ষ না হইলে আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ গঠন অসম্ভব। মূল কথা, বৈদিক যুগের সু-প্রজননবিদ্যার চাই নিষ্ঠাপূর্বক অনুশীলন। আহারশুদ্ধি নাই, প্রাণের শুদ্ধি নাই, মনঃশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি নাই—আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ গঠিত হইবে কেমন করিয়া? রেতঃনিষেকের পূর্বে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিতে হইবে তবেই বীর্যের পুষ্টি এবং বিশুদ্ধি ঘটিবে। নিষিক্ত বীর্যের ভ্রূণ অবস্থায়ও ব্রতপালন আছে। দশমাসে অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে গর্ভপুষ্টি পর্যন্ত অনেক কিছু করণীয় আছে। সব অনুষ্ঠানেরই তাৎপর্য বা মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া পশুজীবন যাপন করিলে দেবসন্তানের জন্ম হইবে কোথা হইতে? যজ্ঞের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে সমাজের প্রত্যেক নর-নারীকে হইতে হইবে সমনস্ক-সচেতন। আহারশুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মশুদ্ধি পর্যন্ত—সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। আহার করিতে হইবে দেবতার

প্রসাদকে, প্রসাদে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, শুদ্ধচিত্তে দেবাবেশ খুবই সহজ। সু-প্রজননবিদ্যার মূলে আছে—এই সব প্রয়োজনীয় যজ্ঞাঙ্গ। কোন অঙ্গকেই বাদ দিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না। বৈ৷.ক যুগে দিব্যভাবনা ছিল সহজ এবং অনায়াস। দেবাবেশে প্রত্যেকের অন্তর ছিল শুচিশুদ্ধ। শুদ্ধ অন্তঃকরণে হইত চিদ্‌বীজের সমাবেশ। সু-প্রজননবিদ্যার মূল—তপস্যা এবং সংযম। সংযমের শক্তিতে সপ্তলোক বা ত্রিভুবনকে জয় করা যায়। সমাজের এই অচৈতন্য অবস্থায় চেতনা সঞ্চারের জন্যই বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরের ঋষি রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'**সবার চৈতন্য হউক**।' ঋষি নিগমানন্দ এইজন্যই গৃহস্থ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'**দুই পুত্র এবং এক কন্যা হইলেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভ্রাতা-ভগ্নীর মত থাকিবে**।' ব্রতপালনে আজ গৃহস্থ-সমাজকেই আকুল আহ্বান জানাইতেছি। তাঁহারা সৎ গৃহমেধি বা গৃহস্থ হউন। গর্ভাধান অতীব দায়িত্বপূর্ণ ব্রত, ততোধিক দায়িত্ব ভ্রূণের রক্ষণ এবং পুষ্টি। দেবজন্মের অর্থাৎ সু-সন্তানের মুখদর্শনের জন্যই আমরা প্রতীক্ষায় আছি। পিতামাতা পরস্পর তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ হইতে বিমুক্ত হউন।

সৃষ্টির মূলে যে পুরুষ এবং নারী—ইহা একেবারে গোড়ার কথা। বৃহদারণ্যকোপনিষদেরই বাণী—'স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ, স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদ্‌ ইদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৪০ ॥ ৩

'সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; সেই জন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না; তিনি আপনার

দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন ; তাহার পর তিনি এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ হয়। তিনি এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল। এইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি (পত্নীরহিত) এই নিজ দেহকে অর্ধবৃগলের ন্যায় অর্ধাংশশূন্য শস্যবীজের মত বলিয়াছিলেন ; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শূন্যপ্রায় এই দেহ নিশ্চয়ই স্ত্রীদ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সেই প্রজাপতি—যিনি মনু নামে পরিচিত, তিনি এই শরীরার্ধভূতা স্ত্রীতে—যাঁহার নাম শতরূপা, সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল।'

প্রাজাপত্য ধর্মের ইহাই হইল মূল রহস্য। প্রজাপতি হইতেই মৈথুন-কর্মের উদ্ভব। এক দুই হইলেন কামনা পূরণের জন্যই। একাকী কেহই সুখী নহে। যুগলেই সুখের উৎপত্তি। সুখের জন্যই স্ত্রীর সঙ্গে মিলন। এই মিলনস্পৃহার নামই আদিকাম। এই কাম বিশুদ্ধ হইলেই হয় প্রেমের উদ্গম। দাম্পত্য-জীবনের আসল উদ্দেশ্য—নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার। এই দিব্যপ্রেম লাভ করিবার জন্যই বিবাহ। পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় ঊর্ধ্বস্রোতা হইতে হইবে। মনটাকে নিম্নস্রোতে ভাসাইয়া যে আনন্দলাভ তাহার নাম কাম, আর ঊর্ধ্বস্রোতের সন্ধান পাইলে কামই হয় প্রেমে পরিণত। দাম্পত্য-জীবনে মিলনের মাধ্যমে লাভ করিতে হইবে সেই প্রেমকে। তাহার নামই অচ্যুতানন্দ। অটল থাকিয়াও আনন্দ সম্ভোগ করা যায়, বীর্য তরল হইলেই পাত হয় ; কিন্তু মনের অটলাবস্থায় পাত না করিয়াও ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে। বিবাহিত জীবনে এই গুহ্যরহস্যের যাঁ আনন্দলাভের কৌশল জানে কয়জন? সু-প্রজননবিদ্যায় আছে এই

কৌশল আয়ত্তীকরণের ব্যবস্থা—এই পন্থায় নর নারী প্রত্যেকে নাভির উপরে ঊর্দ্ধস্রোতের সন্ধান পায়। মানুষ আজকাল বিবাহের সেই গুহ্য রহস্যের কথাই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই বিবাহিত জীবনে পূর্ণতার পরিবর্তে দেখা যায় বিকৃতা। ঋষিপ্রদর্শিত পন্থায় চলিলে বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মানন্দ লাভের অধিকারী হওয়া যায়।

———

বিবাহমন্ত্র*

১। **শুভদৃষ্টি** (পরদা সরিয়ে)

বর—	অনুবাদ
অঘোরচক্ষুর্ অপতিঘ্নী এধি	অঘোরনয়না অপতিঘাতিনী এস
শিবা পশুভ্যঃ সুমনা সুবর্চাঃ।	পশুদের তরে কল্যাণী হও, সুমনা, জ্যোতির্ময়ী,
বীরসূর্ দেবকামা স্যোনা	বীরপ্রসবিনী দেবকামা এস সুখদা
শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে	কল্যাণী হও দ্বিপদে চতুষ্পদে।

২। **বিবাহমণ্ডপে বর বধুকে নিয়ে গিয়ে আসনে বসাবে, নিজেও বসবে।**

৩। **আচার্যের সোম-সূর্যা বিবাহের (সোম আনন্দ, সূর্যা প্রজ্ঞা) অনুধ্যান।**

সোমতত্ত্ব—	
সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ	সত্য ঊর্ধ্বে ধরে আছে পৃথিবীকে,
সূর্যেনোত্তভিতা দ্যৌঃ।	সূর্য ঊর্ধ্বে দ্যুলোককে ধরে আছে,
ঋতেণাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি	ঋতেই দাঁড়িয়ে আছেন আদিত্যেরা
দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ	আলোকের লোক সোমের রাজধানী।
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ	বলীয়ান্ সোম-বলেই আদিত্যেরা
সোমেন পৃথিবী মহী।	পৃথিবী মহান্ সোমে,
অথো নক্ষত্রাণামেষাম্	সোম রয়েছেন তারাদের
উপস্থে সোম আহিতঃ	মাঝখানে।

* অনুবাদিকা : গৌরী ধর্মপাল এম. এ. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ঈশান স্কলার, অধ্যাপিকা, সংস্কৃত, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ

সোমং মন্যতে পপিবান্
যত্ সংপিংষন্তি ওষধিম্ ।
সোমং য' ব্রহ্মাণো বিদুর্
ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন

লতা খেঁতো ক'রে কেউ কেউ মনে করে
এই তো খেয়েছি সোম,
ব্রহ্মবিদেরা যে-সোমকে জেনেছেন
তাকে তো খায় না কেউ ।

বধূকাম সোম—

সোমো বধূয়ুর অভবদ
অশ্বিনাস্তাম্ উভা বরা ।
সূর্যাং যত পত্যে শংসন্তীং
মনসা সবিতাদদাত্

বধূ চাইলেন সোম,
পছন্দ করে দিলেন অশ্বী দুজনে,
পতি চাইছিল মনে মনে সূর্যাও,
সবিতা দিলেন মানস সম্প্রদানে ।

সূর্যাব বর্ণন —

চিত্তির আ উপবর্হণং
চক্ষুর্ আ অভ্যঞ্জনম্ ।
দ্যৌর ভূমিঃ কোশ আসীদ্
যদ্ অযাত্ সূর্যা পতিম্

প্রথম চেতনাই ছিল তার উপাধান,
দৃষ্টি-কাজল মাখা ছিল তাঁব চোখে,
আকাশ পৃথিবী রথের মধ্যিখান,
সূর্যা যখন গেলেন স্বামীর কাছে ।

মনো অস্যা অন আসীদ্
দ্যৌর্ আসীদ উত চ্ছদিঃ ।
শুক্রাব্ অনাড্বাহাব্ আস্তাং
যদ্ অযাত্ সূর্যা গৃহম্

মন ছিল তাঁর রথ,
আকাশ রথের ছাদ,
টানছিল তাকে দুটি উজ্জ্বল ষাঁড়,
সূর্যা যখন গেলেন স্বামিগৃহে ।

দ্বে তে চক্রে সূর্যে
ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ ।
অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা
তদ অদ্ধাতয ইদ বিদুঃ

সূর্যা, তোমার রথেব চক্র দুটি
ব্রহ্মবিদেবা জেনেছেন কালে কালে,
একটি চক্র গোপনে রয়েছে ঢাকা,
তাকে জেনেছেন সত্যবিদেরা শুধু ।

সবাইকে প্রণাম—

সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।	সূর্যাকে করি নমস্কার,
যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোঽ-	মিত্র, বরুণ, দেবতাদের,
করং নমঃ	জীবের চেতনা বিশাল করেন যাঁরা।

বধূকে উদ্দেশ করে—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে	তোমাকে প্রথম পেয়েছিল সোম,
গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।	তারপর গন্ধর্ব,
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্	অগ্নি তোমার তৃতীয় ভর্তা
তুরীয়স্ তে মনুষ্যজাঃ	মানুষ চতুর্থ।

অগ্নি প্রজ্বালনান্তর অগ্নির প্রতি—

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায	অগ্নি, রুখে দাঁড়াও,
তব দ্যুম্নানি উত্তমানি সন্তু।	শ্রেষ্ঠ তোমার মনোদ্যুতিরা মহাসুখ এনে দিক,
সং জাস্পত্যং সুযমম্ আ কৃণুষ্ব	দাম্পত্যকে করো দৃঢ়-বন্ধন,
শত্রূয়তাম্ অভি তিষ্ঠা মহাংসি	শত্রুতা যারা করছে, দাঁড়াও তাদের তেজের সামনে।

৪। **বরের আজ্যাহুতি ২ বার**। বর ও বধূর আসনগ্রহণের পর বধূ ডান হাতে বরের ডান কাঁধ স্পর্শ করে থাকবে।

(ক) ওঁ দ্যৌস্ তে পৃষ্ঠং রক্ষতু	পৃষ্ঠ তোমার রক্ষা করুন দ্যৌ
বায়ুর্ উরূ অশ্বিনৌ চ	অশ্বিদ্বয় আর বায়ু উরু দুটি,
স্তনন্ধয়াংস্ তে পুত্রান্ সবিতাঽভিরক্ষতু॥	সবিতা রাখুন পুত্রগুলিকে যতদিন দুধ খায়,
আ বাসসঃ পরিধানাদ্ বৃহস্পতির্	যতদিন থাকে নগ্ন—বৃহস্পতি,
বিশ্বে দেবা অভিরক্ষন্তু পশ্চাত্ স্বাহা॥	বিশ্বদেবেরা রাখুন অতঃপর।

(খ) ওঁ পরৈতু মৃত্যুর্ অমৃতং ম
আগাদ্
বৈবস্বতো নো অভয়ং
কৃণোতু স্বাহা ॥

দূরে যাক মৃত্যু,
অমৃত আসুক কাছে,
সূর্যের পুত্র
অভয় মোদের দিন

৫। আসন বদলের পর পাণিগ্রহণ

আচার্য—

পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্য
অশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো
বশিনী ত্বং বিদথম্ আ বদাসি

এইখান থেকে হাত ধরে পূষা
তোমাকে নিয়ে চলুন,
অশ্বী দুজন বহন করুন রথে,
ঘরে চলো, হবে ঘরণী, ঘরের স্বামিনী,
ঘোষণা করবে তোমার আজ্ঞা,
বশে রেখে, বশে থেকে।

বর—

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং
ময়া পত্যা জরদষ্টির্ যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্
মহ্যং ত্বাদুর্ গার্হপত্যায় দেবাঃ

সৌভাগ্যের জন্যে তোমার
হাতখানি হাতে নিই,
আমার সঙ্গে—স্বামীর সঙ্গে—
যাতে বুড়ো হও তুমি,
তুমি হবে মোর ঘরের ঘরণী, তাই
আমাকে তোমায় দিয়েছেন
দেবতারা —
ভগ, অর্যমা, সবিতা, পুরন্ধি।

৬। বধূর লাজাহোম ২ বার

বধূ—

(ক) ওঁ দীর্ঘায়ুর্ অস্তু মে পতিঃ
শতং বর্ষাণি জীবতু।
এধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।

দীর্ঘায়ু হোন স্বামী আমার,
বাঁচুন শত বরষ,
বাড়ুন আমার জ্ঞাতিরা।

(খ) ওঁ অর্যমণং নু দেবং	অর্যমাদেবকে পূজেছিল কন্যা
কন্যা অগ্নিম্ অযক্ষত।	পূজেছিল অগ্নিকে সঙ্গে,
স মাং দেবো অর্যমা	এখান ওখান থেকে প্রমুক্ত করে দিন
প্রে.তো মুঞ্চাতু মা মূতঃ স্বাহা॥	সেই দেব অর্যমা আমাকে।

৭। **পরিণয়ন বা অগ্নিপ্রদক্ষিণ ৩ বার বধূকে নিয়ে**

বর—

ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং	বাপের বাড়ি ছেড়ে-ছুড়ে
যতী. য়ম্ অপ দীক্ষাম্ অযষ্ট।	শ্বশুরবাড়ি যাওয়া,
কন্যা উত ত্বয়া বয়ং	যজ্ঞ করার মতোই সে তো,
ধারা উদন্যা ইব	না-ই বা হল দীক্ষা,
অতিগাহেমহি দ্বিষঃ	তা-ই করেছে মেয়ে।
	ওগো মেয়ে তোমায় পেয়ে জলস্রোতের মত
	শত্রুদের আমরা যেন পার হয়ে যাই চলে।

৮। **সপ্তপদীগমন**

বর—

ইষে বিষ্ণুম্ ত্বা নয়তু	বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন এষণার পানে
উর্জে „ „ „	„ „ „ „ বীযের পানে
ব্রতায় „ „ „	„ „ „ „ ব্রতের পানে
মাযোভবায „ ..	„ „ „ আনন্দে-থাকায়
পশুভ্যো „ „	„ „ „ „ শুদ্ধপ্রাণে
রায়স্পোষায় „ „	„ „ „ „ সমৃদ্ধিতে
সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো „ „	„ „ „ „ সপ্ত বাণীতে।

আচার্য—

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতাম্
অস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্ব
অধা জিব্রী বিদথম্ আ বদাথঃ

বাড়ুক এখানে, যা তোমার ভাল
লাগে,
বাড়ুক সন্তানেরা,
জাগো এই ঘরে ঘরের গৃহিণী হয়ে,
শরীর মেশাও শরীরে এই স্বামীর,
পাকাচুলে কর আজ্ঞা ঘোষণা দুজনে।

৯। মূর্ধাভিষেক

আচার্য—

সম্ অঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ
সম্ আপো হৃদয়ানি বাম্।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা
সম্ উ দেষ্ট্রী দধাতু বাম্

বিশ্বদেবেরা আর বিশ্বপ্রাণেরা মিলে
করে দিন তোমাদের হৃদয়কে
সুন্দর, স্বচ্ছ,
জুড়ে দিন এক করে, দিন মাতরিশ্বা,
দিন ধাতা আব দিন দেষ্ট্রী।

১০। সিন্দুরদান

বর—

যদ্ ইদং হৃদয়ং তব তদ্ ইদং হৃদয়ং
মম
মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু
মম চিত্তম্ অনু চিত্তং তেঽস্তু।
মম বাচম্ একমনা জুষস্ব
বৃহস্পতিম্ ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্

এই যে তোমার হৃদয়
তা-ই তো আমার এই হৃদয়,
আমার যা ব্রত, হৃদয় তোমার
তাতে লাগুক,
তোমার চিত্ত থাকুক
আমার চিত্তের পিছু পিছু,
শুনো গো আমার কথা
একমনে ভালোবেসে,
আমার গভীরে যুক্ত করুন
তোমাকে বৃহস্পতি।

আচার্য—

ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং	এখানেই থাকো, ছাড়াছাড়ি নয়,
বিশ্বম্ আয়ুর্ ব্যশ্নুতম্।	ভোগ করো পুরো আয়ু,
ক্রীলন্তৌ পুত্রৈর্ নপ্তৃভির্	আনন্দ করো দুজনে আপন ঘরে
মোদমানৌ স্বে গৃহে	ছেলেদের নিয়ে
	নাতিদের নিয়ে খেলো।

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব	শ্বশুরের মহারাণী হও,
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।	মহারাণী হও শাশুড়ীর,
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব	ননদের মহারাণী হও,
সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু	মহারাণী হও দেওরেরও।

১১। **প্রেক্ষকানুমন্ত্রণ**

দর্শকদের প্রতি আচার্য—

সুমঙ্গলীর্ ইয়ং বধূর্	এই বধূ শুভা, সুকল্যাণী,
ইমাং সমেত পশ্যত।	সকলে আসুন, একে দেখুন,
সৌভাগ্যম্ অস্যৈ দত্ত্বায়	সৌভাগ্যের আশীর্বাদ দিয়ে
অথাস্তং বি পরেতন	তারপর বাড়িতে ফিরুন।

সমাপ্ত